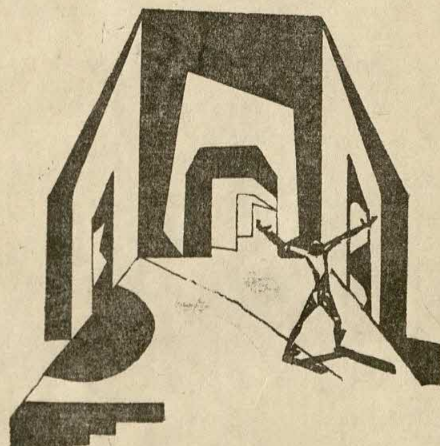
অভিনয় প্রযোজনা পরিচালনা



বিভূতি মুখোপাধ্যায়



অভিনয় প্রযোজনা পরিচালনা

বিভূতি মুখোপাধ্যায় এম. এ.

॥ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ॥
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিঃ ৯

Abhinoy : Projojona : Parichalana

প্রথম প্রকাশ :

২৫শে আষাঢ়, ১৩৭০

প্রচ্ছদ : জোছন দস্তিদার

দাম : ৮·৫০

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ জাতীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে এস. দত্ত. কর্তৃক প্রকাশিত ও ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে রূপলেখা প্রেসের পক্ষে শ্রীঅজিতকুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত।

বিজন ভট্টাচার্য

শ্রীচরণেষু

প্রাক-কথন

নাট্য সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করতে করতে বার বার মনে হয়েছে যে, কেবলমাত্র নাটকের গঠন-কৌশল এবং চরিত্র বিচারেই নাটকের সঠিক মূল্যায়ণ সম্ভব নয়। কেননা নাটক দৃশ্য-কাব্য, তাই দর্শকের কাছে একে সম্যকরূপে পরিস্ফুট করতে গেলে যে অভিনয়, দৃশ্যসজ্জা, আলোক-সম্পাত, আবহ-সঙ্গীত ইত্যাদি আঙ্গিকগুলোর ব্যবহার করতে হয়, এক কথায় নাটকের প্রয়োগ-কৌশল, তার আলোচনা করাও বিশেষভাবে প্রয়োজন।

বর্তমান গ্রন্থে যথাসাধ্য সেই আলোচনার অবতারণা করতেই প্রয়াসী হয়েছি। নব নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বিজন ভট্টাচার্যের কাছে অভিনয়-প্রযোজনা সম্পর্কে যা কিছু শুনেছি এবং তাঁর নাট্য প্রযোজনা-কৌশল যে ভাবে প্রত্যক্ষ করেছি, এবং ঋত্বিক ঘটক, শম্ভুমিত্র, উৎপল দত্ত প্রমুখ আধুনিক কালের খ্যাতনামা নট-প্রযোজকের অভিনয় সম্পর্কিত রচনা যা পড়েছি তার সাহায্যও গ্রহণ করেছি অকুণ্ঠভাবে।

নাট্য সাহিত্যের আলোচনায় যিনি আমাকে আগ্রহী করেছেন এবং উৎসাহিত করেছেন, তিনি হলেন আমার শিক্ষক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য। অধ্যাপক ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিয়ে আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছেন। এঁদের স্নেহ এবং ভালবাসায় আমি ধন্য।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই আমার নাট্যকার বন্ধু সুনীল দত্ত, রমেন লাহিড়ী, মনোরঞ্জন বিশ্বাসকে। এঁরা পাণ্ডুলিপি পাঠ করে আমাকে সবিশেষ উৎসাহিত করেছেন।

গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত প্রুফ্ সংশোধনের জন্য দ্বিজেন ঘোষ, প্রচ্ছদ অঙ্কনের জন্য জোছন দস্তিদার এবং মুদ্রণের জন্য রূপলেখা প্রেসের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই তপতী ঘোষালকে, যিনি আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী এবং শব্দসূচী প্রস্তুত করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি ঋণী রইলাম।

রথযাত্রা
৮ই আষাঢ়, ১৩৭০ } বিভূতি মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

কথারম্ভ (৯-২১)

নাটকের উৎপত্তি ১০, নাটকের উদ্দেশ্য ২১

অভিনয়

প্রথম অধ্যায় (২৯-৪৮)

অভিনেতার দায়িত্ব ২৯

দ্বিতীয় অধ্যায় (৪৯-৬৪)

অভিনয়ের শ্রেণীবিভাগ ৪৯, আহার্য অভিনয় ৫১, বাচিক অভিনয় ৫৪, আঙ্গিক অভিনয় ৫৫, সাত্ত্বিক অভিনয় ৫৬।

তৃতীয় অধ্যায় (৬৫-৮১)

উচ্চারণ প্রসঙ্গ ৬৫, উচ্চারণ বিধি ৭০।

চতুর্থ অধ্যায় (৮২-১০৩)

কণ্ঠস্বর ৮২, ব্যক্তিভেদে স্বরভেদ ৮৫, শ্বাসযন্ত্র ও কণ্ঠনালী ৮৯, শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ৯৪, স্বরসাধনা ৯৯, পুনশ্চ ১০১।

পঞ্চম অধ্যায় (১০৪-১৩৯)

অভিব্যক্তি ১০৪, অভিব্যক্তি ও অনুকরণ ১০৮, অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা ১১৮, অভিব্যক্তি, পরিমিতি ও অতিঅভিনয় ১২১, অভিব্যক্তি প্রকাশের প্রাথমিক সংকট ও সমাধান ১২৬, স্টানিস্লাভস্কির অনুসরণে ১৩৩।

প্রযোজনা

ষষ্ঠ অধ্যায় (১৪৩-১৬৭)

প্রযোজনা ও প্রযোজক ১৪৩, প্রযোজনার উপকরণ ১৪৫, মঞ্চসজ্জা ১৪৫, আলোক সম্পাত ১৪৯, আবহ সঙ্গীত ১৫১, রূপসজ্জা ১৫২, অঙ্গ এবং আঙ্গিক ১৫৭, প্রযোজক ১৫৯, প্রযোজকের ইতিকর্তব্য ১৬১।

সপ্তম অধ্যায় (১৬৮-২০৯)

প্রযোজনার ইতিকথা ১৬৮, আদি পর্ব ১৭৫, মধ্য পর্ব ১৭৯, আধুনিক পর্ব ১৮৩, অতি আধুনিক পর্ব ১৮৬, আঙ্গিক নির্ণয় ও জাতীয় ঐতিহ্য ২০৪।

পরিচালনা

অষ্টম অধ্যায় (২১৩-২৩৪)

পরিচালক বনাম প্রযোজক ২১৩, পরিচালক ও অভিনেতা ২১৫, পরিচালকের কর্তব্য ২২৩, পরিচালকের শ্রেণীবিভাগ ২২৫, আমাদের পরিচালক ২২৮, উপসংহার ২৩৩।

পরিশিষ্ট (ক)

দর্শক ও প্রযোজক ২৩৭, নাটমঞ্চ ও দর্শক ২৪২, নাটমঞ্চ ও সমালোচক ২৪৫, নাট্যকার ২৪৮, নবযুগের প্রস্তুতিপর্ব ২৫১।

পরিশিষ্ট (খ)

গ্রন্থপঞ্জী ২৫৫।

শব্দসূচী

এক

কথারম্ভ

পৃথিবীর জন্মের বহু কোটি বছর পরে মানুষের আগমন। ঐতিহাসিকের মতে মানুষ-ই হলো বিধাতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান; প্রাণিজগতের নবতর বিস্ময়। সর্বকনিষ্ঠ এই সন্তানটির দাপট কিন্তু কম নয়, কেননা অতি অল্পদিনেই বিধাতার এই নবতর সৃষ্টি, অন্য সব সৃষ্টিকে ছাপিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। এই মানুষই হলো বিধাতার গর্ব, তাঁর বিস্ময়, সময়বিশেষে তাঁর বিরক্তির কারণও বটে। তবু তার সব দোষ ত্রুটি মেনে নিয়েও একথা বলা যায় যে, মানুষের ইতিহাসই হলো আজ পৃথিবীর ইতিহাস। এই মানুষই হলো ইহজগতে বিশ্ববিধাতার অভিপ্রেত যত অসমাপ্ত কর্মের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী; তাঁর প্রতিভূ, তাঁর প্রতিবিম্ব।

সৃষ্টির প্রথম উষালোকে নবজাতক এই মানুষ যখন প্রথম চোখ মেলে তাকাল, তখন তার দুই আঁখি-তারকায় ছিল অফুরন্ত বিস্ময়; ছিল অনন্ত অপার কৌতূহল। দুর্দমনীয় সেই কৌতূহলের বশে, এই ধরিত্রীর রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ সব কিছু সে যেন শুষে নিতে চাইল তার কায়-মন-বাক-শক্তি দিয়ে। প্রকৃতির অফুরন্ত অমৃতের পেয়ালায় আকণ্ঠ চুমুক দিয়ে সার্থক হতে চাইল, সার্থক করতে চাইল ধরণীকে। কিন্তু শুধু অমৃত পান নয়, অমৃতের অন্বেষাতেও তৎপর ছিল কৌতূহলী মানুষের মন। প্রকৃতির রূপ-রসের অফুরন্ত সৌন্দর্য-ভাণ্ডার দেখে সে শুধু বিমোহিত হয়নি, বার বার প্রশ্ন করেছে কিম্ এতদ্? এটা কি? কিমিদং? ইহা কি?

মানুষের এই অন্বেষাই তার মানস মণিকুট্টিমে জাগিয়ে দিয়েছে প্রজ্ঞার অনির্বাণ দীপবর্তিকা, প্রেরণা দিয়েছে সৃষ্টিশক্তির। আর তাই শেষ পর্যন্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছে আর এক নতুন জগৎ। এই নবসৃষ্ট জগৎই হলো মানুষের সাহিত্য-শিল্প; তার কৃষ্টি আর সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

সাহিত্য সৃষ্টির মূল অনুপ্রেরণাই হলো তাই জীবন-জিজ্ঞাসা। বিশ্বপ্রকৃতির সীমাহীন পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে আপন অবস্থার সংযোগ, সংস্থান নির্ণয়ের কষ্টিপাথর। যুগে যুগে তার কাব্যে, প্রবন্ধে-দর্শনে, উপন্যাসে, নাটকে প্রতিফলিত রয়েছে এই প্রজ্ঞাশীল মননের জীবন-যন্ত্রণা।

দুই
নাটকের উৎপত্তি

নাটক হলো সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা। কাব্য বা দর্শনের মতো এ শুধু প্রজ্ঞাবান মানস-কল্পনার ঘনীভূত রসরূপ নয়; তার রূপ ও রূপায়ণের বিমিশ্র আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তার্কিকের তথ্য-অন্বেষণ নয়, কবির জীবন উপলব্ধির একক প্রকাশ নয়, গোষ্ঠীমানসের সহযোগিতায় ব্যাপকভাবে জানবার এবং জানাবার প্রচেষ্টাই নাটকের মৌল প্রেরণা। যে জীবনকে মানুষ চেয়েছে, যে প্রকৃতির অমৃতস্বরূপ রস-সৌন্দর্যকে মানুষ উপলব্ধি করতে চেয়েছে, তাকে অনুকরণও করতে চেয়েছে সর্বসাধারণের হিতার্থে। তাই মহাকাব্যের পরও রচিত হয়েছে নাটক; উৎসব উপলক্ষ্য করে অভিনীত হয়েছে মন্দিরে মন্দিরে, চিত্তরঞ্জন করেছে অসংখ্য মানুষের, আবার তাদের সজাগও করেছে, জীবন-ছন্দের নানাবিধ তরঙ্গ দোলায় দুলিয়ে।

নাট্যকলার সূত্রপাত কবে হয়েছে একথা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার ৪৯০ বৎসর আগে গ্রীসে ইস্কাইলাস নাট্যকার হিসেবে প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁরও অনেক আগে সম্ভবত নাট্যকলা বর্তমান ছিল, কেননা ইস্কাইলাসকেও প্রথম নাট্যকার বলা যায় না।

প্রাচীন মিশরের প্যাসন প্লে

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন মিশরের ওসিরিসের উৎসবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার বহু শত বছর আগে "প্যাসন প্লে" নাটকের সন্ধান মিশরে পাওয়া যায়। Allardyce Nicoll এই প্রসঙ্গে "Abydos Passion Play"র কথা আমাদের বলেছেন। ওসিরিসের মৃত্যুর পর যখন তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তখন তাঁর ভগ্নী ও স্ত্রী 'ইসিস' কীভাবে সেই বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবার জোড়া লাগিয়েছিলেন, এই কাহিনীই ছিল উক্ত নাটকের বক্তব্য বিষয়। অবশ্য এই নাটকের কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি। Ikhernofret বলে কোন এক ব্যক্তি (১৮৮৭-১৮৪৯ খ্রীঃ পূঃ) Secostris III-এর সময় প্রাচীন নাট্য-বিষয়কে সঙ্কলিত করে একটা অভিনয় করেছিলেন, তাঁর সেই অভিনয়ের ঘটনা যেটুকু পাওয়া গেছে, তার থেকে ওসিরিসের এই কাহিনী কিছুটা জানতে পারা যায়। যদিও জোর করে কিছুতেই বলা যায় না যে, এগুলো সঠিকভাবে নাটকের পর্যায়ভুক্ত করা চলে কিনা।

গ্রীসের দিওন্নুসিওসের উৎসব

গ্রীসের নাট্যকলা দিওন্নুসিওসের উৎসব কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে ক্রমপরিণতির পথে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রথমে দিওন্নুসিওসের উৎসবে সম্ভবতঃ দেবতা-সম্পর্কিত কোন কাহিনী অবলম্বন করে গান বাঁধা হতো। তারপর ধীরে ধীরে দলবদ্ধভাবে গীত সেই গানে আরো অনেক ক্রিয়াকলাপের এবং চরিত্রের সংযোজনা হয়, আর এই সংযোজনাই ক্রমশ ক্রমশ এইগুলিকে নাট্য-পর্যায়ে উন্নীত করে। উৎসব উপলক্ষ্যে এইসব গানগুলিতে কবে কখন যে চরিত্র এবং ক্রিয়াকলাপের সংযোজনা হয়, তা বলা দুরূহ, তবে মনে হয় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই এই ঘটনা ঘটেছিল। গ্রীক নাটকে প্রথম অভিনেতার আগমন হয় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, এই অভিনেতা আমদানীর কৃতিত্ব Thespis বলে জনৈক ব্যক্তির বলে মনে করা হয়। Thespis হলেন অভিনেতাদের মুখোস এর স্রষ্টিকর্তা। গ্রীসে ৫৩৪ খ্রীঃ পূর্বে Pisistratus যে প্রথম নাট্য-উৎসবের অনুষ্ঠান করেন, সেখানে Thespis নাটক প্রযোজনা করেছিলেন, এবং অভিনয়ে প্রথম পুরস্কারও লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। Thespis-এর পর ইতস্তত বিচ্ছিন্নভাবে আরো কয়েকজন গ্রীক নাট্যকারের সন্ধান পাওয়া যায়; কিন্তু সেইসব আহরিত তথ্য সম্পূর্ণ নয়, এবং তা দিয়ে নাট্যকলার উৎপত্তির একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গড়ে তোলা যায় না। Thespis-এর পর Choirilos,

Pratinas, Phrynichos ইত্যাদি বিভিন্ন নাট্য-পরিচালক-এর নাম পাওয়া গেলেও বলতেই হয় যে ইস্কাইলাসের আগে গ্রীক নাট্যকলার পরিপূর্ণ বিবর্ধন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানবার উপায় নেই। নাট্য-সাহিত্যের ঐতিহাসিক Allardyce Nicoll-এর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

> "Yet consideration of their activities helps us nothing in our endeavour to see the history of the Theatre as a whole, for we have naught save scattered allusions, a few historical records, and a handful of fragments of their writings to assist us. We see faint streaks of light amid the darkness, and dim, silhouetted outlines begin to become apparent; but not until we reach Æschylus does the sunrise come."

রোমক নাট্যকলা

এই গ্রীক নাট্যকলার ঐতিহ্য অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে রোমান নাটকের উৎপত্তি হয়েছে। আর এ বিষয়ে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখ করা যায়, তিনি হলেন সুবিখ্যাত রোমক নাট্যকার "সেনেকা"। সেনেকা-র বিয়োগান্ত নাটকগুলিতে নাট্য-সাহিত্যের ঐতিহাসিক ইউরিপিদিসের প্রচুর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। মিলনান্তক নাটকের রচনাকার হিসেবে টেরান্স ও প্লাউতুসের কথাও বলা যায়। আরিস্তফানিসের প্রহসনের প্রভাবে এঁদের নাট্যকলা বিবর্ধিত।

কিন্তু সে যাই হোক, বর্তমান প্রসঙ্গে গ্রীক বা রোমান নাট্যকলার সুবিস্তৃত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, মোটামুটিভাবে তা হলো এই যে, প্রাচীনকালে কি মিশর, কি গ্রীসে, নাট্যকলার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মচেতনা ও উৎসব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ রূপাবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে।

আর শুধু মিশর, গ্রীস বা রোম নয়, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের

নাট্যকলার উদ্ভব ও ক্রমপরিণতির ব্যাপারেও এই কথা সত্য। আমাদের ভারতবর্ষেও ঠিক অনুরূপভাবেই জনসমাজের ধর্মচেতনা ও ধর্মোৎসবকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে নাট্যকলার উদ্ভব এবং ক্রমপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

ভারতবর্ষ শিল্প-সচেতন দেশ। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সমাজের ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নৃত্য-গীত-মন্ত্র ইত্যাদির উদ্ভব ঘটেছে; এবং সেই সব আচার-অনুষ্ঠানই কালক্রমে পরিপূর্ণ ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ভারতীয় জনমানসের শিল্পচেতনায় ঘনপীনদ্ধ স্বসরূপে হয়েছে পরিণত। লৌকিক ধর্মাচরণ ছিল অতি ব্যাপক। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে মুখরিত থাকতো ভারতভূমি। আর্য ঋষিদের বড় বড় যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কথা বাদ দিলেও শ্রম ও কৃষিজীবি মানুষের আচার-অনুষ্ঠানেরও অভাব ছিল না। আর বলা বাহুল্য, এইসব উৎসব-অনুষ্ঠান ছিল তাল-লয়-সমন্বিত নৃত্য-গীত-বাদ্যের ব্যঞ্জনায় মুখরিত। এই সব উৎসবের মধ্যেই ভারতীয় নাটকের মৌল প্রেরণা নিহিত রয়েছে।

ভারতীয় নাট্যকলা

লৌকিক এইসব ধর্মাচরণের মূল উদ্দেশ্য একদিকে যেমন ছিল দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, অন্যদিকে তেমনি ছিল সহজ এবং আপাত মধুর ভাবব্যঞ্জনার সাহায্যে চলমান জীবন-ছন্দের নানা সমস্যা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা এইসব উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষণীয় দিকটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন বলেই নাটককে তাঁরা 'সকল কলাপারং' রূপে বর্ণনা করে গেছেন। ভরতমুনি বিরচিত সুপ্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র সারস্বত সমাজে পঞ্চম বেদ বলে চিহ্নিত হয়েছিল। সুতরাং বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে নাটকের মুল উৎস যে তাবৎ মানুষের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি অথবা অনুকরণ-প্রবৃত্তি থেকেই সম্ভব হয়েছে একথা বলা যায় না। যদিও এই দুই বৃত্তিও নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। কিন্তু সে আলোচনা পরে। বর্তমানে আমাদের আলোচনা নাট্য-সাহিত্যের উৎস-মুখের অনুসন্ধানেই সীমাবদ্ধ রাখবো।

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় জনগণের ধর্মচেতনা এবং তজ্জনিত নানা

উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে যে নাট্যকলার সূত্রপাত হয়েছিল সেই সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে পরবর্তী কালে গড়ে-ওঠা বাঙ্‌লা নাটকের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। অর্থাৎ বাঙ্‌লা নাটক ঠিক সংস্কৃত নাটকের ক্রমপরিণতির প্রভাবে গড়ে ওঠেনি। যদিও সংস্কৃত নাট্যকলার মতই জনসমাজের আচরণীয় ধর্মোৎসবের মাধ্যমেই বাঙ্‌লা নাটকের অঙ্কুরও উদ্ভিন্ন হয়েছে। আর আমরা আগেই বলেছি শুধু সংস্কৃত অথবা বাঙ্‌লা নাটকের ক্ষেত্রে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই নাট্যকলার উৎপত্তি হয়েছে, নানা বৈচিত্র্যময় ধর্মোৎসবকে কেন্দ্র করেই।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় সংস্কৃত নাট্যকলার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস অনুসরণের কোন প্রয়োজন নেই, কেননা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো নাটকের সাহিত্য-মূল্য বিচার করা নয়, তার প্রযোজনা এবং অভিনয়, যা নাকি নাটকের পূর্ণতা এবং সার্থকতার অন্যতম সহায়, তারই আলোচনার সূত্রপাত করা। তবে যেহেতু আমাদের নাট্য-পরিচালনা, প্রযোজনা এবং অভিনয়ের আলোচনা বাঙ্‌লা নাটকের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্প্রসারিত, সেইহেতু বর্তমান প্রসঙ্গে বাঙ্‌লা নাটকের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

তিন

অন্যান্য দেশের এবং ভারতীয় সংস্কৃত নাটকের মত বাঙ্‌লা নাটকেরও প্রথম প্রাণচৈতন্যের পরিস্ফুটন যে জাতির উৎসব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই সম্ভব হয়েছে একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

বাঙ্‌লা নাটকের অংকুর

বাঙ্‌লা দেশের সমাজ সংস্কৃতির সুপ্রাচীন পরিচয় ধারাবাহিক ভাবে গড়ে তোলা আজ আর সম্ভব নয়। এক হাজার খ্রীষ্টাব্দের আগে বাঙ্‌লা ও বাঙালীর সংস্কৃতিক জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস গড়ে তোলার মত যথেষ্ট উপকরণ আমাদের হাতে নেই। তবে চর্যাপদের কাল থেকে যে সব উপকরণ আমাদের হস্তগত

হয়েছে, সেগুলোর বিশ্লেষণে বাঙালীর সামাজিক জীবনে আমোদ-আহ্লাদ উপভোগের জন্য নৃত্য-গীতবহুল যেসব উৎসবের প্রচলন ছিল বলে জানা যায় তার মধ্যে নাটকের অঙ্কুর খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

চর্যাপদের মধ্যে বাঙালী সমাজ-জীবনের যে সব আচার-আচরণের কথা আছে তার বিশ্লেষণে দেখতে পাই, নাট্যাভিনয়ও তখন উৎসব-অঙ্গনের একটা প্রধান আকর্ষণ ছিল। চর্যাকাররা এই প্রসঙ্গে 'বুদ্ধা' নাটকের অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

নাচন্তি বাজিল গান্তী দেবী।
বুদ্ধা নাটক বিসমা হোই

অথবা—

এক সে পাতুমা চৌষঠি পাখুড়ী
তাঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী

চর্যার এসব পদের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় অর্থ যাই হোক না কেন, ধর্মাচরণের গোপন ঐতিহ্যের প্রকাশ তাঁরা যে নৃত্য-গীতের উপমার সাহায্য নিয়ে করেছেন, তাতে করে বোঝা যায় এই ধরনের আমোদ-আহ্লাদ তৎকালীন জনজীবনে কতখানি ওতপ্রোত ছিল। তা যদি না থাকতো, তাহলে ধর্মতত্ত্বের গূঢ় সঙ্কেত জানাবার জন্য চর্যাকাররা কখনই ওই ধরনের উপমা ব্যবহার করতেন না; কেননা যা লোকায়ত নয়, সেই সব উপমা রূপকের প্রয়োগ তাঁরা যথাসাধ্য বর্জন করেছেন দেখতে পাই। উল্লিখিত পদগুলি ছাড়াও চর্যাপদে এক ধরনের তামাসা বা মস্করার উল্লেখ আছে দেখতে পাই, যারা ভ্রাম্যমান নট-নটী ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব ভ্রাম্যমান নট-নটীরা তাদের নাটকীয় চরিত্রোপযোগী সাজসজ্জার বাক্স—চর্যাকাররা যাকে "নড়পেড়া" অর্থাৎ কিনা নটপেটিকা বলেছেন—মাথায় নিয়ে গ্রামে গ্রামে তামাসা দেখিয়ে ঘুরে বেড়াত। লোক-সাহিত্যের মধ্যেও এই ধরনের তামাসার কথা আমরা উল্লিখিত আছে দেখতে পাই। মধ্যযুগের পঞ্চদশ শতাব্দীর কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও 'মসকরার' উল্লেখ আছে।

সাহিত্যের নাটকীয়ত্ব

প্রাচীন কালে কোন পূর্ণাঙ্গ বাঙ্‌লা নাটকের সন্ধান পাওয়া না গেলেও সাহিত্যে উল্লিখিত মসকরা বা ভ্রাম্যমান নট-নটীর কথা দেখে আমরা অনুমান করতে পারি যে. নাট্যকলা—তা সে যে আকারেরই হোক না কেন—এদেশে প্রচলিত এবং যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের নাটকীয়ত্বও আমাদের এই অনুমানকে সমর্থন করে। মধ্যযুগের কাব্য কৃষ্ণকীর্তনের নাট্যধর্মীত্ব বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। সমস্ত কাব্যটি যেন আধুনিক গীতি-মালিকার ছাঁদে রচিত হয়েছে। তা'ছাড়াও পাত্র-পাত্রীর মুখে কবি যে সব সরস এবং তির্যক অর্থসমন্বিত সংলাপ বসিয়েছেন, তাও তাঁর নাট্য-প্রতিভারই স্বাক্ষর। যমুনার ঘাটে রাধা যখন জল আনতে গেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে, যে সব কৌতুহল প্রকাশ করেছিলেন, তা রাধা-কৃষ্ণের উত্তর প্রত্যুত্তরের মাধ্যমেই চণ্ডীদাস বর্ণনা করেছেন।

কৃষ্ণ ॥ কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী,
কেহ্নে যমুনাত তোলসী পাণী!
রাধা ॥ বড়ার বহু মো বড়ার ঝি!
আহ্মে পাণী তুলি তোহ্মাত কি ॥
কৃষ্ণ ॥ কাঁখের কলস নাম্বাঅ তোহ্মে।
কথা চারি পাঁচ কহিব আহ্মে ॥
রাধা ॥ যার কাঁন্ধ বসে দোষর মাথা।
সেসি আহ্মা সমে কহিবে কথা ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটক নয়, কাব্য। কিন্তু সূক্ষ্ম নাট্যবোধ না থাকলে, কাব্যের সংলাপকে এমন সরস নাটকীয় সংলাপে পরিণত করা যেত না নিশ্চয়ই।

লৌকিক সাহিত্যের মধ্যেও এই নাট্যগুণটি আশ্চর্যজনক ভাবে সুপরিস্ফুট। ধর্মঠাকুরের পালা, সূর্যমঙ্গল, শিবায়ন, মনসা মঙ্গল, ইত্যাদি কাব্যে, তাছাড়া ময়মনসিংহ গীতিকার পাতায় পাতায় আশ্চর্য নাট্যগুণসম্পন্ন সংলাপ ছড়িয়ে আছে।

মহুয়া কাব্যের—

জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিছ ঢেউ
আমার সঙ্গে কইবা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥
অরে অরে নির্লজ ঠাকুর লজ্জা নাইক তর।
গলায় কলসী বাইন্ধা ঠাকুর জলে ডুইব্যা মর ॥

কিম্বা সূর্যমঙ্গলে সূর্যাই ঠাকুরের বিবাহ বর্ণনায়—

গৌরী ॥ তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি কাপড়ের দুঃখ পামু।
সূর্যাই ॥ নগরে নগরে আমি তাঁতিয়া বসামু।
গৌরী ॥ তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি শঙ্খের দুঃখ পামু
সূর্যাই ॥ নগরে নগরে আমি শাঁখারি বসামু।

ইত্যাদি সংলাপ, নিঃসন্দেহে প্রাচীন বাঙ্‌লার নাট্যপ্রিয়তারই নিদর্শন। ভুললে চলবে না, প্রধানতঃ গীতিকাব্যের আকারে এগুলি রচিত হলেও সহৃদয়ের আনন্দ আসরে তাল-লয় সহযোগে এই সব কাব্য গান করাই হতো; এবং স্বয়ং কবি পায়ে নুপুর আর হাতে চামর নিয়ে নেচে নেচে এই কাব্য সেই সব আসরে গান করতেন। একক গানই নয়, মাঝে মাঝে কবি বা গায়েন, আরও দু'একজন দোহার-এরও সাহায্য নিতেন, যারা কিঞ্চিৎ রূপসজ্জা গ্রহণ করে, আসরে নেমে নেচে গেয়ে এই সব কাব্য জনসমক্ষে পাঠ বা আবৃত্তি করতেন।

নাটকের সন্ধান

কাব্যের নাট্যগুণ ছাড়াও প্রাচীন বাঙ্‌লায় কিছু নাটকও যে রচিত হয়নি এমন কথা মনে করা ভুল হবে। নেপাল থেকে পাওয়া প্রাচীন বাঙ্‌লা নাটকগুলির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সংস্কৃত বেণীসংহার ইত্যাদি নাটক, অথবা চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে রচিত সংস্কৃত নাটক কিম্বা 'লক্ষ্মীস্বয়ম্বরা' যাত্রা এবং আরও পরবর্তী কালে রচিত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিমিশ্র নাটক চণ্ডী, অথবা বিদ্যানাথ বাচস্পতি রচিত "চিত্রযজ্ঞ" ইত্যাদি বিভিন্ন নাটকের সন্ধানও আমরা পাই।

অবশ্য একথা ঠিক যে কিছু নাটক পাওয়া গেলেও তার প্রযোজনা বা

অভিনয় সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। সম্ভবতঃ বাঙ্‌লা দেশে নাটমঞ্চ নির্মাণ করে কোন 'থিয়েটার' তখনও পর্যন্ত হয় নি। সংস্কৃত যুগের নাট্যকলা বাঙ্‌লায় মুসলমান আধিপত্য হেতু প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি বলেই হয়ত এমনটা হয়েছে; তবে 'যাত্রা'র মাধ্যমে নাট্যাভিনয়ের রসরূপটির সঙ্গে যে বাঙালী জনসাধারণ বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বয়ং চৈতন্যদেব পর্যন্ত নাট্যাভিনয় করতেন ধর্মভাব আস্বাদনের জন্য, চৈতন্য-জীবনীতে একথা উল্লিখিত আছে; গীতিকাব্যগুলির অভিনেয়ত্বের কথা তো আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। 'মসকরা' বা 'তামাসার' দলের কথাও আমাদের স্মরণে আছে।

অভিনয় প্রযোজনা

তবে এ কথা সত্য যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের যাত্রা বা গীতিকাব্যের অভিনেয়তার ধারা আধুনিক কালে আসে নি। আধুনিক থিয়েটার বিশেষ ভাবেই বাঙালী মানস-সংস্কৃতির ওপর পাশ্চাত্ত্য জীবন-দর্শন ও সাহিত্য-চেতনার ফলশ্রুতি। নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এবিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা আছে, বর্তমানে তার পুনরাবৃত্তি আমাদের নিষ্প্রয়োজন। সেই প্রসঙ্গে আধুনিক নাট্যকলায় ইংরেজদের প্রভাব যে কি ভাবে প্রাথমিক কালে সম্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে সংক্ষেপে দু'চার কথার অবতারণা বোধকরি অসঙ্গত হবে না।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালীর আমোদ-আহ্লাদের উৎস যাত্রা-গান উনবিংশ শতাব্দীর সীমায় এসে রুচিহীন ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত হয়েছিল। তার কদর্যতা ও পঙ্কিলতার হাত থেকে রেহাই পেতে চাইছিল নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত রুচিবান বাঙালী-মানস। অন্তত রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত "বিবিধার্থ সংগ্রহে" যাত্রাগানের প্রতি সমকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিদের এই ধরনের মনোভাবের নিদর্শন দেখতে পাই। যাত্রাগানের প্রতি এই অনাসক্তি তখন বাঙালী মনকে ইংরেজি থিয়েটারের দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

কলকাতায় ইংরেজী নাটক ও নাট্যশালা

ইংরেজরা তখন কোলকাতায় অনেকগুলি থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠা করেছে।

তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম মঞ্চটি কোলকাতায় ঠিক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জানা না গেলেও সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময় যে সেই মঞ্চ খুব জমজমাট ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। জানা যায় সিরাজের সৈন্য এই 'Play house'-এর মধ্যেই শিবির স্থাপন করেছিল এবং তারা এখান থেকেই নাকি ফোর্ট উইলিয়ম লক্ষ্য করে কামান দেগেছিল। যাই-হোক এই 'Play house'-এর পর ইংরেজরা একে একে সহরের বিভিন্ন জায়গায় অনেক রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেছে। যেগুলোর মধ্যে Calcutta Theatre, Chowrenghee Theatre, Sans Souci Theatre, Kidderpore Theatre, Baithakkhana Theatre, The Anthem, এবং হেরাসিম লেবেডেফের Bengalee Theatre, বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য লেবেডেফের থিয়েটার ছাড়া, আর কোন থিয়েটারেতে বাঙালীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে তা না থাকলেও তার প্রভাব যে বাঙালী মানসকে নিজস্ব থিয়েটার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে সে কথা একশোবার সত্য।

বাঙালী ছাত্রদের অভিনয় শিক্ষা ও প্রযোজনা

এইভাবে ইংরেজি থিয়েটারের প্রভাব ছাড়াও বাঙালী শিক্ষিত যুবকেরা সেকালে ইংরেজি নাটকের অভিনয়-শিক্ষা এবং প্রযোজনার সঙ্গেও পরিচিত হতে সুরু করেছিল স্কুল কলেজের মাধ্যমে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ হিন্দু কলেজের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় বাঙালী ছাত্রেরা "The King and the Miller, আর Shakespeare-এর Merchant of Venice নাটকের কিছু দৃশ্য গভর্নর হাউসে অভিনয় করেছিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্ররা এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার একাডেমীর ছাত্ররাও ইংরেজী নাটকের অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায় আর এই সব অভিনয় ব্যাপারে প্রধান উৎসাহদাতা এবং শিক্ষক ছিলেন সাঁ সুসী থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা মিঃ ক্লীঙ্গার।

স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অভিনয় ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন ওরিয়েন্টাল একাডেমীর ছাত্ররা। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এঁরা

Shakespeare-এর Othello, Merchant of Venice, Henry IV, ইত্যাদি নাটকের অভিনয় করে সখের থিয়েটারের আসর জমজমাট করে তুলেছিলেন। একাডেমীর অধ্যক্ষ জিওফ্রে সাহেব ছিলেন এই সব অভিনয়ের উৎসাহদাতা এবং শিক্ষক। ওরিয়েণ্টাল একাডেমীর যে সব ছাত্ররা অভিনয় ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রিয়নাথ দত্ত, রাধাপ্রসাদ বসাক, কেশব গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সবার অগ্রণী। এই সব যুবক ছাত্ররাই পরবর্তী জীবনে বাঙালীর নব্য থিয়েটার আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। কেবশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন নব্য বাঙ্লার প্রথম সার্থক নট এবং প্রযোজক, বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রথম নাট্যাচার্য।

ছাত্রাবস্থাতেই এই সব নাট্যরসপিপাসু যুবকেরা ইংরেজির পরিবর্তে বাঙ্লা নাটকের অভিনয় করার জন্য উদগ্রীব হন। অধ্যক্ষ জিওফ্রে অবশ্য সমর্থন করেননি তাঁদের বাসনা; তবু সেই বাধা তাঁদের দমিয়ে রাখতে পারে নি। দল বেঁধে এঁরা একাডেমী ত্যাগ করেন, এবং ভবানীপুরের টেগোর ক্যাসল রোডে হারান বসাকের বাড়ীতে একটি সখের দলের নাট্য-প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানে বহুবার সার্থকতার সঙ্গে রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন কুল-সর্বস্ব" নাটকের অভিনয় এঁরা করেছিলেন।

ফলকথা কোলকাতায় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা, এবং স্কুল কলেজে, রিচার্ডসন, ব্যারী, ক্লিঙ্গার, জিওফ্রের তত্বাবধানে ও শিক্ষার মাধ্যমে যে নাট্যাভিনয়ের স্পৃহা বাঙালী ছাত্রের মনে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে, তারই পরিপূর্ণ রূপ পরবর্তী কালের সখের দলের থিয়েটারের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে রূপায়িত হয়েছে। বাঙ্লা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস পাঠক মাত্রই সেকথা অবগত আছেন, সুতরাং সে বিষয়ে কোন আলোচনার পুনরাবতারণা বর্তমান প্রসঙ্গে নিতান্তই বাহুল্য বোধে আমরা বিরত হলাম।

চার

নাটকের উদ্দেশ্য

নাট্যকলার প্রাণবস্তু হলো অভিনয়। নাট্যকার তাঁর সহানুভূতিশীল মনন এবং বোধি দিয়ে যে চলমান জীবন-ছন্দকে রূপায়িত করেন, অভিনেতা সেই জীবনে রূপারোপ করেন সহৃদয় সামাজিকের হৃদয়সংবেদ্য করে। নাট্যকারের মনের কথাটি পল্লবিত ব্যাখ্যায় সুষ্ঠু সুন্দর করে সকলের সহজবোধ্য করে তোলেন অভিনেতা। তাই অভিনয় না হলে নাটকের পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা সম্ভব হয় না। নাট্যকলা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু আলোচনা করতে গেলে সেই জন্যেই অভিনয়কলার স্বরূপ ব্যাখ্যাও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

নাটকের কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্র-বিশ্লেষণ, সংলাপ রীতি, তার আঙ্গিক-কৌশল ইত্যাদি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে নাটকের সাহিত্যিক মূল্যমান নির্ধারণ করা যে একেবারে অসম্ভব তা অবশ্য নয়, কিন্তু রসবেত্তা সামাজিক মাত্রেই একথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, নাট্যকলার সেই বিচার তার সার্বিক মূল্যায়নের পক্ষে চরম এবং পরম বলে কখনই বিবেচ্য নয়, অন্ততঃ তা হওয়াটা বোধকরি উচিত নয়। কেননা কবি বা ঔপন্যাসিকের মতো কেবলমাত্র সাহিত্য রচনা করেই নাট্যকারের দায়দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না; তার ভাববস্তুকে সুষ্ঠু অভিনয়-আবৃত্তির মধ্যদিয়ে সামাজিক মানসে রসদ্বোধন এবং উপদেশ দান এই দুই কঠিন কর্তব্যের প্রতিও তাঁকে দৃষ্টি রাখতে হয়। পাঠক থেকে দূরে থাকলে কবির চলতে পারে, ঔপন্যাসিকেরও যে চলে না তা নয়, কিন্তু নাট্যকার সেই পন্থা অনুসরণ করলে চলবে না। সামাজিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অতি নিকট, কেন না তাদের চিত্তরঞ্জন এবং উপদেশ দানের মাধ্যম হল নাটক, এবং তিনি তাই প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের সঙ্গে বিজড়িত।

ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের দিকে তাকালেই আমরা নাটক এবং নাট্যকারের এই দায়দায়িত্ব যে কতখানি তা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারি।

নাটকের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে শাস্ত্রকার প্রথমেই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

"ন তজ্‌জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎ-কর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে ॥"

অর্থাৎ এমন জ্ঞান নেই, এমন শিল্প নেই, এমন বিদ্যা, কর্ম, ধ্যান নেই, যা নাকি নাট্যকলায় দেখা যায় না। এক কথায় তাঁর মতে নাটক হলো সর্বজ্ঞান-ধর্ম-শিল্পকার্যের সর্বাঙ্গসুন্দর সমন্বয়।

নাটক সম্পর্কে এতবড় সার্টিফিকেট পৃথিবীর আর কোন সমালোচক দিয়েছেন কিনা সন্দেহ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, যদি নাটককে কেবলমাত্র মানুষের চিত্তরঞ্জনকারী বলে মনে করা হতো, তাহলে তার সম্বন্ধে এত বড় কথা বলা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির মাঝে নাট্যশিল্পের অঙ্কুর নিহিত থাকলেও তার অতিরিক্ত আরো মহৎ উদ্দেশ্য নাটকের আছে। আর সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে গেলে নাট্যসাহিত্যের বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে আমাদের পূর্বাহ্নে কিছু আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

নাটক কাকে বলে এই প্রশ্নের ব্যাখায় ভরতমুনি বলেছেন যে, যার মধ্যে দেবতা, রাজা, মুনি, একথায় সর্ব মানুষের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা অভিনয়কলার সাহায্যে সর্বাঙ্গসুন্দর করে প্রকাশ করা যায় কেবলমাত্র সেই সাহিত্যকেই নাটক আখ্যা দেওয়া উচিত।

"দেবতানাং মুনীনাং চ রাজ্ঞামথ কুটুম্বীনাম।
কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥
যো হয়ং স্বভাব লোকস্য সুখ দুঃখ সমন্বিতঃ।
সোঽঙ্গাদ্যভিনয়োপেতো নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥"

ভরতমুনির এই সূত্রে নাট্যকলা যে চলমান জীবন ছন্দের অনুকরণ একথার স্পষ্টতই উল্লেখ আছে দেখতে পাই। পাশ্চাত্য নাট্যকলাবিৎ মনীষী আরিস্ততলও কাব্যকলার স্বরূপ ব্যাখায় এই অনুকরণের ওপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন। তাঁর মতেও imitation এবং delights in works of imitation, এই দুই প্রেরণাই হলো কাব্যকলার উদ্ভাবনার মৌলিক হেতু।

"It is clear that the general origin of poetry was due to two causes, each of them part of human nature. Imitation is natural to man from childhood, one of his advantages over the lower animals being this, that he is the most imitative creature in the world, and learns at first by imitation. And it is also natural for all to delight in works of imitation......"

অনুকরণ মানুষের স্বভাবজ বৃত্তি। এই অনুকরণ এবং তৎসঞ্জাত আনন্দই মানুষকে শিল্পসৃষ্টিতে প্রেরণা যুগিয়েছে, একথা অস্বীকার করবার কোন হেতু নেই। কিন্তু মৌলিক প্রেরণা যাই হোক না কেন, শিল্প-সাহিত্যের উদ্দেশ্য কখনই শুধুমাত্র অনুকরণ এবং তজ্জনিত আনন্দ উপলব্ধির মাঝে সীমিত থাকেনি। তাই নাট্যশাস্ত্রকার নাটকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে অনুকরণের কথা উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আমাদের অবহিত করেছেন—

"এতদ্রসেষু ভাবেষু সর্বকর্মক্রিয়াসু চ।
সর্বোপদেশজননং নাট্যং খলু ভবিষ্যতি ॥"

অর্থাৎ কেবলমাত্র অনুকরণ এবং আনন্দলাভ করলেই চলবে না, রসব্যঞ্জনার সাহায্যে আনন্দ এবং উপদেশ দান এই দুই-ই হলো নাট্য-সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। এক কথায় উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ রসবোধনের তত্ত্বকে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রকার স্বীকার করেন নি। কেননা সামাজিক মানোন্নয়নের দায়িত্বশীল কর্তব্য নাট্যকারের ওপর ন্যস্ত। আর কোন নাটক কতখানি এই দায়িত্ব পালনে কৃতকার্য হয়েছে, তার ওপরই নির্ভর করে রয়েছে তার সাহিত্যিক মূল্যমান।

এখন কথা হচ্ছে যে, এই দায়িত্ব নাট্যকার পালন করবেন কি করে? কবি বা ঔপন্যাসিক তাঁদের সংবেদনশীল মননের দ্বারা যে জীবন সত্য আহরণ করেন, বর্ণনার দ্বারা ছন্দোময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে তা জারিয়ে তোলেন

পাঠক-মনে। কিন্তু নাটকের সার্থকতা কেবলমাত্র পঠনে নয়; বক্তব্য বিষয়কে বিশেষ যত্নসহকারে দৃশ্যমান করে তোলাই হলো এর কাজ। আর এইখানেই হলো কাব্য আর দৃশ্য-কাব্যের মূলগত পার্থক্য। কাব্য অবিমিশ্র অনুভূতির বস্তু। সহৃদয় পাঠক আত্মমগ্ন হয়ে বিভোর চিত্তে কাব্যের রসচর্বণা করে থাকেন। কিন্তু নাটকের বেলা তার বর্ণনীয় বিষয়কে কেবলমাত্র দর্শকের অনুভূতির ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না; তাকে প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান করে তুলতে হবে।—নাট্য শাস্ত্রকার তাই নাট্যতত্ত্বের আলোচনায় কেবলমাত্র নাটকের বর্ণনীয় বিষয় নয়, তার অভিনেয় বিষয়েরও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন।

নাটকের সার্থকতা নাট্যকারের একক শক্তির ওপর নির্ভর করে না। তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে গেলে নাট্যকারকে আরো কতকগুলি সহযোগী শক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়। সুযোগ্য পরিচালক, সুশিক্ষিত নটগোষ্ঠী, গীতিকার, রূপসজ্জাকর, মঞ্চনির্মাতা হলেন সেই সহযোগী শক্তি, তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হয়ে, সুষ্ঠুভাবে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের ওপরেই নির্ভর করে নাটকের সর্বাঙ্গীন সার্থকতা। কেননা নাটক হলো যৌথ শিল্প এবং সামাজিক বর্গের যৌথ অনুপ্রেরণা ও কর্মক্ষমতার ওপরই তার সার্থকতা নির্ভরশীল।

নাট্যশিল্পের সার্থক স্ফুরণের জন্য যে সহযোগী শক্তির কথা আমরা উল্লেখ করেছি, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা হলো সূত্রধার-এর। 'সূত্রধার' শব্দটির অভিধানিক অর্থ হলো যিনি সূত্র অর্থাৎ সূতা ধারণ করেন। তার মানে নাটকের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য যিনি নাট্য-ব্যাপারের সর্ববিষয়ে সম্যকরূপে অবহিত হয়ে, তাকে সহৃদয় সামাজিক বর্গের হৃদয়সংবেদ্য করে তুলতে সাহায্য করেন, তিনিই হলেন নাটকের সূত্রধার। আধুনিক কালে নাট্য-পরিচালকের ওপরই সূত্রধারের দায়িত্ব এসে বর্তেছে এ কথা বলা বোধকরি বাহুল্যমাত্র।

এই সূত্রধার সম্পর্কে নাট্যকারের দাবি অনেক। তাঁকে গীতিবাদ্য শাস্ত্রে নিপুণ হতে হবে; নীতিশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের আচার-আচরণ,

লোকচরিত্র, তাদের বেশোপচার, পুরাণ, ভূগোল, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে বলে নাট্যশাস্ত্রকার দাবি করেছেন। 'সকলকলাপারং' বলতে যা বোঝায়, সূত্রধারকে তাই হতে হবে। চিত্তরঞ্জন এবং উপদেশ যদি নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়, তাহলে সূত্রধারকে 'সকলকলাপারং' হতে হবে বলে নাট্যশাস্ত্রকার যে দাবি করেছেন, তার যৌক্তিকতা স্বীকার করতেই হয়।

সূত্রধার-এর পরই নট, নাট্যকার, গায়ক, বাদক, আভরণকার, মালাকার, বেশকার, রজক, চিত্রকর, কারুশিল্পী ইত্যাদি প্রত্যেকটি সহযোগী শক্তির কর্মবিধি এবং দায়িত্ব সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রকার পৃথক পৃথক ভাবে বিস্তারিত উপদেশ দান করেছেন। কিন্তু সে সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করা বর্তমানে সম্ভব নয়। কেননা তাহলে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রখানাই আমাদের অনুবাদ করে দিতে হয়, তার চেয়ে বরং কৌতূহলী পাঠকের উক্ত শাস্ত্রখানি পড়ে নেওয়াই শ্রেয়; এবং কোন কারণে যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে সহৃদয় পাঠকবর্গকে মনোমোহন ঘোষ বিরচিত "প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা" এবং Indian Historical Quarterlyতে (Vol. IX pp. 591-594) শ্রীঘোষ কর্তৃক লিখিত The Hindu Theatre প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

অভিনয়

প্রথম অধ্যায়

এক

অভিনেতার দায়িত্ব

নাটক শুধু কাব্য নয়, দৃশ্য-কাব্য। কাব্যপাঠ একক মনের নিবিড় রসানুভূতির মধ্য দিয়েই সার্থক; কিন্তু নাটকের সার্থকতা সমষ্টির মিলন প্রাঙ্গণে। অভিনয়ের মধ্য দিয়েই এর প্রকৃত রসোত্তীর্ণতা। নাট্যকার জীবন মন্থন করে যে শিল্পবস্তু রচনা করেন, তাকে রূপে রসে সার্বজনীন করে পরিবেশন করেন প্রয়োগাচার্য আর এই প্রযোজনার জন্য অন্যান্য অনুষঙ্গ ছাড়াও যাঁকে সব প্রথম প্রয়োজন হয় তিনি হলেন অভিনেতা। নাট্যকার-সৃষ্ট চরিত্র-গুলিকে অভিনেতা ফুটিয়ে তোলেন মঞ্চে; তাঁর অভিনয়-কৃতিত্বের মাধ্যমেই দর্শকমণ্ডলী নাট্যরসকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করেন। সুতরাং নাট্য-প্রযোজনার ব্যাপারে একজন অভিনেতার ভূমিকা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। পূজামণ্ডপে প্রতিমার প্রয়োজন অস্বীকার করেনা কেউ, কিন্তু কেবলমাত্র প্রতিমার সুসজ্জ উপস্থিতিই উৎসব-আনন্দের হেতু নয়। মৃন্ময়ী প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন হয় সুচারু পৌরোহিত্য। পুরোহিতের কণ্ঠনিঃসৃত মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমেই মাটির পুতুল ঠাকুর হয়ে ওঠে, আনন্দ-উৎসবে মুখরিত হয় পূজাপ্রাঙ্গণ।

নটরাজের পূজাপ্রাঙ্গণে অভিনেতাই হলেন এই পুরোহিত। তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত মন্ত্রোচ্চারণেই হয় নাটকে প্রাণের প্রতিষ্ঠা, নাটমঞ্চ উৎসবমুখরিত হয়ে ওঠে। সাহিত্যের সবচেয়ে বড় সার্থকতা হলো তার রসোত্তীর্ণতায়। এই রস উপলব্ধি করেন সহৃদয় সামাজিক, কিন্তু সামাজিকের চিত্তে এই রসের উদ্বোধন করেন অভিনেতা। আলঙ্কারিকরা সাহিত্য-রসের স্বরূপ বিচার করে তাকে ব্রহ্মরসের সঙ্গে তুলনা করেছেন, আর সেই জন্যেই সাহিত্য-রসের আস্বাদকে ব্রহ্মস্বাদ সহোদর বলে চিহ্নিত করেছেন। ব্রহ্মস্বাদ সহোদর স্বরূপ এই যে শাশ্বত রসবস্তু, যা হলো সাহিত্যের তথা নাটকের প্রাণবীজ, সুশিক্ষিত

অভিনেতৃমণ্ডলীর সুষ্ঠু চরিত্র রূপায়ণের মধ্যদিয়ে সহৃদয় সামাজিক সেই অমৃতময় রসের আস্বাদন করে নিবিড় আনন্দ লাভ করেন। সুতরাং সমগ্র নাট্য-প্রযোজনার ব্যাপারে অভিনেতার প্রয়োজন এবং দায়িত্ব হলো সবচেয়ে বেশী। নাট্যকার যে সব চরিত্র সৃষ্টি করেন, সেই সব চরিত্রের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য, তাদের স্বভাব, তাদের সংস্কৃতি অনুধ্যান করে সম্যক ভাবে আয়ত্ত করেন অভিনেতা তারপর সেই আয়ত্ত চরিত্রকে আপনার মনন ও বোধির জারক রসে জারিয়ে রূপায়িত করেন মঞ্চে। আর এই কাজ যে নিতান্ত সহজসাধ্য নয়, তা বলা বাহুল্য মাত্র। সুষ্ঠুরূপে এই সুকঠোর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য চাই সহৃদয় মানস, যা নাকি একজন অভিনেতার সর্বপ্রধান গুণ হওয়াই সকল সময় বাঞ্ছনীয়।

নট অর্থাৎ অভিনেতার সঙ্গে নাটকের সার্থকতা যে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত, আজকের যুগে একথা জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার অপেক্ষা রাখে না; আর আজকের যুগেই নয় শুধু, আবহমান কাল ধরেই নাটকের সার্থকতার সঙ্গে নটের সাধনা বিজড়িত হয়ে আছে। অভিনয়-কলা যে প্রাচীন ভারতে কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তা নাট্যশাস্ত্রকে আলঙ্কারিকদের পঞ্চম বেদ বলে অভিহিত করার মধ্য দিয়েই সুস্পষ্ট বোঝা যায়। তাছাড়াও নাট্যাভিনয় দর্শনকে তাঁরা জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ পুণ্যকর্ম বলেও ঘোষণা করেছেন। আরণ্যক ভারতবর্ষের ধর্ম-সাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল বেদ অধ্যয়ন এবং যাগযজ্ঞ। এই বেদ নিতান্ত সাধারণ গ্রন্থ নয়. স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর এর রচয়িতা। বেদ রচনার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে এই ভাবে জড়িয়ে রাখার কারণ যে বেদের পবিত্রতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা, সে কথা বলাই বাহুল্য। এহেন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যে বেদ, তার সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের কথা সমান শ্রদ্ধায় উল্লেখ করা প্রাচীন ভারতের কাছে যে শুধু অসম্ভব ছিল তা নয়, আশ্চর্যও ছিল। কিন্তু তবু তা তাঁরা করেছেন, এবং নাট্যাভিনয় দর্শন করলে যে বেদপাঠ এবং যাগযজ্ঞের ফল আহরণ করা যায়, এমন আশ্চর্য কথাও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হননি।

"গান্ধর্বঞ্চৈব নাট্যঞ্চ যঃ সম্যগনুপশ্যতি !
লভতে সদগতিং পুণ্যাং সম ব্রহ্মর্ষিভির্নরঃ ॥"

অর্থাৎ, নাট্যকলার অভিনয় যিনি সম্যকভাবে দর্শন, শ্রবণ এবং উপভোগ করেন, তাঁর ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে অক্ষয় পুণ্যময় সদ্গতি লাভ সম্ভব হয়। এতবড় মন্তব্য নাট্যকলা সম্পর্কে যে দেশ করতে পারে সে দেশে অভিনেতার সম্মান কিন্তু খুব বেশী ছিলনা। অভিনেতা নট যিনি অনুকার্য অর্থাৎ নাটকের চরিত্রের অনুকরণে সামাজিক চিত্তে রসোদ্বোধন করে তাঁদের ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে অক্ষয় পুণ্যময় সদ্গতি লাভের পথ সুপ্রশস্ত করেন, তাঁরা হলেন শূদ্রকুলোদ্ভব, নীচ জাতীয়। সংস্কৃতিবান সামাজিকদের কাছে তাঁরা অস্পৃশ্য। সভ্যতাগর্বী ভারতীয় সমাজ এই সব নট-নটীদের জন্য সমাজের অভ্যন্তরে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও ছাড়তে রাজী হননি। অস্পৃশ্য শূদ্র, চোর, গণিকা, গ্রন্থিচ্ছেদক, আর অভিনেতার স্থান হলো নগরের বাহিরে। উর্বশী, মেনকা, রম্ভার নূপুরশিঞ্জিত প্রতি পদক্ষেপের তালে তালে স্বর্গের পারিজাত কাননের প্রতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হলেও তারা ছিল দেবগণিকা। রাজনটী বসন্তসেনাদের জন্য রাজাধিরাজরা, তাঁদের ঐশ্বর্য, বিত্ত, সম্মান সব কিছু বিসর্জন দিলেও, সাহিত্যিক এবং মুনিঋষিরা বার বার তাদের পায়ে ধ্যান ভঙ্গ করে তপস্যার ফল অর্পণ করলেও, তারা ছিল বারবনিতা। নট-নটীদের সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় মনীষার এহেন মনোভাবের কারণ সত্যিই দুর্জ্ঞেয়।

বহুযুগ পরে যদিও আজ নাট্যশাস্ত্রকারদের এই অদ্ভুত মনোবৃত্তির সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তবু মনে হয় নট-নটীদের প্রতি এই বিরূপ মনোভাবের কারণ নিহিত আছে প্রাচীন কালের সাহিত্যবোধের মধ্যে।

নাট্যকার বা কবি ছিলেন সর্বজনপূজ্য। স্রষ্টা শিল্পীকে স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা করে, তাঁর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আলঙ্কারিকেরা। আর তার পরেই হল দর্শকমণ্ডলীর স্থান, আলঙ্কারিকরা যাঁদের সহৃদয় সামাজিক বলে বার বার উল্লেখ করেছেন তাঁদের সমালোচনা শাস্ত্রে। প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রতিস্পর্ধী কবি তাঁর অনুকরণে যে অপূর্ব সৌন্দর্য-সুষমাময় দ্বিতীয় জগতের সৃষ্টি করেন, সেই সৃষ্ট জগতের রসস্বরূপ আস্বাদ করে অক্ষয় পুণ্যলাভের অধিকারী হন সহৃদয় সামাজিক অর্থাৎ কিনা দর্শকমণ্ডলী। আর এই

দুয়ের মাঝে ত্রিশঙ্কুর মত সংযোগসেতু রচনা করে চলেছেন—অভিনেতা। নাট্যকার চরিত্রের সৃষ্টি করেন, আর অভিনেতা সেই চরিত্রের অনুকরণ করেন। এই অনুকরণ-বিদ্যাও তাঁকে শিক্ষা দেন নাট্যাচার্য। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে নাট্য-প্রযোজনার ব্যাপারে সূত্রধার-এর যে দায়দায়িত্বের কথা প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিককরা স্বীকার করেছেন, সেই দায়দায়িত্বের কথা তেমন জোর দিয়ে অভিনেতার ব্যাপারে তাঁরা উল্লেখ করেন নি। অভিনেতারা হলেন নাটকীয় চরিত্রের অর্থাৎ অনুকার্যের অনুকর্তা মাত্র। কেবলমাত্র অনুকরণ করাই তাঁদের কাজ। নাটকের রসবস্তুর ব্যাপারে তাঁদের মাথা-ঘামানর কোন দরকার নেই। কেননা নাটকের রসসম্পদ নিহিত আছে হয় অনুকার্য চরিত্রগুলির মধ্যে, নয়ত বা ভোক্তা সামাজিকের মধ্যে। অন্তত নাট্য-সাহিত্যের রসনিষ্পত্তির আলোচনায় লোল্লটাচার্য ও শঙ্কুক এই ধরনের বাদানুবাদেই প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

নাটকে রসের প্রকৃত আশ্রয় কে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ভট্ট লোল্লট অনুকার্য চরিত্রকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এই সম্পর্কে তিনি যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন অলঙ্কার শাস্ত্রে তা উৎপত্তিবাদ বলে অভিহিত। লোল্লটা-চার্যের এই মত কিন্তু সকলে মানেন নি। বিশেষ করে ভট্ট শঙ্কুক তাঁর অনুমিতি-বাদে লোল্লাটাচার্যের বিপরীত মতই পোষণ করেন দেখতে পাই, কেননা তাঁর মতে নাট্যরস অনুকার্য বা অনুকর্তায় নেই, রসোদ্বোধন হয় সহৃদয় সামাজিকের হৃদয়ে। "চর্বনা চ সামাজিকানাম্ ইতি তেবে রস ইতি ব্যবহারঃ"। বর্তমান প্রসঙ্গে এই অনুমিতি এবং উৎপত্তিবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা করবো না। তবে এটুকু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, নাটকের রস অনুকার্য চরিত্রেই থাকুক, অথবা ভোক্তা সামাজিকেই থাকুক, নটের কাজ কেবলমাত্র অনুকরণ করা ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নট যদি কেবলমাত্র অনুকর্তাই হন, তাহলে কি রসচর্বনার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ ভাবেই নিস্পৃহ? প্রশ্ন একটা উঠেও ছিল, এবং আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রই তার উত্তর দিয়েছেন। তাঁদের মতে রসচর্বনা নটের পক্ষেও স্বাভাবিক, এবং যেহেতু তাঁরাও মানুষ, অনুকার্য চরিত্রের সুষ্ঠু অনুকরণে সামাজিক মানসে

রসোদ্বোধন করেন, সেই হেতু মাঝে-মধ্যে তাঁদের হৃদয়েও অমৃতময় রস উপলব্ধির কারণ ঘটতে পারে, কেননা—আলঙ্কারিকের ভাষায়—

"ন চ নটস্য রসো ন ভবতীত্যেকান্তঃ। পণ্য স্ত্রিয়োহি-ধনলোভেন পররত্যর্থং রতাদি বিপঞ্চয়ন্ত্যঃ কদাচিৎ স্বয়মপি পরারং রতিমনুভবন্তি। গায়কাশ্চ পরং রঞ্জয়ন্তঃ কদাচিৎ স্বয়মপি রজ্যন্তে। এবং নটহোপি রামাদিগতং বিপ্রলম্ভাদ্যনুকুর্বানঃ কদাচিৎ স্বয়মপি তন্ময়ীভাবমুপযা-ত্যেবেতি তদ্গতা অপি রোমাঞ্চাদয়স্তত্র রসং গময়েয়ুরেব।"

অর্থাৎ, নটের পক্ষেও যে রসানুভূতির সম্ভাব্যতা একেবারে নেই তা নয়। কেননা বারবনিতা অর্থের লোভে পথিকের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হলেও, সেই পথিককেই যে সে কোন কোন ক্ষেত্রে হৃদয় দান করেছে, এ দেখা যায়। যারা গায়ক, তারা গান গেয়ে শ্রোতার মনোরঞ্জন করলেও সময় সময় আপনার অজ্ঞাতসারেই রাগপরবশ হয়ে ওঠে। সুতরাং যে নট রামাদিগত বিপ্রলম্ভের অনুকরণ করে সে যে কোন ক্ষণে, কোন মুহূর্তে তন্ময় হয়ে তদ্গতচিত্ত হবে না, এমন কোন কথা নেই।

তবে কথা হলো এই যে, তেমন সৌভাগ্য অল্প কয়েকজন নটের ভাগ্যেই ঘটে, এবং তা হামেশা হতে থাকলে সামাজিকের রসচর্বনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সুতরাং নটের নিরস্ত থাকাই উচিত। তাঁর ক্ষেত্র অনুকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্তত তাই থাকাটা বাঞ্ছনীয় বলেই ভারতীয় আলঙ্করিকরা স্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয়ত নাট্যকলা ব্যাপারটা মূলতঃ অনুরঞ্জনের জন্য। যদিও চিত্তরঞ্জন ছাড়াও এর আরো অন্য উদ্দেশ্য আছে। আর এই অনুরঞ্জন ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ ছিল রাজা-মহারাজা এবং তাঁদের আশ্রিত কতিপয় ব্যক্তির মধ্যেই; বলা বাহুল্য আলঙ্কারিক-বর্ণিত সহৃদয় সামাজিক ছিলেন এই সব রাজকৃপাভিষিক্ত ভাগ্যবানের দল, আপামর জনসাধারণের সঙ্গে যাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না। সমাজের উচ্চ এবং অভিজাত শ্রেণীর এই সব ব্যক্তিরা নাট্যাভিনয় দর্শনে পুলকিতচিত্ত হলেও অভিনয়-কলায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতেন না, তার জন্য প্রয়োজন হতো সাধারণ মানুষের। নাট্যাচার্য বা সূত্রধার হয়ত

ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তি; সাধারণ মানুষকে নাটকীয় চরিত্রের অনুকরণীয় দিকগুলি উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়ে তিনি তাদের অভিনয়ের উপযুক্ত করে তুলতেন। স্বাভাবিক ভাবেই এই সব অভিনেতারা তাই ছিলেন দৈনন্দিন জীবনে অপাংক্তেয়।

দ্বিতীয়ত প্রাচীন ভারতে নাটকের নারী-চরিত্রগুলি খুব সম্ভবত রমণীদের দ্বারাই অভিনীত হতো, কেননা প্রথমত সমাজে তখনও নারী-অবরোধের প্রথা সুকঠোর হয়নি, দ্বিতীয়ত বসন্ত, রতি ইত্যাদি নানা উৎসব উপলক্ষ্যে অভিজাত মহিলারাও প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতেন, তৃতীয়ত সমাজে বারবিলাসিনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। এছাড়াও দেবমন্দিরে যে সেবাদাসী-প্রথা ছিল, এবং তারা যে নৃত্যগীত-পটীয়সী ছিল, একথা কারো অবিদিত নেই। রমণীকুলের এহেন অবাধ গতিবিধি যখন সমাজে প্রচলিত ছিল, তখন নাটকের নারী-চরিত্র যে রমণীদের দ্বারাই অভিনীত হবে, এতে তেমন আশ্চর্য হবার বোধ করি কিছু নেই।

এই সব রমণীকুল নিশ্চয় পট্টমহাদেবী ছিলেন না। নর্তকী এবং বারবনিতাদেরই খুব সম্ভবত অভিনয় কাজে নিযুক্ত করা হতো। আমাদের মনে হয় সমাজের নিম্নস্তর থেকে অভিনয় কার্যের জন্য নট-নটী সংগ্রহ করা হতো বলেই, নাট্যশাস্ত্রকার সূত্রধার অথবা নাট্যাচার্যের তুলনায় অভিনেতার সামাজিক মান অনুন্নতই রেখেছেন।

অভিনেতাদের জীবনে এই ভাগ্যবিড়ম্বনা কেবল মাত্র প্রাচীন ভারতেই নয়, সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে আধুনিক যুগের প্রথম-দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত তার ঢেউ এসে পৌঁছেছিল দেখতে পাই। সামাজিক সম্মান বিংশ শতাব্দীর মধ্য দশক পর্যন্ত অভিনেতাদের ভাগ্যে জোটেনি, অথচ অভিনয়-কলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অভিনয় দেখে উল্লসিত হননি এমন সামাজিক বোধ করি বিরল।

আমাদের মনে হয় ভারতের সমাজ-ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। হিন্দু যুগের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সমাপ্তির পর দেশ যখন বিদেশী শক্তির

পদানত হলো, তখন সেই বিধর্মীদের করালগ্রাস থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য সামাজিক অনুশাসন ক্রমশই কঠোরতর হতে লাগল। রক্ষণশীল সমাজ, মানুষের সামান্যতম ত্রুটি বা পদচ্যুতিকেও তখন আর ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারল না। ইসলাম ধর্মের প্রভাবে এবং অত্যাচারে নারী-সমাজে সৃষ্টি হলো কঠোর অবরোধ-প্রথা, তাছাড়াও ফারসী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মানস হয়ত বা নিজের অজান্তেই অভিনয়কলার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল, কেননা নবাগত ইসলামধর্ম নাট্যকলার পরিপোষণ করে নি।

এই সব নানা কারণে দেশে যখন অভিনয়-কলার প্রাগ্রসরতা ব্যাহত হলো, তখন স্বভাবতই যারা অভিনয় করতো, বিশেষ করে অবরোধ ভেঙে যে সব মেয়েরা জীবনের কোন কোন অপরাধের জন্য সমাজচ্যুত হলো, তাদের সঙ্গে সামাজিকরা কোন যোগসম্পর্কই রাখলেন না। ঐশ্বর্যগর্বী সভ্যতার মদমত্ত বিলাসব্যসনের ফলে এবং রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কঠোর অনুশাসনের ফলে দেশে বারবনিতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন নতুন করে নাট্যকলার অগ্রগতি শুরু হলো, তখন এই সব বারবনিতারাই অভিনেত্রী হতে এগিয়ে এলেন, কেননা, সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মহিলারা অবরোধ ভেঙে অভিনয় করবেন একথা চিন্তা করাও তখন বাতুলতা ছিল মাত্র। আর যে সব শিক্ষিত যুবকেরা এই সব বারবনিতার সংসর্গে এলেন অভিনয়কলার মাধ্যমে, তাঁরাও হলেন সমাজচ্যুত।

সামাজিক অবহেলা আর অশ্রদ্ধা অভিনেতৃ গোষ্ঠীর মনেও সৃষ্টি করল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। অভিনয়কলাকে রুজি-রোজগারের মাধ্যম করে নেবার পর তাঁরা এর প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হলেন। তারপর কতকটা সমাজের প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমানে, এবং কতকটা সংসর্গদোষে তাঁরা সাধনা ভুলে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন। সমাজের পদস্থ শ্রেণীর কাছে নাটক হয়ে দাঁড়াল দু'দণ্ড আনন্দ পাবার মাধ্যম, আর অভিনেতার সংজ্ঞা দাঁড়াল মদ্যপ, চরিত্রহীন বারবনিতা-বিলাসী বলে। ক্রমশই তাঁরা সামাজিক শ্রদ্ধা-ভক্তির আওতা থেকে দূরে সরে দাঁড়ালেন। সমগ্র অভিনেতা-সমাজকে এই নিদারুণ আত্মগ্লানি আর অবক্ষয়ের হাত থেকে প্রথমে গিরিশচন্দ্র, পরে শিশির

কুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীরা কিছুটা রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য তাঁরাও হতে পারেননি।

কিন্তু যুগ বদলেছে। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের রাষ্ট্র আজ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সামাজিক পুনর্বিন্যাসের পথে অগ্রসর। সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন হয়েছে। অভিনয়-শিল্প কেবলমাত্র চিত্তরঞ্জনী না হয়ে লোকশিক্ষার বাহন বলেও আজ সর্বজনস্বীকৃত। নতুন যুগের নতুন আলো অভিনেতৃ-সমাজকেও আলোকিত করে তুলেছে আজ। বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, গঙ্গাপদ বসু, প্রমুখ নাট্যতপস্বীদের অক্লান্ত তপস্যায় আজ নাট্য-আন্দোলনের ধারা পরিপূর্ণ সার্থকতার পথে প্রাগ্রসরিত। অভিনয়-শিল্প কঠোর সাধনা এবং নিষ্ঠাসাপেক্ষ বলে স্বীকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অভিজাত শ্রেণীর নরনারী আজ এঁদের অনুসরণে অভিনয়-কলার উন্নতি সাধনে এগিয়ে এসেছেন। আজ আর অভিনেত্রী সংগ্রহে বারবনিতার আবাসে যেতে হয় না। শিক্ষিতা, রুচিবান মহিলারা আজ গৌরবের সঙ্গে অভিনয় করছেন। বহুযুগের অবহেলা আর অশ্রদ্ধার অভিশাপ আজ ধীরে ধীরে অপসারিত হতে চলেছে অভিনেতার জীবন থেকে। সুতরাং আজ আর প্রাচীন ভারতে অভিনেতার স্থান কোথায় ছিল বা কেন ছিল এ প্রশ্ন নয়; সামাজিক অনুশাসনের প্রতি নিদারুণ অভিমানের বশে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া নয়, আজ তাঁদের নতুন করে অভিনেতা-জীবনের দায়দায়িত্বের সম্পর্কে সচেতন হবার দিন এসেছে। কেননা যুগ-পরিবেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনদৃষ্টি যতই পরিবর্তিত হয়েছে, অভিনয়ের সংজ্ঞা ততই স্পষ্টতর হয়েছে আমাদের কাছে। আজ অভিনেতাদের কোন কারণেই ভুললে চলবে না যে অভিনয়-কলা হলো একটা জাতির কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির পরিচায়ক—A nation is known by its theatre.

দুই

অভিনেতাকে প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকরা অনুকর্তা বলেছেন। কেননা তাঁরা নাটকীয় চরিত্র অর্থাৎ অনুকার্যের চরিত্র, তাদের হাব-ভাব অনুকরণ করে, সহৃদয় সামাজিক চিত্তে রসের উদ্বোধন করেন। অভিনেতার দায়িত্বের আলোচনায় এই "অনুকরণ" শব্দটি বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সাধারণ ভাবে 'অনুকরণ, অর্থে আমরা "নকল" করা বুঝি। সুতরাং অভিনেতাকে যখন আমরা অনুকার্য চরিত্রের অনুকর্তা বলি, তখন বুঝতে হবে যে তিনি নাটকীয় চরিত্রের নকলকারী। কিন্তু কি নকল তিনি করবেন? প্রত্যেক মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, বোধবুদ্ধির তারতম্য আছে। তাদের দৈহিক দীর্ঘতা, খর্বতা, স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য, বলিষ্ঠতা, পঙ্গুতা আছে। আর এই সবের বিমিশ্র প্রতিক্রিয়ার ফলে একদিকে যেমন তাদের আচার-ব্যবহার, চলা, বলা, ওঠা বসায় পার্থক্য ঘটে, তেমনি মনের আবেগ অনুভূতি ধ্যান ধারণা এবং মানসিক প্রসারতার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আর ভুললে চলবে না যে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের এই সব বিভিন্ন, বিচিত্র মানুষের জীবনই নাটকের উপজীব্য। কেননা ভরতমুনির মতে "লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি"; অর্থাৎ কিনা লোকবৃত্তির অনুকরণই নাটক।

লোকবৃত্ত বিপুল এবং বৈচিত্র্যময়। আর এই বিপুল লোকবৃত্তই একজন অভিনেতার অনুকরণীয় বিষয়। সুতরাং এ 'অনুকরণ' কেবলমাত্র 'নকল' অর্থে প্রয়োগ করা উচিত নয়। লোকচরিত্রের বহিরঙ্গের হাবভাব নকল করা ক্যারিকেচার মাত্র। তাতে সাময়িক ভাবে স্থূল হাস্যরসের সৃষ্টি করে জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেলেও তাতে করে মানব-চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপটি পরিস্ফুট করা সম্ভব নয়। মানব-চরিত্রের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ সত্তার সমন্বয়ের ফলেই একটা চরিত্র পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। সুতরাং অভিনেতার কাজ হলো নাটকে যে সব চরিত্রের সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ সত্তাটির সম্যক বিশ্লেষণ করে, তজ্জনিত কারণে তাদের চরিত্রের যে

বাহ্যিক অভিব্যক্তি সম্ভব, ঠিক তাই অনুকরণ করা। এ কাজ যে সহজসাধ্য নয়, এমন কি সকলের সাধ্যায়ত্বও নয়, একথা বলাই বাহুল্য। অভিনেতার কাজ কি, একথার উত্তরে তাহলে আমরা বলতে পারি যে, নাট্যকারের জীবনমন্থন-জাত রসরূপ যে সব চরিত্রের সৃষ্টি, সেগুলোই যদি একজন নটের অনুকরণীয় হয়, তাহলে বাস্তব জগতের ধ্যান-ধারণা, বিচিত্র লোকচরিত্র, তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি, এবং সামাজিক স্তর বিন্যাসের তারতম্য অনুসারে তাদের জীবন-বোধ, সুখদুঃখ. ব্যথা-বেদনা, আবেগ-অনুভূতির বিচিত্র প্রকাশ সম্পর্কে একজন অভিনেতাকে সম্যকরূপে অবহিত হতে হবে। নাট্যকার যে সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, অভিব্যক্তির সাহায্যে তাদের বাঙ্ময় করে তোলাতেই নিহিত রয়েছে একজন অভিনেতার সার্থকতা। সুতরাং অভিনয় কেবলমাত্র লোকচরিত্রের অন্ধ অনুকরণ নয়। তাকে সার্থক করে তুলতে হলে অভিনেতার পক্ষে সুশিক্ষিত, রুচিবান এবং সংবেদনশীল মানস ও পরিশীলিত বোধের অধিকারী হওয়া একান্তই প্রয়োজনীয়। অভিনেতার জীবনে এই গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করে বিখ্যাত সোভিয়েত শিল্পী চেরকাশভ্ বলেছেন—

> "To master the role and fully understand the character one is to play is no easy task. One must know people, have a good store of life's experience and a mature world outlook—in other words, one must know life."

অর্থাৎ কোন চরিত্রকে সম্যকভাবে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়। একাজ যিনি করবেন, তাঁর অর্থাৎ সেই অভিনেতার লোকচরিত্র সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান, জীবন সম্বন্ধে সুপ্রচুর অভিজ্ঞতা, এবং বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্থ এবং পরিপূর্ণ ধ্যানধারণা থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এককথায় জীবনকে তার বহু বৈচিত্র্যময় colours ও shadesকে সম্পূর্ণভাবে জানা এবং আয়ত্ত করাটাই হলো একজন অভিনেতার প্রাথমিক দায়িত্ব। কেননা একজন অভিনেতা যদি মানব-চরিত্রের এই বিচিত্র জীবন-ছন্দের মূল কারণ এবং তার ঘনীভূত প্রকাশ

রীতি সম্পর্কে যথোচিত পরিমাণে অবহিত না থাকেন, তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হবেই একথা সুনিশ্চিত।

সুতরাং আমরা মেনে নিতে পারি যে, অভিনয়-কলা সম্পর্কে যে 'অনুকরণ' শব্দের ব্যবহার নাট্যশাস্ত্রকার করেছেন, লৌকিক অর্থে নকল করা বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়। কেননা নিছক কতকগুলি বাহ্যিক প্রবৃত্তির অনুকরণ করলেই সু-অভিনেতা হওয়া যায় না। বিখ্যাত অভিনেতা এবং প্রযোজক স্ট্যানিস্লাভস্কি-র মতে অভিনয় হলো সত্যকার সৃষ্টিশীল শিল্প, অভিনেতার অন্তরের ধ্যানধারণার গভীরতা থেকেই এর জন্ম। অভিনয়-শিল্পের মূলে মঞ্চের যান্ত্রিক কলাকৌশলের চমক নেই, এর মৌল প্রেরণা হলো শিল্পীর আন্তরিক আবেগ, আর তাকে রূপায়িত করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা।

বলা বাহুল্য যে, অভিনয়-কলা সম্পর্কে আধুনিক কালের এই সব মতামত অভিনেতাদের দায়দায়িত্বের কথাটাই আমাদের বেশী করে স্মরণ করিয়ে দেয়। খেলাচ্ছলে, বা কেবল মাত্র ব্যক্তিগত আমোদ-আহ্লাদের জন্য অভিনেতা হতে গেলে, সত্যকারের শিল্পীর জন্ম কোনদিনই সম্ভব নয়। এর জন্য চাই সাধনা, চাই নিষ্ঠা। সুগভীর অধ্যবসায় আর সুকঠোর তপস্যাই হলো সমস্ত সৃষ্টির মূলীভূত কারণ। তা সে সাহিত্যই হোক, সঙ্গীতই হোক, নৃত্য কিম্বা অভিনয়, যাই হোক।

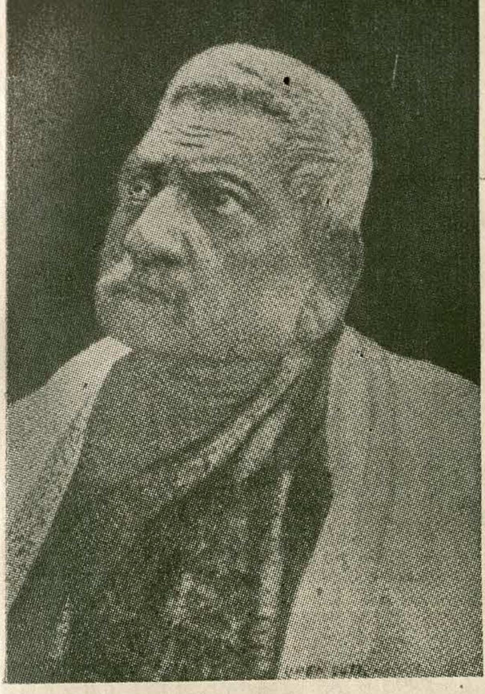
আমরা ওপরে অভিনয়-কলা সম্পর্কে যে "লোক বৃত্তের" অনুকরণ কথাটি ব্যবহার করেছি এইবার তার স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা যাক। লোক বৃত্তের অনুকরণ অর্থে মানুষের বাহ্যিক হাবভাবই শুধু নয়, তার শিক্ষাদীক্ষা রুচি সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, তার আন্তর প্রবণতাটিও একজন অভিনেতার আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু কি ভাবে তা তিনি আয়ত্ত করবেন এই প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে। উত্তরে বলতে হয় দর্শন অর্থাৎ observation-ই হলো এই অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রথম সোপান। রূপদক্ষ শিল্পী হতে গেলে একজন অভিনেতাকে দেখতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদের আচার আচরণ, তাদের শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি, তাদের কথা বলার ভঙ্গী, তাদের চলা ফেরা, ওঠা বসার বৈশিষ্ট্য সব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে হবে। খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে, তন্ন তন্ন করে দেখাই হলো একজন অভিনেতার লোক-চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রথম সোপান। এই বিশেষ ভাবে দেখার মাধ্যমেই অভিনেতার অভিজ্ঞতার ঝুলি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তিনি ধীরে ধীরে রূপদক্ষ শিল্পীতে পরিণত হন।

শিল্পীর জীবন-দর্শনের এই পর্যায়টার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে একদিন নট-নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য একটি সুন্দর উপমা দিয়েছিলেন, উপমাটি বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। অভিনয় কি এবং কেমন ভাবে করতে হয়, এই সম্পর্কে একদিন বিজনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে বসি। এ প্রসঙ্গে তিনি যে সব কথা বলেছিলেন, অভিনেতার সাধনা প্রসঙ্গে আমরা তার উল্লেখ করবো। লোক-চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য একজন অভিনেতার মানসিক গঠন কেমন হওয়া উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, অভিনেতার মন হওয়া উচিত সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রের মত। সিস্‌মোগ্রাফ হলো ভূমিকম্প অনুসন্ধানকারী এক যন্ত্র ; ভূ-পৃষ্ঠের যেখানে যত সূক্ষ্ম কম্পনই অনুভূত হোক না কেন, সিস্‌মোগ্রাফের কাঁটায় তা ধরা পড়বেই। ঠিক তেমনি মানব-চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলিও যদি অভিনেতার মানসে আন্দোলন না জাগায়, তাহলে তা তাঁর কাছে অজ্ঞাতই থেকে যাবে। অভিনেতার মনকে এই সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রের মত সদাসর্বদা সজাগ থাকতে হবে, যাতে এই চলমান জীবন-ছন্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দনকেও চুম্বকের মত সে সর্বদা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। কেননা নাট্যকার তাঁর শিল্পকলায় যে সব চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন, এবং যেগুলোকে নাকি একজন অভিনেতা রূপদান করে সঞ্জীবীত করবেন, সেগুলি চলমান জীবনের এই ছন্দস্পন্দন থেকেই উপজাত।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এ হলো মননের কথা। দর্শনের সঙ্গে এই মননের ব্যাপারটাও ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। কেননা কোন দেখাই সম্পূর্ণ বা সার্থক হতে পারে না যদি না তার পেছনে একটি সুশিক্ষিত এবং সংবেদনশীল মানস প্রক্রিয়া কার্যকরী থাকে। বিতৃষ্ণা এবং অবিদ্যা সার্থক অন্বেষার পথে চিরদিনই বিঘ্নের সৃষ্টি করে। কোন বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বিতৃষ্ণা

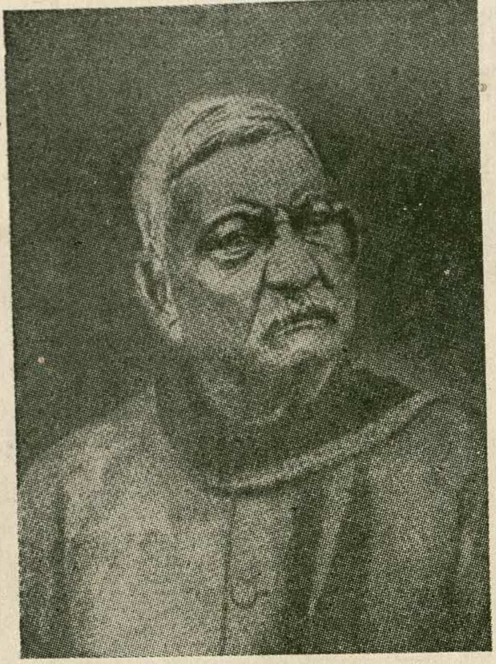
বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে
নটগুরু গিরিশচন্দ্র



দুরভিসন্ধি



বিভীষিকা



ঘৃণা ও বিরক্তি
নটগুরু গিরিশচন্দ্র



বক্তিয়ারের ভূমিকায় নাট্যাচার্য
শিশিরকুমার ভাদুড়ী

থাকলে, অভিনেতার পক্ষে সাধনা সিদ্ধ হওয়া যেমন কঠিন, তেমনি সংবেদনশীলতার অভাব এবং অপরিমার্জিত জীবনবোধও তাঁর সাধন পথের প্রধান অন্তরায়। নিয়ত প্রবহমান জীবন-ছন্দকে বিশেষরূপে দেখা এবং সম্যক উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন সংবেদনশীল মানস প্রক্রিয়ার। তিনি যা কিছু দেখবেন, তার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা না থাকলে, সে দেখা সম্পূর্ণ হবে না। কোন ব্যাপারের প্রতি একজন অভিনেতার তাই ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা থাকলে চলবেনা ; ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা নয়, হিংসা, দ্বেষ অথবা রিরংসা নয়, একজন অভিনেতাকে হতে হবে মহাপ্রেমিক। মনে রাখতে হবে অভিনেতা মানুষ হলেও ঋষিকল্প মানুষ এবং একমাত্র ঋষিকল্প মানুষেরই অভিনেতা রূপে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। আমাদের কথার অর্থ এই নয় যে, ঋষি না হলে অভিনেতা হওয়া চলবে না। বরং বাস্তব ক্ষেত্রে এর উল্টোটাই বেশীর ভাগ আমাদের চোখে পড়ে। ব্যক্তিগত জীবনে সন্তোষ জনক গতিবিধি নয়, এমন লোকও যে অভিনয় আসর মাতিয়ে রাখেন নি বা রাখতে পারেন না একথা সত্য নয়। তবে সেই আচরণ যে অভিনয় জীবনের পক্ষে বাধার সৃষ্টিকারী একথা একশো বার সত্য। কেননা পরিশুদ্ধ জীবনযাত্রা যদি কেউ না করেন, তাহলে সহজাত বৃত্তি এবং প্রতিভার বলে অভিনয় ক্ষেত্রে সাফল্যের পথে কিছু পরিমাণ প্রাগ্রসরিত হলেও, অসম জীবনযাত্রার অভিশাপগুলি একদিন অভিনেতার পরিশুদ্ধ মানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে। এবং সেক্ষেত্রে তাঁর জীবন দৃষ্টি ক্রমশ অস্বচ্ছ হতে হতে একদিন সম্পূর্ণ ভাবেই হয়ত হারিয়ে যাবে। কোন এক অভিশপ্ত প্রত্যুষে হয়ত অভিনেতা দেখবেন যে, তাঁর পূর্বেকার শক্তি আর নেই, যা তিনি করবেন বা করতে পারতেন বলে একদিন মনে হয়েছিল, শত চেষ্টা করেও আর তা তিনি করে উঠতে পারছেন না। শিল্পী-জীবনে ব্যর্থতার এই নিদারুণ জ্বালা তাঁকে দিবারাত্র দগ্ধীভূত করবে। একটা উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা তাঁকে তিলে তিলে সাধন-পথ থেকে বিচ্যুত করে পরিণামে আত্মম্ভরী সিনিকে করবে রূপান্তরিত। নিজের সঙ্গে নিজেই লড়াই করতে করতে সেই অভিনেতা একদিন হারিয়ে যাবেন—সমাপ্ত

হবে একটা প্রচণ্ড সম্ভাবনার। তাই বলছিলাম সব কিছুর মুলে চাই পরিশুদ্ধ মন। ঋষিদের মন সকল সংস্কার, বিদ্বেষ, বিরাগের উর্ধ্বে। সংসার সম্পর্কে বিরাগী না হয়ে, এই ঋষিকল্প মানস ঐশ্বর্যের যিনি অধিকারী, তিনিই, তাই অভিনেতা জীবনে সার্থকতার পথ খুঁজে পাবেন বলে আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। মনে রাখতে হবে, একজন শিল্পী শিশু, আবার ঋষি, তিনিই ভগবান। প্রজাপতি ব্রহ্মার যোগ্য প্রতিস্পর্ধী।

কথাটা হয়ত অনেকে একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে করতে পারেন। বলতে পারেন, একজন অভিনেতা, যিনি নাট্যকার-সৃষ্ট চরিত্রকে রূপ দেবেন, তাঁর দেওয়া সংলাপ মুখস্থ করে, সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলবেন, তাঁর সম্পর্কে এই দাবি করা, একটু অতিরঞ্জনের পর্যায়েই পড়বে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, অভিনেতা শুধু নাট্যকার-সৃষ্ট চরিত্রকে অনুকরণ করেন না। তাকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করেন নিজের-মনের রং মিশিয়ে। আর এই সৃষ্টি যিনি করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শিল্পী।

আবেগের কথা রেখে, আবার পুরনো কথায় ফিরে আসা যাক। আমরা বলছিলাম সংবেদনশীল মনের কথা। একজন অভিনেতার যদি মানসিক প্রসারতা না থাকে, বিভিন্ন ধর্ম ও মতের আদর্শ সংঘাতকে যদি উপযুক্ত ধৈর্য এবং তিতিক্ষার সংগে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করতে না পারেন, যদি কোন অন্ধ ভক্তি বা সংস্কার তাঁর স্বচ্ছ জীবন-দৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার শক্তি দূরে থাক, তাকে আংশিকভাবে উপলব্ধি করাও একজন অভিনেতার পক্ষে সম্ভব হবে না। এই সুস্থ জীবনবোধ তিনি আহরণ করবেন কোন পথে, এই প্রসঙ্গের আলোচনায় চেরকাশভ বলেছেন—

> Knowledge of life, not abstract knowledge of course,—is the basic qualification of an artist. And it is impossible to know and understand life, if one does not possess a mature world outlook. It is the only basis on which an artist can develop his powers

of observation, his interest in people, his ability to penetrate the depth of human character. It is the world outlook that guides him in his receptivity, his thoughts and his creative imagination.

অর্থাৎ, জীবন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করাই হলো একজন অভিনেতার প্রাথমিক কর্তব্য। আর এই অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন বিশ্ব-পরিস্থিতির জটিল আবর্তের সঙ্গে পরিচিত না থাকলে কখনই সম্ভব নয়। লোক-চরিত্র সম্পর্কে কৌতূহল, এবং সহানুভূতিই একজন শিল্পীকে মানব-চরিত্রের আন্তর সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হতে সাহায্য করে, তাঁর বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণের বাধা-গুলি ধীরে ধীরে অপসারিত করে দেয়; এবং এই ভাবে তাঁর চিন্তা ভাবনা, তাঁর সক্রিয় কল্পনাকে ক্রমশ উজ্জীবিত হতে সাহায্য করে।

অভিনেতাকে সদা-সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, তিনি মনে-প্রাণে লোক-সেবক, তাঁদের অনুরঞ্জক এবং শিক্ষক। তিনি যেমন একজন অবিমিশ্র স্কুল-মাষ্টার নন, ঠিক তেমনি রাজসভার বিদূষকও নন। একজন শিল্পী সহানুভূতি এবং সমবেদনার সঙ্গে লোক-চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন ক'রে, তারপর সেই উপলব্ধ সত্যকে আপন মনন ও বোধির সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করে তদ্গত চিত্তে আপন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অভিব্যক্তির সাহায্যে ব্যঞ্জনাময় করে তোলেন—যার মাধ্যমে সহৃদয় সামাজিক অর্থাৎ দর্শকমণ্ডলী অনুকৃত লোক-চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপটিই সুপরিস্ফুট দেখতে পান তা নয়, যে সব ভাবনা চিন্তা, বা প্রগাঢ় সমস্যা তাঁদের নিজের মনে কুয়াশার মত আবছায়া অবস্থায় থাকে, যার প্রকাশের সার্থক বাণীমাধ্যম খুঁজে না পেয়ে তাঁরা এক অব্যক্ত জীবন-যন্ত্রণায় অহোরাত্র বিদীর্ণ হন, সেই সব সমস্যার সমাধানের বলিষ্ঠ প্রকাশ-মাধ্যমও তাঁরা তখন খুঁজে পান নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে; পথ পান নিজের মনের ভাষাকে সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করার, অবসর পান নিজের ভুল-ত্রুটির সংশোধন করে সুস্থ সবল জীবন-পরিণতির পথে প্রাগ্রসরিত হবার।

অতএব অভিনয় ব্যাপারে একজন অভিনেতার দায়িত্ব কম নয়। কেননা

গণমানসের সঙ্গে তাঁর সংযোগ সর্বাপেক্ষা বেশী এবং প্রত্যক্ষ। অভিনয়-কলার ক্ষেত্রে নিজের এই দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ থাকলে আত্মম্ভরিতা বা অহংকারকে একজন অভিনেতা কখনই প্রশ্রয় দেবেন না। জীবনের পাঠশালায় অভিজ্ঞতার বিচিত্র পাঠ নেবার জন্য তাঁকে সর্বমানুষের সঙ্গে একাসনে বসতে হবে, কোন কারণেই তাদের উপেক্ষা করলে চলবে না।

তিন

আক্ষেপের বিষয় এই যে, অভিনয়-জীবনের এই দায়দায়িত্বের কথা অনেকেরই অনেক সময় মনে থাকে না। তাই অনেকেই হয়ত সহজাত ক্ষমতার বলে অভিনয় করলেও, কি করেন এবং কেন করেন এই উত্তর দিতে থৈ-হারা হয়ে যান। অপটু-পটুত্ব বলে একটা কথা আছে; সেই অপটু-পটুত্বের বোঝা অনেক অভিনেতার স্কন্ধেই বুড়ো সিন্দবাদের মত চেপে বসে আছে। কিন্তু এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি না পেলে সার্থক অভিনয়-প্রতিভার বিকাশ কখনই সম্ভব নয়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অভিনয়কালে অভিনেতারা এক অদ্ভুত মানস জটিলতার আবর্তে পাক খেয়ে আত্মহারা হন। একটা চরিত্রকে তার পরিপূর্ণ মর্যাদা না দিয়ে নিজেকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে তারপর প্রচণ্ড দাপটে সেই চরিত্রটির সমস্ত সত্তাকে আপন ব্যক্তিত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন করে তোলেন। এতে করে যে শক্তির প্রয়োজন হয় না, বা অভিনয় ভাল হয় না, এমন কথা কেউ বলে না। কেননা এও হলো অভিনয় করার একটা বিশেষ রীতি। তবু একটা কথা স্বীকার করতেই হয় যে, এই ধরনের অভিনয়ে—অভিনেতার ব্যক্তিত্বটাই প্রধান ভাবে সামাজিক অর্থাৎ দর্শককে আকৃষ্ট করে। যে চরিত্রটিকে তিনি সঞ্জীবীত করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তা অবহেলিতই থেকে যায়, তার সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার প্রকাশটি সামাজিক সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না। পরিবর্তে তাঁরা অভিনীত চরিত্রের ব্যথা-বেদনা বলে যা দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গৃহে প্রত্যাগমন

করেন, তা হলো সেই অভিনেতার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। এটা বঞ্চনাই। যত শক্তিই থাক, মানব-জীবনকে বাইরে থেকে অথবা আংশিক ভাবে দেখে, কিম্বা তাদের সম্পর্কে নিস্পৃহ নিরাসক্ত মন নিয়ে, তাদের চরিত্র রূপায়িত করা সম্ভব হলেও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে তা হলো ঔচিত্যবিরোধী।

> "...it is impossible to know life without taking an active part in it, by just looking at it from the side-lines. It is impossible to see what is most outstanding in a character or to portray him truthfully without properly understanding his place among men in society. This is law to the playwright who creates the character in writing and to the actor who re-creates the same character on the stage."

অর্থাৎ, জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত না থেকে, কেবল মাত্র বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ ভাবে জানা কখনই সম্ভব নয়। একটি চরিত্রের যথার্থ বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা কিম্বা সার্থকভাবে তাকে রূপায়িত করা অসম্ভব যদি না তাবৎ জনসমাজের মধ্যে তার স্থান কোথায় কিভাবে বিজড়িত তা জানা না থাকে। এই কথা যিনি নাটক রচনা করেন তাঁর কাছেও যেমন সত্য, যিনি মঞ্চে সেই চরিত্রকে সজীবীত করে তোলেন, তাঁর কাছেও ঠিক তেমনি সত্য।

ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ কখন কোনদিন সম্ভব হয় না। যতই শক্তি এবং সহজাত প্রতিভা থাক না কেন, চলমান জীবন-ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যদি কোন শিল্পী চলতে না পারেন, যদি অনবরত নাটকের চরিত্রে আপন ব্যক্তিত্বের আরোপ করে, তার আন্তর সত্তা ও বহিঃপ্রকৃতিকে সঙ্কুচিত করেন, তাহলে সাময়িক ভাবে শক্তিশালী নট হিসেবে সম্মান এবং শ্রদ্ধা লাভ করলেও পরিণামে সেই বঞ্চনা একদিন তাঁকে বিপর্যস্ত করবেই। কেননা শিল্পীর

দায়িত্ব নাটকের চরিত্রকে সম্যকরূপে অধিগত করে, তার সমগ্র সত্তাকে স্ফুটনোম্মুখ পুষ্পের প্রতিটি পাপড়ির মত ধীরে ধীরে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করা ; তাকে ক্ষুণ্ণ করে, সঙ্কুচিত করে, আপন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ-মাধ্যম করে নেওয়া নয়।

আধুনিক কালে নটকে কেবলমাত্র অনুকার্য চরিত্রের অনুকর্তা বলে থেমে থাকলেই তাই চলবে না। কেননা রাজা মহারাজা, অথবা মুনিঋষি কিম্বা দেবদেবীর কাল্পনিক কাহিনী বা নিছক চিত্তবিনোদনের জন্য আজ আর নাটক রচিত কিম্বা অভিনীত হয় না। তাবৎ জনসমাজ, আজ তাদের সমস্ত ব্যথা-বেদনা, আশা নিরাশা নিয়ে সসম্ভ্রমে, সশ্রদ্ধায় নাটমঞ্চে উপস্থিত হয়েছে, তাদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও সমবেদনা নিয়েই আজকের অভিনেতাকে সাধনার পথে এগিয়ে যেতে হবে। সুতরাং নাট্যাভিনয়ের ব্যাপারে আজকের যুগে নটের দায়দায়িত্বের ব্যাপারে সর্বাগ্রে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে অব্যবসায়ী নাট্যগোষ্ঠীগুলিকে আরো সচেতন হতে হবে। কেননা তাঁরাই নাটকের ক্ষেত্রে নতুন মত ও পথের পথ-প্রদর্শক। নাটক নিয়ে, তার প্রয়োগ-কৌশল এবং অভিনয়-ধারা নিয়ে, সর্বাগ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এগিয়ে যান এই সব অপেশাদার নাট্য-সাধকেরা। কেননা নাট্যব্যবসায়ের অর্থকরী মোহটাই তাঁদের কাছে প্রকটিত নয়। নাট্য-সাহিত্য এবং নাট্য-প্রয়োজনার শিল্পগত বৈশিষ্ট্যের দিকেই এঁদের প্রধানতম আকর্ষণ।

কিন্তু অপেশাদার সংস্থার উদ্দেশ্য এবং মতামত এই হলেও বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, আন্তরিক অবহেলা এবং অশ্রদ্ধার জন্য তাঁরা অকালে পথভ্রষ্ট, দিগভ্রান্ত। বেশীর ভাগ নাট্যগোষ্ঠীতেই যাঁরা অভিনয় করতে আসেন, তাঁরা সাময়িক আনন্দ (recreation) লাভের জন্যই আসেন। বড় পার্ট না পেলে দল ত্যাগ করা, অথবা পরিচালক যদি কোন অভিনয়েচ্ছু ব্যক্তিকে বেশ কিছুদিন কোন চরিত্রাভিনয়ের দায়িত্ব না দিয়ে বসিয়ে রাখেন, তাহলে দল ছেড়ে চলে যাওয়া, এসব ব্যাপার ঘটেনি এমন অপেশাদার সংস্থা বোধকরি কোলকাতায় খুব অল্পই আছে। এছাড়াও দলগত পরিচালনার ব্যাপারে মতানৈক্য, কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থকরী ভাগবাঁটোয়ারা অথবা ক্ষমতালাভের

দ্বন্দ্ব-সংঘাতও অভিশাপের মত অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলোকে ঘিরে আছে। অপেশাদার নাট্যসংস্থায় যাঁরা অভিনয় করতে আসেন, তাঁদের বেশীর ভাগের মধ্যেই অভিনয়-শিক্ষার বাসনা থাকে না; থাকে একটা অপক্ক দাম্ভিকতা, এবং অহঙ্কার। অনেকেই এমন ভাব দেখান যে তাঁরা যেন জন্ম থেকে বড় বড় প্রতিভাবান অভিনেতার সমকক্ষ প্রতিভাশালী; সব কিছু শেখা এবং জানা তাঁদের সমাপ্ত হয়ে গেছে। কেবল বাকী আছে তার প্রকাশটি অর্থাৎ displaying। এই অপক্ক দাম্ভিকতার যে কী বিষময় পরিণাম, তা যাঁরা অপেশাদার নাট্যসংস্থার সঙ্গে জড়িত আছেন, তাঁরাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারবেন, এ নিয়ে বিশদ আলোচনার অবতারণা বাতুলতা মাত্র।

কিন্তু ভুললে তো চলবে না যে, নাট্য-সাধনার ক্ষেত্রে এই সব অপেশাদার নাট্যসংস্থাই হলো প্রকৃত সত্যের পথ-প্রদর্শক। এই সব সংস্থার মধ্য দিয়েই শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান শিল্পীর আত্মপ্রকাশ সম্ভব। সুতরাং যাঁরা কেবলমাত্র দুদিনের সখের জন্য নয়, নাট্যকলাকে ভালবেসে সত্যকারের অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করবার দুর্মদ বাসনা নিয়ে অপেশাদার নাট্যসংস্থা গড়ে তোলেন অভিনেতার দায়দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁদের সর্বপ্রথম অবহিত হওয়া প্রয়োজন। পরিশেষে আমরা তাই অভিনেতার জীবনের দায়দায়িত্বগুলির কথা আর একবার সংক্ষেপে স্মরণ করে নিতে চাই।

(ক) আজকের যুগের অভিনেতাকে মনে রাখতে হবে যে, তিনি জনসাধারণের সেবক। তাদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, তাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম বিশ্বাস, তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মনন ও বোধের চক্রাবর্ত কেন্দ্র করে দৈনন্দিন জীবন-ছন্দে যে নিত্যনূতন সমস্যার বুদ্বুদ পরিলক্ষিত হয়, সেইগুলিকে প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে রূপদানের জন্যই আজকের অভিনেতা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

(খ) লোক-চরিত্র সম্পর্কে অভিনেতার মনে কিছুমাত্র বিরক্তি বা নিস্পৃহতা থাকলে চলবে না। একজন অভিনেতা সকল হিংসা, দ্বেষ, রিরংসার উর্ধ্বে। কেননা সেগুলি তাঁর মানসিক প্রসারতাকে সঙ্কুচিত করে, এবং তা চরিত্রের সুষ্ঠু রূপায়ণের পথে প্রধানতম অন্তরায়।

(গ) জনসাধারণের মনের কথা বলবার যোগ্য অধিকার, তাদের প্রতি সংবেদনশীলতা এবং সশ্রদ্ধ ভালবাসা দিয়েই আয়ত্ত করতে হবে। কোন রকম আত্মগর্ব বা অহমিকাবোধ একজন অভিনেতার থাকা উচিত নয়; কেননা অবচেতন মনের এই অহমিকা অভিনেতার শুদ্ধসত্ব চিত্তকে কলুষিত করে, তাঁর সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করে।

(ঘ) ব্যক্তিগত জীবনে শুদ্ধসত্ব থাকাটাই অভিনেতার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। তিনি এমন কোন কাজ কখনই করবেন না, যাতে করে তিনি জনসাধারণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হন।

(ঙ) জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংযোগ, বিশ্ব-পরিস্থিতির নিত্য পরিবর্তনশীল ইতিহাস, আপন মাতৃভূমির শিক্ষাদীক্ষা সংস্কার, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশবাসীর আচরণের প্রকৃত স্বরূপ, একজন অভিনেতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

(চ) নাটকের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য অবহিত না হয়ে কেবলমাত্র সখের খাতিরে অভিনয় করতে আসা অপরাধ। মনে রাখতে হবে, দেবমন্দিরে যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকে তা জনসমাজের ভক্তির রসে সিঞ্চিত। তাকে পূজা করা হয়। খেলা করার বস্তু সেটা নয়। অভিনেতাও নটরাজের সেবক; নটরাজের আসরে দুদিনের সখের ফুর্তি করতে আসা অভিনেতার উদ্দেশ্য নয়।

এই সব দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখে অভিনয়-সাধনার জন্য যদি কেউ অগ্রসর হন, তাহলে তাঁর সার্থকতা হয়ত সম্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিনয়ের শ্রেণীবিভাগ

এক

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা অভিনেতা জীবনের আচরণীয় দায়দায়িত্বের কথা যথাসাধ্য আলোচনা করেছি ; বর্তমানে সেই দায়দায়িত্ব পালনের পর একজন অভিনেতা কেমন করে অভিনয় করবেন, সেই প্রসঙ্গে আলোচনার অবতারণা করবো।

এ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি তাতে করে এই কথাটি অন্তত সুস্পষ্ট ভাবেই প্রতিপন্ন হয়েছে যে, অভিনয়-কার্যটা নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। আপন কর্তব্যকর্ম, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে যে অভিনেতা পরিপূর্ণভাবে সচেতন, তাঁর শিল্প-কৃতিত্ব সার্বিক সার্থকতার পথেই ধীরে ধীরে প্রাগ্রসরিত হয়। এ প্রসঙ্গে সোভিয়েত শিল্পী চেরকাসভের একটি সুন্দর মন্তব্য আছে। অভিনয় এবং অভিনেতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একজন অভিনেতার মানসিক গঠনটি কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় তা বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন—

> "An actor who has set himself the task of serving his people···must be a man of firm convictions, a man of ideal and clear purpose."

অর্থাৎ একজন অভিনেতা যিনি নিজেকে লোক-সেবার উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করেছেন, তাঁর জীবনের সুদৃঢ় প্রত্যয়, তাঁর উদ্দেশ্য এবং কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন মনোভাব, অর্থাৎ নিষ্ঠাপূর্ণ আদর্শবোধ অবশ্য প্রয়োজনীয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, অভিনয় সাধনার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, দায়িত্বশীল শিল্পী-মানসের দুর্নিবার আবেগ ও সাধনাই হলো অভিনয় জীবনে সার্থকতা লাভ করবার প্রাথমিক সোপান।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, অভিনেতা-জীবনের এই কঠোর সাধনার কথাটি অনেকের কাছেই সুস্পষ্ট নয়। অভিনয় করে না কে? আধুনিক কালের

সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বোলালেই দেখা যাবে, যে অভিনয় সমারোহ আজ আর কেবলমাত্র নগর কোলকাতার চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ নেই; তাকে ছাড়িয়ে দূর নগর দূর গ্রামেও আজ অভিনয় মহোৎসব সুরু হয়ে গেছে। অফিস কর্মচারী, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসক সম্প্রদায়, সকলেই রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করে, বছরে অন্তত একটা নাটকের অভিনয়ও করে থাকেন। এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন উৎসব-আনন্দ উপলক্ষ্য করে আবহমান কাল ধরে যে নাট্যাভিনয়ের রীতি চলে আসছে, আধুনিক কালেও তার গতি অব্যাহত। অধিকন্তু আছে বিভিন্ন অপেশাদার নাট্যসংস্থা। ব্যক্তিগত আনন্দ অর্জন নয়, নাট্য-প্রযোজনা, নাট্যাভিনয় এবং নাট্যরচনার মধ্য দিয়ে যাঁরা নাট্য শিল্পকে প্রাগ্রসরিত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ফলকথা আজ নাট্যকলা বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত হয়ে গেছে; বর্ষার কলহাস্য মুখরিত স্রোতস্বিনী নদীর মতই আজ দুর্নিবার তার গতি। কিছু ধ্বংস, কিছু ভাঙন আছেই; স্বাভাবিক ভাবেই খাত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কোথাও কোথাও হয়ত রুক্ষ চর ভেসে উঠছে, তবু খর নদীর সেই স্রোতের মধ্যে আছে শস্য শ্যামল সবুজাভ জীবনের বর্ণবিচ্ছুরণ; নতুন প্রাণ, নবতর স্বপ্ন-চেতনার সার্থক ইশারা। অভিনয়-কলার এই ব্যাপক জনপ্রিয়তার যুগে সমাজের সর্বস্তরের, সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে যখন অভিনয় এষণা আজ প্রবল, তখন এর স্বরূপ সম্পর্কে কিছু কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

দুই

প্রাচীন ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনি অভিনয়-কলার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাকে মোটামুটি ভাবে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে অভিনয়-কলার প্রক্রিয়া হলো চতুর্বিধ; যথা—

ক ॥ আহার্য

খ ॥ বাচিক

গ ॥ আঙ্গিক

ঘ ॥ সাত্বিক

বলা বাহুল্য এগুলি অভিনয়ের কোন বিশেষ ধারা নয়। অভিনয়-কলার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিল তারই নিদর্শন মাত্র। কিন্তু সে যাই হোক, নাট্যশাস্ত্রকার-বর্ণিত অভিনয়-কলার এই শ্রেণীবিভাগগুলির পৃথক ভাবে পরিচয় গ্রহণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে, এগুলির মধ্যে অভিনয়-কলা সম্পর্কিত কতকগুলি মূল সত্যের ইঙ্গিত বর্তমান আছে, যার অনুশীলন আধুনিক অভিনয়-কলা সাধকদের কিছু কিঞ্চিৎ পথনির্দেশ করতে সক্ষম। সুতরাং অভিনয়-কলা সম্পর্কে আধুনিক কালের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্বগুলির আলোচনার পূর্বাহ্নে আমরা নাট্যশাস্ত্রকার-বর্ণিত অভিনয়-কলার উল্লিখিত শ্রেণীগুলি সম্পর্কে পৃথক ভাবে আলোচনার অবতারণা করে, অভিনয়-কলা সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রকারের মনোভঙ্গীর কিছু পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করবো।

ক ॥ আহার্য অভিনয়

প্রথমে "আহার্য অভিনয়ের" কথা ধরা যাক। এই আহার্য অভিনয়ের সঙ্গে নটের প্রত্যক্ষ ভাবে কোন সম্পর্ক নেই, কেননা এর মাধ্যমে শাস্ত্রকার নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে মঞ্চ ও রূপসজ্জার উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করেছেন। আমরা জানি নাট্যাভিনয় হলো মানুষের যৌথ শিল্প-চেতনার পরিপূর্ণ প্রকাশজাত শিল্প। একক ব্যক্তিত্ব, তাঁর বোধি ও মনন, নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হলেও সমবেত শিল্পীগোষ্ঠী ও করণিকের সুযোগ্য সহযোগিতায় তা সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। ব্যষ্টিকে ছাড়িয়ে সমষ্টির চেতনায় বিশ্বাসী না হলে, অন্যান্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, নাট্যশিল্পের সুষ্ঠু ক্রমবিকাশ নিঃসন্দেহে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অতএব নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে যৌথ জীবন-চেতনার প্রাধান্য সর্বাগ্রগণ্য।

নাট্যাচার্য ভরত নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই যৌথ জীবন-চেতনাকে অস্বীকার করেন নি। তাই অভিনয়-কলার শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে সর্ব প্রথম আহার্য অভিনয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। নাট্য-প্রয়োগ ব্যাপারে মঞ্চসজ্জা, অনুকার্য চরিত্রের উপযোগী সাজসজ্জা ও রূপসজ্জা নাট্যবিষয়কে

দর্শক-সম্মুখে চিত্রায়িত করার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। উল্লিখিত সাজসজ্জা ও মঞ্চোপকরণ হল নাট্য-প্রযোজনার ব্যাপারে নেপথ্যের বস্তু। আহার্য অভিনয় তাই এই নেপথ্য সজ্জার আলোচনায় নিয়োজিত।

আধুনিক কালের মত অঙ্কিত দৃশ্যপটের ব্যবহার প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল না। তখন নাট্যবর্ণিত দৃশ্যগুলিকে সামাজিকের হৃদয়ে সম্যকরূপে প্রতিভাসিত করবার উদ্দেশ্যে সাধারণ ভাবে নাট্যকাররা কাব্যময় বর্ণনার সাহায্য গ্রহণ করতেন। আর নট-নটী সেই কাব্যময় সংলাপের সুষ্ঠু আবৃত্তিতে সংঘটিত দৃশ্য-পরিস্থিতিটি সমবেত দর্শকমণ্ডলীর কাছে প্রাণবন্ত করে তুলতেন। যার ফলে সামাজিকের মনে ঘটমান দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে একটি সুন্দর প্রত্যয় সম্ভব হতো। কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের প্রারম্ভে মৃগলুব্ধ রাজা দুষ্মন্তের মৃগয়া দৃশ্যটির কথা প্রসঙ্গত মনে পড়ে। উক্ত দৃশ্যে "গ্রীবাভঙ্গাবিরামং……" ইত্যাদি শ্লোকটির কথা সকলেই অবহিত আছেন। উক্ত শ্লোকটি দৃশ্যপট ব্যতীত কেবলমাত্র বর্ণনার সাহায্যে ঘটমান দৃশ্যের চিত্রকল্প সামাজিক মানসে প্রতিভাসিত করার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। কেবল কালিদাস নয়, সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের পাতায় পাতায় এই ধরনের কাব্যময় বর্ণনাত্মক শ্লোক ছড়িয়ে আছে, সংস্কৃত নাটকের আগ্রহী পাঠকের কাছে সে কথা অজানা নয়। কিন্তু এই সব বর্ণনা ছাড়াও অভিনেতাকে চরিত্রের উপযুক্ত যথোচিত সাজে সজ্জিত করারও প্রয়োজন আছে। ধরা যাক রাবণের কথা। রাবণের যে দশ মুণ্ড কুড়ি হাত ছিল একথা সকলেই জানেন। এ হেন রাবণের চরিত্র অভিনয়কালে, অভিনেতাদের স্বভাবতই অসুবিধায় পড়বার কথা; কেননা সর্বমানুষের ক্ষেত্রে প্রায় সমদর্শিতার পরিচয় দিলেও, রাবণের বেলা যেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, অন্ততঃ মুণ্ড ও হস্তের ব্যবহারে,একটু বেশী আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন। প্রজাপতি ব্রহ্মার এ হেন মতিচ্ছন্নতার কারণ কি তা আমাদের দুর্জ্ঞেয়, অবশ্য রাবণকে নিয়ে যে আমাদের এমন একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, পিতামহ তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। তিনি একটি মাত্র রাবণই সৃষ্টি করেছিলেন, আবার মনুষ্যকুলে এই মুণ্ড-হস্তাদির বাহুল্যযুক্ত রাবণ যে নিতান্তই বেমানান, তা বুঝে আবার রামচন্দ্রকে পাঠিয়ে তাকে পাপমুক্ত করেই

ক্ষান্ত হয়েছেন। মানুষ যে আবার সেই রাবণের অনুকরণ করবে, দেশে দেশে রাবণ সেজে তার কলঙ্কের কথা ঘোষণা করবে, তা কে জানত? সর্বজ্ঞ হলেও মানুষের এই দুরভিসন্ধির কথা পিতামহ সত্যিই ভাবতে পারেন নি।

কিন্তু পিতামহের ভাবনা চিন্তার বাইরে হলেও মানুষ ছাড়বে কেন। রাবণ তাকে সাজতেই হবে, আর এক মুণ্ড দুই হাত নিয়ে তা সাজা সম্ভব নয়, কেননা তাতে করে দার্শনিকরা খুশী হলেও সাধারণ মানুষের অসন্তোষ কমবে না। তারা দুই হাতওয়ালা অভিনেতাকে রাবণ বলে কল্পনা করতে কখনই রাজী নয়, তাই নাট্যাচার্যদের বাধ্য হয়ে নতুন কথা ভাবতে হয়েছে। খোদার ওপর খোদকারী করার দুর্বুদ্ধি মানুষের চিরদিনের। তাঁর ওপর টেক্কা মেরে সে নকল হাত-পা-মুখ তৈরী করেছে, আর সেই নকল মুখ আর হাত অভিনেতার কাঁধে জুড়ে দিয়ে তাকে রাবণানুগ করে সাজিয়ে গুছিয়ে সামাজিকের সামনে উপস্থিত করেছে। এই যে নকল উপকরণ, নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে এগুলি হলো নেপথ্যের বিষয়। নাট্যশাস্ত্রকার এই নকল উপকরণকে "পুস্ত" বলে উল্লেখ করেছেন।

এরপর হলো অলঙ্কার। শুধু মুখোশ ইত্যাদির ব্যবহারই নয়, চরিত্রকে প্রামাণ্য করে তুলতে অলঙ্করণেরও প্রয়োজন। রাজা সাজতে গেলে তাঁর কুণ্ডল-কিরীট চাই, মুনি সাজতে গেলে জটাজুট শ্মশ্রু চাই, সৈন্য সাজতে গেলে বর্ম চাই, এসবই হলো অলঙ্কার। এই সব অলঙ্কার দেখেই সামাজিক বুঝতে পারতেন অভিনেতারা কোন চরিত্রের রূপদান করছেন। সুতরাং চরিত্রকে প্রামাণ্য করে তুলতে অলঙ্করণেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

তৃতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় হলো অঙ্গ রচনা। আধুনিক পরিভাষায় যাকে আমরা রূপসজ্জা (Make-up) বলি, এ হলো তাই। যে চরিত্রে রূপদান করছেন অভিনেতা, সেই চরিত্র অনুযায়ী সাজা বা Make-up গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য। আধুনিক কালের মতই, সে যুগেও এই রূপসজ্জার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 'অঙ্গ রচনা'র বর্ণনায় নাট্যশাস্ত্রকার এই Make-up সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই পুস্ত, অলঙ্করণ এবং অঙ্গ রচনা হলো নাট্যাভিনীত চরিত্রকে প্রামাণিক করে

তোলার অন্যতম সহায়। এইগুলি সবই ছিল অভিনয়ের নেপথ্যকার্য, কেননা নেপথ্য থেকেই এই ভাবে সাজসজ্জা গ্রহণ করে, অভিনেতা দর্শক সম্মুখে উপস্থিত হতেন। নাট্যাভিনয়ের এই নেপথ্য উপকরণগুলিকেই নাট্যশাস্ত্রকার "আহার্য অভিনয়" বলে উল্লেখ করেছেন।

খ ॥ বাচিক অভিনয়

এর পর হলো বাচিক অভিনয়ের কথা। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, নাটক শুধু দৃশ্য কাব্য নয়, শ্রব্য কাব্যও বটে। নাটকের কাহিনী বিন্যাসে সর্বপ্রধান স্থান হলো সংলাপের। অভিনেতাদের মুখে এই সংলাপের বিশিষ্ট উচ্চারণেই নাট্যকাহিনীর রসটি সহৃদয় সামাজিকের মানসপটে প্রমূর্ত হয়ে ওঠে। সাজসজ্জা বা দৃশ্য রচনা সেই রসম্বোধনের সাহায্য করে মাত্র। এমন কি যদি দৃশ্যসজ্জা না থাকে তাহলেও নাট্যকাহিনী বুঝতে দর্শকের কোন অসুবিধা হয় না, যদি অভিনেতারা সুষ্ঠুরূপে সংলাপ আবৃত্তিতে পারঙ্গম হন। উদাহরণ স্বরূপ 'যাত্রা'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যাত্রা'র নাটকে দৃশ্যপট ব্যবহারের অবকাশ নেই। সামিয়ানা খাটান চত্বরের চতুর্দিকে দর্শকরা বসে থাকেন, আর মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা অংশে অভিনেতারা নির্দিষ্ট পালা সুরু করেন। এই সব পালায় বর্ণিত দৃশ্যাবলী স্বাভাবিক ভাবেই সুপরিকল্পিত দৃশ্যপটের সাহায্যে রচনা করা সম্ভব হয় না, কিন্তু তাই বলে তাদের অনুপস্থিতিও পীড়াদায়ক হয় না দর্শকের কাছে। সামিয়ানা খাটান ফাঁকা চত্বরটিকেই সামাজিক কখন কংস-কারাগার, কখন বৃন্দাবনের অরণ্য, কখনও বা যমুনার কলোচ্ছ্বাস বলে স্বচ্ছন্দেই কল্পনা করে নেন। মানস-স্মৃতি চারণের কোন ব্যাঘাতই সেখানে ঘটে না।

কিন্তু যদি নাট্যকাহিনীর সংলাপ অংশ দুর্বল হয়, অথবা যথাযথ ভাবে অভিনেতারা তা আবৃত্তি করতে না পারেন, তাহলে হাজার কল্পনাপ্রবণ দর্শক হলেও, নাট্যকাহিনী তাঁর মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করতে পারে না। দর্শকবৃন্দ ক্ষুণ্ণ হন, সমগ্র নাট্য-প্রযোজনা নির্মম ভাবে নিদারুণ ব্যর্থতায় হয় পর্যবসিত।

বাচনভঙ্গীর স্থান তাই নাটকের অভিনয়ে সবচেয়ে প্রধান। পৃথিবীর সব দেশের নাট্য-প্রযোজকরা, যুগে যুগে তাই এই বাচনভঙ্গীর ওপরেই জোর দিয়েছেন সবচেয়ে বেশী। আমাদের নাট্যশাস্ত্রকার বাচিক অভিনয় বলতে এই বাচনভঙ্গীর কথাই বুঝিয়েছেন এবং হাস্য, শৃঙ্গার, করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, শান্ত, ইত্যাদি বিভিন্ন রসের পরিস্ফুটনে স্বরগ্রামের সাহায্য কি ভাবে অভিনেতাদের গ্রহণ করতে হবে, তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রের এই অংশে ভরতমুনি যে কেবলমাত্র ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সপ্ত স্বরের বৈশিষ্ট্য নিয়েই আলোচনা করেছেন তা নয়, সুষ্ঠু উচ্চারণভঙ্গী আয়ত্ত করার পথ নির্দেশক হিসেবে সংস্কৃত ব্যাকরণের মূল সূত্র এবং বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়েও আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এ সম্পর্কে উচ্চারণ-বিধি পর্যায়ে বিশদ আলোচনা আমরা করবো।

গ ॥ আঙ্গিক অভিনয়

বাচিক অভিনয়ের পরেই আসে আঙ্গিক অভিনয়ের কথা। কেননা সুষ্ঠু বাচনভঙ্গীর দ্বারা নাটকের রসবস্তুর উন্মোচন সম্ভব হলেও অভিনেতার সর্বদেহের মাধ্যমে যতক্ষণ না সেই রসরূপ অভিব্যক্ত হয়, ততক্ষণ নাট্যরসের পরিপূর্ণ উদ্বোধন হয় না। সুতরাং বাচনভঙ্গী আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে অবিভ্যক্তির ব্যাপারটাও অভিনেতাকে আয়ত্ত করতে হয়।

নাট্যশাস্ত্রকার অভিনয়ের আলোচনায় "দেহাত্মক" শব্দটি ব্যবহার করেছেন দেখতে পাই। দেহই হল একজন অভিনেতার কার্যসিদ্ধির প্রধান অবলম্বন। "আঙ্গিক অভিনয়ের" আলোচনা নট-নটীর এই দেহসঞ্চালনজাত বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গীর স্বরূপ নির্দেশেই নিয়োজিত।

নাট্যশাস্ত্রকারের মতে আঙ্গিক অভিনয়ের ধারা মোটামুটি তিন ভাবে বিশ্লেষণ করা চলে।

ক। মুখজ

খ। চেষ্টাকৃত

গ। শারীর

(ক) 'মুখজ' অভিনয়ের মধ্যে মাথা, চোখ, মুখ, ইত্যাদিকে চরিত্রের রূপদান কালে একজন শিল্পী কেমন ভাবে কাজে লাগাবেন, তারই বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাই।

(খ) 'চেষ্টাকৃত' অভিনয়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে 'হাতের' কাজের নির্দেশ আছে। অভিনয় কালে হাত দুখানা নিয়ে অভিনেতাকে যে কী জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা অনেকেই জানেন। অঙ্গহানি হাসিমুখে বরদাস্ত করতে সকলেই নারাজ। কিন্তু একমাত্র অভিনেতাই বোধ করি এর মূর্তিমান ব্যতিক্রম। বিশেষ করে অভিনয় কালে অনেক স্বল্পশক্তিমান অভিনেতা হাত দুখানির বাহুল্য উপলব্ধি করে, মনে মনে অন্ততঃ দশবার যে সেগুলি অনাবশ্যক ভাবে আপন স্কন্ধের সঙ্গে সংযোজিত করার জন্য বিধাতাকে অভিসম্পাত দিয়েছেন একথা হলপ্ করে বলা যায়।

কিন্তু বিধাতার কল্যাণে আমরা যাকিছু পেয়েছি তার কোনটিই বাহুল্য নয়; প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বতন্ত্র ব্যবহার ও প্রয়োজন আছে। অভিনয়-কালে একজন অভিনয়-যশোলিপ্সু শিল্পীর সে কথা স্মরণ রাখা অবশ্য প্রয়োজন। নাট্যশাস্ত্রকার তাই 'চেষ্টাকৃত' অভিনয়-রীতির ব্যাখ্যায় এই হাতের ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করেছেন।

আর চোখ, মুখ, হাত ছাড়াও চরিত্রের অভিব্যক্তি ফোটানর জন্য বুক, পেট, কোমর, উরু, ইত্যাদি স্থানও অবহেলার যোগ্য নয়। চরিত্রের অভি-ব্যক্তি ফোটানর জন্য এগুলির সুষ্ঠু সঞ্চালন একান্ত আবশ্যিক। "শারীর অভিনয়ের" বৈশিষ্ট্য ও রীতি নিয়মের আলোচনায় দেহের এই বিভিন্ন অংশের সুঠাম প্রয়োগের কথাই বর্ণিত আছে। ইন্দ্রিয়ের এই ব্যবহার সম্পর্কে অভিনয়ের 'অভিব্যক্তি' প্রসঙ্গে আমরা তার আলোচনা যথাস্থানে করবো।

ঘ ॥ সাত্ত্বিক অভিনয়

সবশেষে হলো সাত্ত্বিক অভিনয়ের কথা। সাত্ত্বিক অভিনয় আঙ্গিক অভিনয়ের মত হলেও ঠিক আঙ্গিক অভিনয়ের পর্যায়ে একে ফেলা যায় না। অভিনয় হলো চরিত্রের সুষ্ঠু অভিব্যক্তির জন্য রীতিনীতিগত নিয়ম-কানুন,

আর সাত্ত্বিক অভিনয় হলো অনুকর্তার দেহের মাধ্যমে অনুকার্য চরিত্রের আন্তর সত্তার ভাবরূপটির সুসঙ্গত পরিস্ফুটন। এটা প্রধানত emotion বা আবেগের কাজ। নাট্যশাস্ত্রকার বলেছেন, স্তম্ভ, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, বিবর্ণতা, রোমাঞ্চ, স্বরসাদ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার সাত্ত্বিক ভাব যখন অনুকর্তা নট আপন দেহের মাধ্যমে সহৃদয় সামাজিকের সামনে প্রমূর্ত করে অভিনীত চরিত্রের যথার্থ স্বরূপটি অভিব্যক্ত করেন, তখন সেই অভিনয়-পদ্ধতিকে "সাত্ত্বিক অভিনয়" বলা চলে। নাট্যশাস্ত্রকার এই "সাত্ত্বিক অভিনয়ের" ওপর খুব বেশী জোর দিয়েছেন, কেননা এর মাধ্যমেই একজন রূপদক্ষ শিল্পীর চরিত্রের রূপদান ক্ষমতার সার্থক এবং পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

তিন

নাট্যশাস্ত্রকার অভিনয়-কলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অভিনয় রীতির যে বিভিন্ন ধারার উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে অনুকর্তা নটের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বাচিক, আঙ্গিক, এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের। আহার্য অভিনয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে নটের কোন সম্বন্ধ নেই। আবার বাচিক, আঙ্গিক এবং সাত্ত্বিক অভিনয়ের মধ্যে প্রথম তুটি, অভিনেতার সর্বপ্রথম আয়ত্ত করা প্রয়োজন। সুষ্ঠু বাচনভঙ্গী এবং তৎসহ সুসম আঙ্গিকের ব্যবহার একজন শিল্পীকে মোটামুটি ভাবে রূপদক্ষ করে তুলতে পারে। সাত্ত্বিক অভিনয় অন্তরের বস্তু। কোন রীতি-নিয়ম অনুশীলন করে এ শেখা যায় না। একজন শিল্পী সবকিছু শিক্ষার পরও যখন রসলোকের তুরীয় মার্গে আরোহণ করেন, কেবলমাত্র তখনই তাঁর দেহব্যঞ্জনায় সাত্ত্বিক ভাবের চরম প্রকাশ সম্ভব। কিন্তু বাচিক এবং আঙ্গিক অভিনয়-রীতি শিক্ষা করা যায়। তাই যুগে যুগে নাট্যাচার্যগণ অভিনয়যশোলিপ্সু নট-নটীদের বাচনভঙ্গী এবং আঙ্গিক প্রকরণের রীতি-নিয়মগুলি সুষ্ঠুরূপে পালন করবার উপদেশ দান করেছেন।

এই প্রসঙ্গে Shakespeare-এর Hamlet নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয়

দৃশ্যে নায়ক Hamlet-এর উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে। অভিনেতাদের উদ্দেশ্য করে উক্ত দৃশ্যে Hamlet বলছেন—

> "Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue : but if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the town-crier spoke my lines. Nor do not saw the air too much with your hand, thus, but use all gently: for in the very torrent, tempest, and, as I may say, the whirlwind of your passion, you must acquire and beget a temperance that may give it smoothness. O, it offends me to the soul to hear a robustious periwig-pated fellow tear a passion to tatters, to very rags, to split the ears of the groundlings, who, for the most part, are capable of nothing but inexplicable dumb-shows and noise : I would have such a fellow whipped for o'erdoing.........Pray you, avoid it,"

এই উক্তির মধ্যদিয়ে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের অভিনয়-রীতির একটি চিত্রই যে শুধু পাওয়া যায় তা নয়, এর মাধ্যমে একজন সার্থক নটের কর্তব্য সম্পর্কে নাট্যকারের উপদেশটিও বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। অভিনেতাদের নির্দেশ দানের সময় Hamlet বাচনভঙ্গী এবং আঙ্গিক প্রকরণের ওপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন দেখতে পাই। নাট্যবস্তুকে সহৃদয় সামাজিকের হৃদয় সংবেদ্য করে তুলতে সুষ্ঠু বাচনভঙ্গী এবং সুসম আঙ্গিকের ব্যবহার করা নিতান্ত প্রয়োজন, তা যেখানে ব্যাহত হয়, সেখানে অভিনয় অতি-অভিনয়ে পর্যবসিত হয়ে সমগ্র নাট্য-প্রযোজনাটিকে নিদারুণ ভাবে ব্যর্থতার সম্মুখীন করে। যাতে শিল্পীদের সাধনা, এবং প্রযোজকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়, তার জন্য Hamlet প্রথমেই বাচনভঙ্গীর কথা বলেছেন—Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you, অর্থাৎ যেমন ভাবে আমি

তোমাকে শিখিয়েছি ঠিক তেমন ভাবেই সংলাপগুলি উচ্চারণ করো। কেননা প্রথমত ঠিকমত উচ্চারণ না করলে নাটকের কাহিনী-বস্তু বোধগম্য হবে না, এবং দ্বিতীয়ত স্বল্প প্রতিভাবান নটের পক্ষে নাট্য বস্তু হৃদয়ঙ্গম করে, তার যথাযথ প্রকাশ ভঙ্গী সহজায়ত্ব নয়। তাই গুরুর নির্দেশ পালনই শিল্পীর প্রথম কর্ত্তব্য।

কিন্তু অভিনয় কলার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র অন্ধ অনুসরণে সম্ভব নয়। নটের হৃদয়ের আবেগ আকুতিকেও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না তা শিক্ষিচ্ছু ছাত্রের অন্তরের আবেগ ও প্রেরণার সঙ্গে জারিয়ে একটা নতুন রূপ লাভ করে। নাট্যাচার্য কেমন করে উচ্চারণ করতে হয়, কেমন করে হাত পা নাড়তে হয়, তার একটা নির্দ্দেশ দিতে পারেন কিন্তু কোন চরিত্রের রূপদানের প্রসঙ্গে, এক জন অভিনেতা নিজেকে কতখানি সংযত করবেন, বা করবেন না, তা তাঁর নিজের ওপরেই নির্ভর করে। গুরু পথ প্রদর্শক, কিন্তু ওই পর্যন্তই, তারপর নির্দ্দেশিত পথ চলার দায়িত্ব ছাত্রের। গুরু তাকে আজীবন হাত ধরে পথে পথে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না, একথা ঠিক।

তাই, অভিনেতাদের নির্দেশ প্রসঙ্গে Hamlet উপরি উল্লিখিত সুদীর্ঘ বক্তৃতার পরেও বলেছেন—

> "Be not too tame neither,but Iet your ownr discretion be your tutor, suit the action to the word, the word to the action ; with this special observance, that you o'erstep not the modesty of nature : for anything so overdone is from the purpose of playing, whose end, both at the first and now, was and is, to hold, as' twere, the mirror up to nature ; to show virtue her own feature, scorn her own image, and the very age and body of the time his form and pressure. Now this overdone, or come tardy off,

though it make the unskilful laugh, cannot but make the judicious grieve; the censure of the which one must in your allowance o'rweigh a whole theatre of others. O, there be players that I have seen play, and heard others praise, and that highly, not to speak it profanely, that, neither having the accent of Christians nor the gait of Christian, pagan, nor man, have so strutled and bellowed that I have thought some of nature's journeymen had made men, and not made them well, they imitated humanity so abominably."

সুষ্ঠু বাচন ও সুসম আঙ্গিকের সমন্বয় সাধন না হলে একটি অভিনয় কেমন করে অতি-অভিনয়ে পরিণত হয়ে রসবেত্তা সামাজিক তথা দর্শকের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে Hamlet-এর সুদীর্ঘ উক্তির মধ্য দিয়েই Shakespeare তা আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন। অভিনয়-যশোলিপ্সু একজন শিল্পীর কাছে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যসাধক Shakespeare-এর এই উপদেশ যে বিশেষ শ্রদ্ধা এবং সতর্কতার সঙ্গে পালনীয়, তা বোধকরি দ্বিতীয়বার উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

'অভিব্যক্তি'র প্রসঙ্গে আলোচনার সময় এই অভিনয় এবং অতি-অভিনয় প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা আমরা করার চেষ্টা করবো।

চার

অভিনয় ক্ষেত্রে এই বাচনভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা বর্তমান যুগেও সকলে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। নটগুরু গিরিশচন্দ্র, যাঁকে আধুনিক যুগের পেশাদার মঞ্চশিল্পের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়, তিনিও তাঁর ছাত্রদের অভিনয়-শিক্ষার প্রাথমিক সোপান হিসেবে সব প্রথম স্বরসাধনার ওপর

বিশেষ নজর দিতে উপদেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য একথাও তিনি বার বার বলেছেন যে, বাচনভঙ্গীই অভিনয়-শিল্পের প্রাণবস্তু নয়। যাঁর গলার আওয়াজ খুব ভালো, বা যিনি খুব সুন্দর ভাবে সংলাপ অথবা কবিতা আবৃত্তি করতে অভ্যস্থ, তিনি যে একজন সু-অভিনেতা তা কখনই নয়। তবে একথাও সত্য যে, কণ্ঠস্বর অভিনেতার একটি অন্যতম উপকরণ। নাটক দৃশ্য এবং শ্রব্যকাব্য। তার মূল উদ্দেশ্য, যখন দর্শকমণ্ডলীকে শোনান, তখন রঙ্গমঞ্চের একেবারে পিছনের সারির ব্যক্তিটিকেও অবহেলা করলে চলবে না। কেননা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে সবাই পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে নাট্যরস উপভোগ করতে আসেন; অবস্থার তারতম্য অনুসারে কেউ সামনে, কেউ পিছনের সারিতে আসন গ্রহণ করলেও, এখানে রাজা-মহারাজা, বিশিষ্ট অতিথি আর সাধারণ মানুষে কোন পার্থক্য নেই, সবাই সমান, সকলের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই নাট্য-প্রযোজকের সমান দৃষ্টির পরিচয় দেওয়া চাই। অভিনেতারও এবিষয়ে সদাসর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। বলা বাহুল্য, সকল সারির দর্শককে সমান ভাবে নাট্যসংলাপ শোনাবার জন্য চাই সতেজ কণ্ঠস্বর। নটগুরু গিরিশচন্দ্র তাই অভিনয় শিক্ষিচ্ছু ছাত্রদের নবরসের অভিব্যক্তি আয়ত্ত করানর আগে কণ্ঠস্বর উন্নত করার দিকে বেশী জোর দিতেন। গলার যার জোর নেই, চীৎকার করে যে কথা বলতে পারে না, তার পক্ষে অভিনয় করতে আসা বাতুলতা মাত্র। অবশ্য আধুনিক কালে মাইক্রোফোন নামে এক অদ্ভুত যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, যার সাহায্যে মৃদু কণ্ঠস্বরও উচ্চগ্রামে চড়িয়ে সর্বজনের শ্রোতব্য করে তোলা সম্ভব। কিন্তু যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বরগ্রামকে বহুগুণ বর্ধিত করা গেলেও তার স্বাভাবিক মাধুর্য ও কোমলতা সেখানে বজায় থাকে না। দায়ে পড়ে মাইক্রোফোনের ব্যবহার করলেও বিশিষ্ট নাট্যাচার্যরা কোন দিনই এই বিশেষ যন্ত্রটির পক্ষপাতী নন।

বাচনভঙ্গীর প্রসঙ্গে নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি কথা মনে পড়ে গেল। তিনি দলবল নিয়ে একদা যৌবনে কেমন ভাবে স্বর সাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, তার এক কৌতুককর বর্ণনা তাঁর "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর" গ্রন্থে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁদের যুগে চীৎকার করে গলা

সাধার রেওয়াজ বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। আর তাই করতে গিয়ে অনেকে যে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব করতেন তা বলাই বাহুল্য। উদাহরণ স্বরূপ অপরেশচন্দ্র নিজের স্বরসাধনার কথা এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। চীৎকার করে গলা না সাধলে অভিনয় করা যাবে না, সুতরাং চীৎকার করা চাই। কিন্তু চীৎকার তিনি কোরবেন কোথায়। লোকালয়ের মধ্যে অকস্মাৎ ডাক ছেড়ে চীৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা তাঁকে অভিনেতা বলে স্বীকার করুন আর না করুন অন্তত উন্মাদ বলে নিঃসংশয় হয়ে যে নিখরচায় তাঁর রাঁচীবাসের উদ্যোগ-আয়োজন করবেন এ বিষয়ে হলপ্ করে বলা যায়। কিন্তু রাঁচীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জলবায়ু যতই মনোমুগ্ধকর এবং স্বাস্থ্যকর হোক, একজন ভবিষ্যৎ অভিনেতার পক্ষে তা নিশ্চয় বাঞ্ছনীয় নয়। তাই অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা দলবল নিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড দুপুরে উল্টোডিঙির খালপাড়ে গিয়ে তারস্বরে চীৎকার শুরু করতেন; তৃষ্ণায় বুকের ছাতি শুকিয়ে যেত, ঘামে নিষিক্ত হতো সর্বশরীর, এবং ক্রমশই নিমীলিত চক্ষে স্বর্গীয় পারিজাত পুষ্পের সগোত্র হলুদাভ সর্ষপ পুষ্পের বর্ণসমারোহ দেখতেন মস্তকের বিঘূর্ণিত অবস্থায়, তবু চীৎকার থামাতেন না। অপরেশচন্দ্রের এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত কি না সে বিচারে আমাদের দরকার নেই। তবে ঐ-ভাবে কণ্ঠস্বরসাধনায় যদি কেউ অকস্মাৎ উৎসাহী হয়ে ওঠেন তাহলে তাঁর ভবিষ্যৎ স্বয়ং বিধাতাও যে আলোকোজ্জ্বল করতে পারবেন না, সেকথা অবধারিত। তবে অপরেশচন্দ্রের ঐ রসাল বর্ণনা থেকে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি, তাহলো এই যে, স্বরসাধনার ওপর তাঁরা সকলেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন।

আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভা নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীও অভিনেতাদের স্বরসাধনার ওপর বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতেন, এবং স্বয়ং নাট্যাচার্যের কণ্ঠে সুর-সরস্বতী যে কেমন ভাবে স্বীয় আসনে অচলা ছিলেন তা তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

অতি-আধুনিক কালে অভিনয় সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী আরো বদলে গেছে। একক অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শনের যুগ থেকে আমরা যৌথ অভিনয়ের (Group acting) ধারাতেই আজ বিশ্বাসী। কিন্তু তা হলেও বাচনভঙ্গী-সম্পর্কিত

মতবাদের কোন পার্থক্য আজও হয়নি। অতি আধুনিক কালে যে নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে, তার অন্যতম পুরোধা নট ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তাঁর ছাত্রদের অভিনয় শিক্ষাদান কালে সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গী আয়ত্ত করার ওপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন শব্দ হলো ব্রহ্ম। তার প্রতিটি উচ্চারণ অনর্থক নয়। অস্পষ্ট বা অর্থহীন ভাবে শব্দ উচ্চারণ করলে ব্রহ্মকেই অপমান করা হয়। সুতরাং অভিনয় শিক্ষা করবার প্রাক্কালে ছাত্রদের সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গী আয়ত্তীকরণের সাধনা করতে হবে। আগে কথা বলতে শেখা, তার পর তার ওপর অভিব্যক্তির রঙ্ চড়িয়ে তাকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলা —এই হলো বিজনবাবুর সব প্রথম বক্তব্য।

নট-প্রযোজক শম্ভু মিত্রও কণ্ঠসাধনার ওপর খুব বেশী করে জোর দিয়ে থাকেন। তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই জানেন যে, সুষ্ঠু বাচনভঙ্গীর ওপর তিনি কতখানি বিশ্বাসী। প্রসঙ্গত শ্রীমিত্রের আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রযোজনা 'রক্তকরবীর' কথা উল্লেখ করা যায়। উক্ত নাটকে শম্ভুবাবু নেপথ্যবাসী রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেন। শ্রীমিত্র অভিনীত ঐ চরিত্রটি বাচিক অভিনয়ের একটি চমৎকার উদাহরণ। তাঁর কণ্ঠস্বর ও তার বিন্যাসভঙ্গী ঐ চরিত্রটির মাধ্যমে যে অপূর্ব ভাবে বিকশিত হয়েছে, তার তুলনা নেই।

ফল কথা সর্বযুগে, সর্বকালের নাট্যাচার্যগণ অভিনয়-যশোলিপ্সু শিল্পীদের— সর্বপ্রথম সুষ্ঠু বাচনভঙ্গী আয়ত্ত করার উপদেশই দান করেছেন। কেননা, আমরা আগেই বলেছি যে, কণ্ঠস্বরই হলো অভিনেতার প্রথম এবং প্রধান সম্পদ। এই কণ্ঠস্বরের বিন্যাসভঙ্গী কেমন করে আয়ত্ত করা যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

বাচিক অভিনয় সম্পর্কে আমরা এত কথার অবতারণা যদিও করলাম তথাপি একথা কেউ যেন মনে না করেন যে বাচিক অভিনয়ই হলো অভিনয়-কলার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। আসলে তা নয়। আর আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, শাস্ত্রকার বাচিক অভিনয়ের পরেও সাত্ত্বিক অভিনয়ের উল্লেখ করেছেন। সাত্ত্বিক অভিনয় ব্যাপারটা অভিব্যক্তির ব্যাপারের সঙ্গে ওতপ্রোত

বিজড়িত। ভরতমুনি বলেছেন—"দেহাত্মকং ভাব সত্বং" অর্থাৎ সাত্বিক অভিনয় দেহাত্মক ভাবের ওপরেই নির্ভরশীল। সংলাপের মধ্যে দুটো অংশ আছে, অর্থ এবং ব্যঞ্জনা। সুষ্ঠু বাচনভঙ্গীর আয়ত্তীকরণের মধ্য দিয়ে সংলাপের এই বাচ্য অর্থ অথবা অভিধাকেই পূর্বাহ্ণে অধিগত করতে হয়, তার পর আসে তার ব্যঞ্জনার প্রকাশ। কবি অলঙ্করণের সাহায্যে ভাষার বাচ্য অর্থের ওপর ব্যঞ্জনার প্রকাশ করেন। অভিনেতার কাছে ইন্দ্রিয়ের অভি-ব্যক্তিই হলো সেই অলঙ্কার। তাই বিভিন্ন যুগের নাট্যাচার্যগণ অভিনেতাকে এই অভিব্যক্তি আয়ত্ত করার জন্য বিভিন্ন পন্থার অনুশীলনের নির্দেশ দান করেছেন। অভিব্যক্তির আয়ত্তীকরণ প্রসঙ্গে আমরা যথা সময়ে সেই সব পন্থার পরিচয় প্রদানে সচেষ্ট হবো। বর্তমানে বাচনভঙ্গীর সৌষম্য আনার জন্য যে সব পন্থার অনুশীলন অভিনেতাদের প্রাথমিক কর্তব্য, সেই বিষয়ের আলোচনাই প্রয়োজন। তাই অভিব্যক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণের পূর্বে, আমরা সংলাপ, উচ্চারণ এবং স্বরবিন্যাস সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনার অবতারণার পক্ষপাতী।

তৃতীয় অধ্যায়

এক

উচ্চারণ-প্রসঙ্গ

অভিনয় করতে গেলে একজন অভিনেতাকে সবচেয়ে বেশী যার ওপর নির্ভর করতে হয়, তা হলো কণ্ঠ। অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই কণ্ঠস্বরের কাজ নানাবিধ। নাটকীয় সংলাপের কেবলমাত্র সুষ্ঠু আবৃত্তিই নয়, সেই সংলাপের মধ্যে যে আবেগ (emotion) প্রচ্ছন্ন আছে, কণ্ঠস্বরের মাধ্যমেই তাকে সর্বজন বোধ্য করে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাই সুস্পষ্ট উচ্চারণের সাধনাই নয় কেবল, কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে মানব-মনের অন্তর্নিহিত স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য, ক্রোধ, ক্ষোভ, দুঃখ, ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবরূপটিকেও ফুটিয়ে তোলার সাধনাও হলো অভিনেতার কাজ।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, উপরিউক্ত স্নেহ, প্রেম ইত্যাদি ভাবগুলো যখন সব মানুষের মনেই প্রসুপ্ত আছে, তখন পর্যায়ক্রমে সেগুলির প্রকাশ স্বাভাবিক ভাবেই তো ঘটতে পারে? তার জন্যে আবার বিশেষ সাধনার প্রয়োজন কি? আর এই প্রকাশ যে কণ্ঠস্বরের মধ্যদিয়েই ঘটে একথাও তো সত্য? ব্যক্তিগত ভাবে আমার যখন দুঃখ হয়, কি রামবাবুর আনন্দ হয়, তখন আমি বা রামবাবু যে ভাবে কথা বলি, সেই কথা বলার ভঙ্গীতেই তো আমাদের অন্তর্নিহিত সেই ভাবের প্রকাশ থাকে। কথাটা ঠিক। ভাব মানুষের আন্তরিক, এবং চলমান জীবন-ছন্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরঙ্গ-বিক্ষেপে সেই সুস্থির ভাবসমুদ্রে যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ দেখা যায়,আমাদের কণ্ঠস্বরের তটভূমিতে তাই আছড়ে পড়ে স্বরবিন্যাসে বৈচিত্র্য ঘটায়। অভিনেতাও আমাদেরই মত মানুষ, সুতরাং তাঁর ক্ষেত্রেও এই স্বাভাবিকতার কোন ব্যতিক্রম নেই।

তবু একটা কথা এখানে লক্ষ্যণীয়। সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যখন রাগ, দ্বেষ, ভালবাসা ইত্যাদির কারণ ঘটে তখনই তার প্রতিক্রিয়া

তাদের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়, কিন্তু একজন অভিনেতার ব্যক্তিগত জীবনে রাগ, দ্বেষ, ভালবাসার কারণ না ঘটলেও তাঁকে তা প্রকাশ করতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনের রামবাবুর একটি মাত্র সন্তানের মৃত্যুসংবাদ যখন আসে তখনই তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন, কিন্তু রামবাবুর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছেন, তাঁর জীবনে সেদিন হয়ত সবচেয়ে সুখের বা আনন্দের কারণ কিছু ঘটে থাকতে পারে। অথচ সেই আনন্দটাকে সযত্নে লুকিয়ে রেখে তাঁকে দর্শকের সামনে আঁকতে হবে পুত্রশোকাতুর একটি পিতার ছবি। আবার উল্টোটাও হতে পারে। দম্পতীর কাছে প্রথম নবাগত শিশুর পদধ্বনি সবচেয়ে বেশী আনন্দের বিষয়। সেই :নবাগতর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী আনমনে না না সংকল্প স্থির করে ; তার কথা ভেবে সরমে-শঙ্কায়, দ্বিধায়-আনন্দে তারা উচ্ছল হয়ে ওঠে। ধরা যাক এইরকম এক সন্তানপ্রত্যাশী পিতার ভূমিকায় একজন অভিনেতা রূপদান করছেন। এমন সময় সংবাদ এলো তাঁর একটি মাত্র পুত্র অকস্মাৎ মারা গেছে। যদি এমনটি হয়, তখন সেই অভিনেতা কি করবেন ? প্রেক্ষাগৃহ-ভর্তি দর্শককে বিমুখ করে অভিনয় বন্ধ করে দিয়ে বাড়ী চলে যাবেন,না জোর করে অভিনয় চালাতে গিয়ে শোকে মুহ্যমান হয়ে সমস্ত অভিনয়টাকেই সেদিনের মত পণ্ড করবেন ? এ প্রশ্ন অবান্তর ; কেননা অভিনেতা এই দুইয়ের কোনটাই করবেন না। তিনি অভিনয় করবেন ! তাঁর শোক সন্তপ্ত হৃদয়াবেগকে সযত্নে গোপন করে, একটি সন্তানপ্রত্যাশী পিতার আনন্দ-আবেগ তিনি ফুটিয়ে তুলবেন ; আর বলা যায় না, অন্যদিনের অভিনয় অপেক্ষা তাঁর সেই দিনের অভিনয় দেখেই হয়ত বা দর্শকসাধারণ পরিতৃপ্ত হবেন সবচেয়ে বেশী।

বলা বাহুল্য এই কাজ অত্যন্ত দুরূহ। এই সুকঠিন কর্তব্যসাধন করতে গেলে একজন অভিনেতাক মানব-মনের বিভিন্ন ভাবগুলির দ্বারা পরিচালিত হলে চলবে না, সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে অধিগত করে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনতে হবে। সাধারণ মানুষের এই সব ভাবব্যঞ্জনা আয়ত্তাধীন নয়। আমরা যখন দুঃখ পাই. কি আনন্দ লাভ করি, তখন আমাদের কণ্ঠস্বরে যে ভাবপ্রকাশ ঘটে, তা আমাদের অজ্ঞাতসারেই ঘটে থাকে। কিন্তু একজন

অভিনেতাকে সচেতন ভাবে এই পরিবর্তন আনতে হয়। তাই তাঁর সাধনার প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, অভিনেতার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, এই সব শোক আনন্দ, দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া, এককথায় সর্বজনীন করে তোলা। ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ পেলে আমরা আস্তে কথা বলি, আনন্দ পেলে জোরে কথা বলি, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একজন অভিনেতার সামনে থাকেন অগণিত দর্শক। সুতরাং কি শোকের, কি আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশে তাঁকে স্বরবিন্যাসের এমন একটি পর্দার সাহায্য নিতে হবে, যাতে করে সেই ভাবব্যঞ্জনা একেবারে পেছনের সারির দর্শকেরও শ্রুতিগোচর হয়, অথচ শোক ও আনন্দের প্রকাশের সূক্ষ্ম পার্থক্যটাও বজায় থাকে। ফিস্ ফিস্ করে কথা বলা সর্বজনবোধ্য করে তোলার জন্য নয়; অন্তত বাস্তব জীবনে আমরা ফিস্ ফিস্ করে কোন কথা সকলকে শোনানর জন্য বলি না। রঙ্গমঞ্চে যখন অভিনেতা ফিস্ ফিস্ করে কথা বলেন, তখন কিন্তু সেটা পেছনের সারির দর্শকদের শ্রুতিগোচর হয়, আর মজা এই যে, কি সামনে কি পেছনের সারির, সব দর্শকেরই বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না যে, অভিনেতা ফিস্ ফিস্ করেই কথা বলছেন। আসলে যে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার ভঙ্গীর মাধ্যমে তিনি উচ্চ গ্রামেই কথা বলছেন একথা কোন মতেই দর্শক বুঝতে পারেন না। কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে এই বিভ্রম বা illusion সৃষ্টি, স্বরবিন্যাসের সুকঠোর সাধনা ছাড়া অসম্ভব।

স্বরবিন্যাস দ্বারা এই বিভ্রম বা illusion সৃষ্টি করা সহজ সাধ্যনয়। এর জন্য স্বরসাধনার প্রয়োজন রীতিমত। আর একথা সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, 'স্বরসাধনা' মানে করে চীৎকার করে কথা বলা নয় শুধু। কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাব অর্থাৎ moodএর অভিব্যক্তির প্রকাশের জন্য স্বরগ্রামের যে বিচিত্র উত্থান-পতন, অর্থাৎ কিনা modulationএর প্রক্রিয়া, তা আয়ত্ত করার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা নানা পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন। এই পন্থাগুলি যে, কেবলমাত্র তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য তাই নয়, এর মূলে নিহিত আছে সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী। যথাসময়ে আমরা সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলির বিশদ ভাবে আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে আর একটি বিষয়ের আলোচনা

করে নেওয়া দরকার। তাহল উচ্চারণ-বিধি। শব্দকে অর্থসমন্বিত করে সঠিক উচ্চারণ করা হলো অভিনেতার সর্বপ্রথম কর্তব্য। একজন অভিনেতা ব্যঞ্জনাময় ভাবের প্রকাশে যতই দক্ষতা অর্জন করুন না কেন, যদি শব্দের উচ্চারণে তাঁর কোন জড়তা থাকে, তাহলে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। শব্দ হল ব্রহ্ম। সুতরাং সেই শব্দকে অহেতুক অথবা অশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করাট্য যে কেবল মাত্র অন্যায় তাই নয়, অপরাধও বটে। অবশ্য দৈহিক গঠনের তারতম্যের জন্য যদি কারুর পক্ষে সঠিক ভাবে শব্দের উচ্চারণ সম্ভব না হয়, সে কথা স্বতন্ত্র। অনেকের জন্মাবধি জিভের জড়তা থাকে, আর তার ফলে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে আমাদের বলবার কিছু নেই ; কেননা স্বয়ং বিধাতা যার প্রতি বিমুখ সে আর কি করতে পারে। তবে অসাবধানতা এবং অবহেলার জন্য যখন শব্দের ভুল উচ্চারণ করা হয়, তখন তা কোন মতেই ক্ষমা করা যায় না। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি একটু চেষ্টা করলেই শুধরে নেওয়া সম্ভব, তা যিনি বা যাঁরা না করেন, তাঁরা মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন নন বলেই ধরে নিতে হবে। অসাবধানতা অথবা অবহেলা বশতঃ ব্যক্তিগত জীবনে আমরা অনেকেই কি ভাবে অশুদ্ধ শব্দের উচ্চারণ করি দু'একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ধরা যাক 'সম্মান' শব্দটা। একটু সচেতন ভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, অনেকে উক্ত শব্দটির উচ্চারণ করে থাকেন "সন্মান" বলে। আর এই ভুল শিক্ষিত-অশিক্ষিত তাবৎ মানুষের মধ্যেই প্রায়শঃ দেখা যায়। এছাড়াও বর্ণমালার এমন অনেক বর্ণই আছে, যেগুলি আমরা শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করতে পারি না। যেমন রেফ্, র-ফলা, 'ক্ষ', 'র', 'ড়', 'ঁ', ইত্যাদি বর্ণগুলির সঠিক উচ্চারণ প্রায় ক্ষেত্রেই হয় না। সচেতন ভাবে একটু লক্ষ্য করলেই শুনতে পাওয়া যাবে যে, আমরা কেমন অবলীলা ক্রমে "প্রেম-কে 'পেম', "আবৃত্তি" কে 'আবিত্তি,' "ঘর"কে 'ঘড়,' "বাঁশ"কে বাশ, উচ্চারণ করে থাকি। 'ব্যাঙ্ক'কে 'বেঙ্ক, 'অতি'কে 'ওতি' 'দেশ'কে "দেS" এগুলো তো অধিকন্তু আছেই। সাধারণ জীবনে শব্দের এই বিচিত্র উচ্চারণ (কেউ কেউ আবার 'উশ্চারণ' ও বলে থাকেন) অবশ্য ভাবপ্রকাশে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু একজন

অভিনেতার পক্ষে এই ত্রুটি, যেগুলো নাকি একটু সচেতনার সঙ্গে অনুশীলন করলেই কাটিয়ে ওঠা যায়, অত্যন্ত মারাত্মক ; এবং নিঃসন্দেহে অবাঞ্ছনীয়। মনে করুন একজন অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে উঠে খুব কায়দা করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনার সাহায্যে আবৃত্তি শুরু করলেন—

"দেচ্, দেচ্, মোড় ঘড় আছে
আমি সেই ঘড় লব খুজিয়া"

তাহলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে একেবারে গড় গড় করে স্বর্গ থেকে এই ধরাধামে পুনরায় অবতীর্ণ হতে পারেন, সে বিষয়ে কি সন্দেহের অবকাশ আছে ? এই ভাবে হাস্যকর উচ্চারণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যটিকে কি নির্মম ভাবে হত্যা করা হবে না ? যিনি আবৃত্তি করছেন তাঁর কি এ-বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত নয় ?

ফলকথা যে কোন বিষয়েই অবহেলা অথবা অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করা একজন অভিনেতার পক্ষে মারাত্মক। সুতরাং অভিনয়-যশোলিপ্সু ব্যক্তির অর্থাৎ কিনা যিনি অভিনয় কলা আয়ত্ত করে নিজেকে সুদক্ষ অভিনেতা রূপে প্রকাশ করতে বাসনা রাখেন, তাঁর পক্ষে শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে সতর্ক হওয়াটাই হলো সর্বপ্রথম কর্তব্য। 'মৃণালিনী'কে "মিনানিনী" উচ্চারণ করলে ফলটা হাস্যকরই দাঁড়াবে, তা সে যতই কায়দা করে উদাত্ত, অনুদাত্ত অথবা স্বরিত-এ বলা যাক না কেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে স্বরবিন্যাসের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার আলোচনার পূর্বাহ্নে শব্দের উচ্চারণ-বিধি এবং তাকে সুষ্ঠুরূপে আয়ত্ত করার পন্থা, আমরা সর্বপ্রথম বিশদভাবে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। এই পর্যায়টি বিশেষভাবে ব্যাকরণ কেন্দ্রিক, সুতরাং সহৃদয় পাঠকের কাছে, তা নিরস বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সাধনার পথ তো কুসুমাস্তীর্ণ নয় ; ছোটবড় নানা বাধাবিঘ্নের উপলখণ্ড সেইপথকে সর্বদাই বন্ধুর করে রেখেছে। আর এই বন্ধুরতা যিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন, তিনিই তো সন্ধান পান প্রকৃত রসলোকের। সত্যকারের সাধক তো আমরা তাঁকেই বলি, যিনি কঠোর অধ্যবসায় ও তিতিক্ষার সঙ্গে সাধনার দুর্গম পথটি পার হয়ে সিদ্ধিলাভে সমর্থ।

দুই

উচ্চারণ বিধি

যে কোন বাঙ্‌লা ব্যাকরণের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে যে, আমাদের বর্ণমালায় মোট সাতচল্লিশটি বর্ণ আছে। তার মধ্যে বারটি হলো স্বরবর্ণ, আর বাকী পঁয়ত্রিশটি হলো ব্যঞ্জনবর্ণ। এই বারটি স্বরবর্ণের মধ্যে আবার ৯-কার এবং ঋ-কারের উচ্চারণ আমরা করি না। সাধারণ ভাবে ঋ-কার এর জায়গায় করি র-এর ব্যবহার ; যেমন হৃদয়>রিদয়, ঋষি> রিষি, ইত্যাদি আর ৯-কার তো আমাদের ভাষাতে সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত। তাহলে বারটি স্বরবর্ণের মধ্যে বাদসাদ দিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়াল দশটি।

হারাধনের এই দশটি সন্তানকে আবার উচ্চারণের পার্থক্য অনুযায়ী 'হ্রস্ব' এবং 'দীর্ঘ' এই দুইভাগে বিভক্ত করেছেন বৈয়াকরণেরা। 'অ' 'ই' 'উ' 'ঋ' বা ব্যঞ্জনের (র) এই চারটি হলো হ্রস্বস্বর, আর 'আ' 'ঈ' 'ঊ' 'এ' 'ঐ' 'ও' 'ঔ' এই সাতটি হলো দীর্ঘস্বর। শব্দের উচ্চারণের সময় বর্ণের এই হ্রস্বত্ব এবং দীর্ঘত্ব সম্বন্ধে অভিনেতার সচেতন থাকা উচিত। "কি বলছ?" আর "কী বলছ?" এই দুয়ের তফাৎ যদি উচ্চারণে ধরা না দেয়, তাহলে এদের সম্পূর্ণ মানেটাই বদলে যাবে। বলা বাহুল্য নাটকের সংলাপ রচনায়, শব্দের বানানে, উচ্চারণের এই বিশদ বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দেওয়া যদি নাও যায়, তাহলে অভিনেতাকে চরিত্রের ভাব বিশ্লেষণ করে শব্দ উচ্চারণের এই ঝোঁকটি আবিষ্কার করে তবে উচ্চারণ করতে হবে।

ধরা যাক, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হঠাৎ খুব মনকষাকষি হয়েছে। তার ফলে স্ত্রী ভীষণভাবে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন স্বামীর প্রতি। তাই স্বামী যখন তাঁকে ডাকলেন, তখন সেই উদ্গত অভিমানকে মনে চেপে রেখে খুব শান্ত এবং নিরুত্তাপ স্বরে স্ত্রী বললেন—"কি বলছ!" আবার কোন কারণে হয়ত স্বামী ভীষণভাবে বিরক্ত হয়েছেন স্ত্রীর প্রতি। স্ত্রীর আহ্বানে স্বামীর অন্তরের সেই বিরক্তি সুতীব্র উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ফেটে পড়ল। তিনি স্ত্রীর ডাকে বিরক্তি সহকারে বললেন—"কী বলছ!" বলা

বাহুল্য এখানে "কি বলছ" শব্দটির উচ্চারণ দু'বার দু'রকম করে হবে। প্রথম 'কি' হ্রস্ব—দ্বিতীয়টি দীর্ঘ। কিন্তু সংলাপ রচয়িতা বানানে দু'ক্ষেত্রেই "কি বলছ" শব্দটি হ্রস্বই দিয়ে লিখতে পারেন—দীর্ঘঈ হয়ত তিনি ব্যবহারই করলেন না। তখন চরিত্রের mood ধরে অভিনেতাকে কোন 'কি'-টি হ্রস্ব এবং কোনটি দীর্ঘ, তা বার করে নিতে হবে।

ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রেও বৈয়াকরণ পঁয়ত্রিশটি বর্ণের উল্লেখ করলেও শব্দ-রচনায় আমরা সবকটি বর্ণ কাজে লাগাই কিন্তু উচ্চারণ করিনা। আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণে তিনটি "স' (শ-ষ-স) এবং দুটি 'ব' আছে। উচ্চারণে কিন্তু আমরা সব সময়েই একটি 'স' এবং একটি 'ব' ব্যবহার করি। বাঙলায় সাধারণতঃ 'শ'-এর উচ্চারণ হয়। 'ষ' এবং 'স' এর উচ্চারণ করি না। দুটি 'ব'-এর একটিকে অর্থাৎ অন্তঃস্থ 'ব'-কে আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি; 'য'-এর কাজও 'জ' দিয়ে চালিয়ে নিই। অবশ্য এই উচ্চারণ-বিধি আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। বর্ণমালায় থাকলেও এগুলো উচ্চারণে নেই; উচ্চারণ করবারও দরকার নেই। সংস্কৃত বলার সময় অবশ্য স্বতন্ত্র কথা; তখন এই 'শ' 'ব' 'য' এদের যথাযথ উচ্চারণ করতেই হবে, নৈলে দেবভাষার দানব-ভাষাত্ব প্রাপ্ত হতে খুব বেশী সময় লাগবে না।

কিন্তু সে যাই হোক, এইসব ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণবিধির আলোচনায় বৈয়াকরণরা এদের বিভিন্ন উচ্চারণ-স্থান নির্দেশ করেছেন। যেমন—

ক খ গ ঘ ঙ এগুলির উচ্চারণ সাধারণতঃ আমরা কণ্ঠ দিয়েই করে থাকি, তাই এগুলিকে বলা হয় কণ্ঠ্য বর্ণ, তেমনি চ থেকে ঞ হলো তালব্য বর্ণ, কেননা এদের উচ্চারণ হলো তালু। ট থেকে ণ এর উচ্চারণ স্থান হলো মূর্ধা; তাই এরা হলো মূর্দ্ধণ্য বর্ণ, ত থেকে 'ন' হলো দন্ত্য বর্ণ, আর প থেকে ম হলো ওষ্ঠ বর্ণ, ইত্যাদি।

বর্ণের উচ্চারণে শুধু গলা নয়, নাকের ব্যবহারও থাকে। আমরা কতিপয় বর্ণের উচ্চারণ নাক দিয়েও করি। যেমন—'ঙ' 'ঞ' 'ণ' 'ন' এবং 'ম'। এগুলি তাই হলো নাসিক্য বর্ণ।

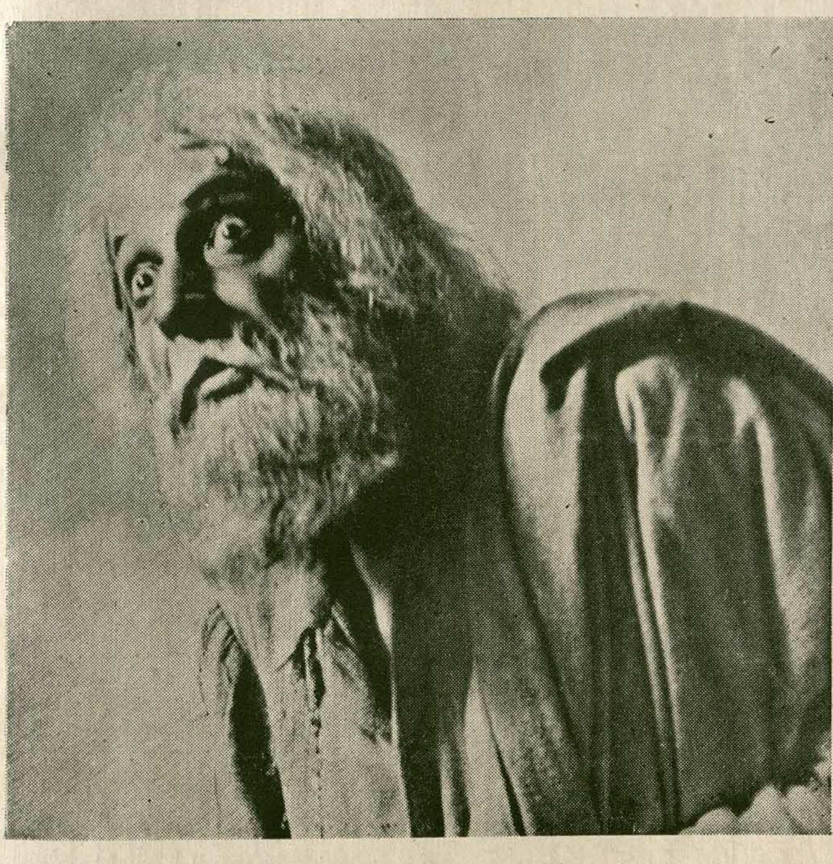
উচ্চারণ-ভেদে স্বরবর্ণের মত, ব্যঞ্জনবর্ণেরও লঘুত্ব-গুরুত্ব আছে তাই

ব্যঞ্জনবর্ণকেও মোটামুটিভাবে অল্প প্রাণ (unaspirated) এবং মহাপ্রাণ (aspirated) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ হলো অল্পপ্রাণ বা unaspirated, আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ হলো মহাপ্রাণ বা aspirated, শব্দের উচ্চারণে, বর্ণের এই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অভিনেতার সচেতন থাকা উচিত। বর্তমান প্রসঙ্গে এগুলির বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কৌতূহলী পাঠক যে কোন বাঙ্‌লা ব্যাকরণ খুললেই এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাবেন।

ব্যাকরণের কাজ শুদ্ধ উচ্চারণের বিধি নিয়ে। তাবৎ জনসমাজ এই সব শুদ্ধ উচ্চারণ বিধির ধার ধারে না। ব্যকরণের সূত্র তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারেনি। প্রাকৃতজনেরা যে উচ্চারণ করে থাকেন, একজন বৈয়াকরণ তা অশুদ্ধ বলে অবজ্ঞা করলেও, একজন অভিনেতার তা করবার উপায় নেই। কেননা, তাঁর কাজের পরিধি আরও ব্যাপক। সেখানে বৈয়াকরণ এবং প্রাকৃতজন একসঙ্গে সমষ্টিগত ভাবে উপস্থিত। তাই শুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অশুদ্ধ উচ্চারণ-রীতি গুলোও একজন অভিনেতাকে আয়ত্ত করতে হবে।

একজন অভিনেতা কোন এক বা একদল বিশেষ শ্রেণীর মানুষের চরিত্রে রূপ দেন না। সর্বশ্রেণীর, সর্বরুচির মানুষের চরিত্রই তিনি রূপায়ণ করেন বা তার রূপায়ণের জন্য তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হয়। সুশিক্ষিত অধ্যাপক থেকে সংস্কারাচ্ছন্ন কৃষক, আবার রুক্ষ শ্রমিক থেকে অভিজাত ধনী ব্যবসায়ী, কখন যে কী সাজতে হবে, তা কি বলা যায়? সমাজের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন রুচির ও প্রকৃতির মানুষের হাবভাব আচার আচরণের সঙ্গে তাদের মুখের ভাষা ও তার উচ্চারণ-বিধিকেও তাই সযত্নে আয়ত্ত করতে হয় একজন অভিনেতাকে।

ভাষার একটা পরিশুদ্ধ রূপ আছে, যা শিক্ষিত মানুষে যত্নসহকারে আয়ত্ত করেন কিন্তু তাবৎ সাধারণ মানুষ, বৈয়াকরণের পরিভাষায় প্রাকৃত-



ভোলামাষ্টার-এর রূপসজ্জায় নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী



নবান্ন নাটকে প্রধান সমাদ্দার চরিত্রে বিজন ভট্টাচার্য

জনেরা, ভাষার উচ্চারণে এই শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করেনা। "লাইট"কে "নেইট", "আম"কে 'রাম', "শরীর"কে "শরীল" 'মেজাজ'কে "মেজাদ্"—এ আমরা হামেশাই বলে থাকি। একজন অভিনেতা ভাষার এই সব অশুদ্ধ উচ্চারিত রূপটিকে যদি আয়ত্ত না করেন, তা হলে, বলা বাহুল্য, তাঁর চরিত্রাভিনয় সম্পূর্ণ হবে না।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। একদিন মাকে সঙ্গে নিয়ে কোন একটি অভিনেতার অভিনয় দেখতে গেছি। অভিনেতাটি এক নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন কুটিল মন্তপ ব্যক্তির চরিত্রে রূপদান করেছিলেন। চরিত্রটি ইংরেজীতে যাকে বলে "লুম্পেন"—সেই জাতীয়। শিল্পী তাঁর প্রতিটি অভিব্যক্তিতে এমনভাবে সেই চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, যাকে এককথায় বলা যেতে পারে অনবদ্য। তাঁর রূপায়ণ দেখে সকলেই চমৎকৃত, বিস্মিত। অভিনয়-শেষে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন দেখলে? মা বললেন—খুব সুন্দর। তারপর একটু পরেই জিজ্ঞাসা করলেন—অভিনেতাটি খুব লেখাপড়া জানেন, না? আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? মা বললেন—ওঁর কথা বলার ভঙ্গীতে কেমন যেন মনে হচ্ছিল। বুঝলাম লুম্পেন চরিত্রে একাত্ম হয়ে প্রাণঢালা অভিনয় করলেও অভিনেতাটি সার্থক হতে পারেন নি, তাঁর কথা বলার ভঙ্গীতে তিনি যে শিক্ষিত মানস-সম্পন্ন ব্যক্তি তা লুকোতে পারেন নি দর্শকদের কাছে। যে চরিত্রে তিনি অভিনয় করছেন, তার হাবভাব, আচরণ আয়ত্ত করলেও তার কথা বলার রীতি—যাকে আমরা diction বলি—তার প্রতি সঠিকভাবে নজর না দেওয়ার ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। উচ্চারণ-ভঙ্গীও তাই যত্ন নিয়ে আয়ত্ত করা প্রয়োজন।

এছাড়াও আছে ডায়ালেক্ট বা উপভাষা। ভাষার লেখ্য রূপটি এক হলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু এবং আঞ্চলিক সংস্কার ইত্যাদির ফলে কথ্য ভাষার রূপটি মানুষের মুখে মুখে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। বাঙ্‌লা দেশের তাবৎ অঞ্চলের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে তা হলো বাঙ্‌লা ভাষা। এই বাঙ্‌লা ভাষার লেখ্য রূপটি সব অঞ্চলেই এক, হয় সাধু-গদ্য,

নয় তো ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের কথ্য ভাষার আদর্শ ধরেই তার লেখ্য-রূপটি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কথা বলার ভঙ্গীতে ভিন্ন ভিন্ন উপভাষার সৃষ্টি হয়েছে। বীরভূম অঞ্চলে সাধারণ মানুষ যেভাবে ভাষার উচ্চারণ করে, বাঁকুড়া অঞ্চলে তা করে না। আবার দক্ষিণ বঙ্গের কথ্য ভাষার সঙ্গে খুলনা সাতক্ষীরা অঞ্চলের কথ্য ভাষার উচ্চারণ-বিধি এক নয়। পূর্ববঙ্গের মানুষ বাঙলায় কথা বললেও পশ্চিম বঙ্গীয় মানুষের উচ্চারণ-বিধি থেকে তা স্বতন্ত্র। এমন কি আরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাবৎ পূর্ববঙ্গের মানুষের কথা বলার ঢঙও একরকম নয়। ঢাকার কথা বলার ভঙ্গী যে রকম, বরিশালের কথা বলার ভঙ্গীটি সেইরকম নয়। কুমিল্লা অঞ্চলের মানুষের কথার টান চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের কথা বলার রীতি থেকে আলাদা। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ভাষার উচ্চারণে এই ভিন্ন ভিন্ন স্বর-লয়টির সঙ্গে যদি অভিনেতা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না থাকেন, তাহলে তাঁর চরিত্রে রূপদান কখনই সার্থক হতে পারে না।

একদিন ছিল, যখন আমাদের নাট্য-সাহিত্যে তাবৎ জনসমষ্টি ছিল অপাংক্তেয়। অভিজাত সমাজের কতিপয় প্রতিভূস্থানীয় ব্যক্তিই তখন ছিলেন নাটকের মুখ্য পাত্র-পাত্রী, এবং অনেক সময় তাঁদের মুখে নাট্যকার স্বকপোলকল্পিত ভাষারই প্রয়োগ করতেন। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে যে সব পৌরাণিক নাটক রচিত হয়েছে, তার সংলাপ আদর্শ কথ্য ভাষার অনুসরণে অথবা নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত কাব্যছন্দে রচিত। রাম লক্ষ্মণ-কর্ণ-অর্জুন, আমাদের নাটকে যে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় কথা বলেছেন বলা বাহুল্য তা কৃত্রিম। অভিনেতাদের সেই কৃত্রিম সংলাপ তাল-লয় সহকারে সুষ্ঠুরূপে আবৃত্তি করতে পারলেই কাজ চলে যেত। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে এর বেশী আর এগুতে হতো না। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের পাত্র-পাত্রীরা যে কাব্যগুণসমৃদ্ধ ভাষায় কথা বলেছে, তা যে নাট্যকার-কল্পিত তা নিশ্চয় জোর করে প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আধুনিক কালে নাটকে এই ধরণের কৃত্রিম সংলাপ ব্যবহার করা হয় না।

১৯৩২ এর পর থেকে আমাদের নাট্যধারা যে নতুন বিবর্তনের পথে প্রাগ্রসরিত হয়েছে, তার ফলে শুধু মাত্র কতিপয় পৌরাণিক আদর্শ চরিত্র অথবা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূস্থানীয় চরিত্রই স্থান পায় নি—তার পরিবর্তে এসেছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মানুষ। আঞ্চলিক ভাষাকে কেন্দ্র করেও আজ নাটক রচিত হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের কথ্য-ভাষা আজ আর কেবল ব্যঙ্গবিদ্রূপ অথবা স্থূল হাস্যরস সৃষ্টির জন্য বাঙ্লা নাটকে স্থান পায় না, পরিপূর্ণ শৈল্পীক মর্যাদা নিয়েই আজ তা নাটকে পরিবেশিত হয়। বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' বা সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' মুখ্যত পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষার আশ্রয়ী। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'-এও আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্য পেয়েছে। উৎপল দত্তের নাট্যরূপায়িত 'তিতাস একটি নদীর নাম 'নাটকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের মালোদের কথ্য ভাষাই প্রধান।

এই সব নাটকে অভিনয় করতে গেলে অভিনেতাদের যে বিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার রূপরীতিটিও আয়ত্ত করতে হবে তা বলাই বাহুল্য। আজকের অভিনেতার দায় দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে, সাধনার ক্ষেত্রও হয়েছে সুদূরপ্রসারিত। ভাষার উচ্চারণ, এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার রূপরীতিটিও আজ সাধনার একটা অংশ।

কিন্তু এই সব বিচিত্র আঞ্চলিক ভাষা আয়ত্ত করা সহজ নয়। এর উচ্চারণে যে ভিন্ন ভিন্ন তাল লয় আছে—সাধারণভাবে যাকে আমরা বলি 'কথার টান', তা শিখতে সুকঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। ব্যাকরণ পড়ে অপিনিহিতি আর অভিশ্রুতির নিয়ম মুখস্থ করে যে, এ শেখা যায় না, তা বলাই বাহুল্য। এই শিক্ষা অভিনেতার শ্রবণ, দর্শন, এবং গ্রহণ ক্ষমতার ওপরেই নির্ভরশীল। সঙ্গীতের বাণী এবং স্বরলিপি মুখস্থ করে যেমন গান শেখা যায় না, তারজন্য দরকার হয় সুরের কান, ঠিক তেমনি ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে দেশের বিচিত্র আঞ্চলিক ভাষার পরিচয় জানা গেলেও তার প্রকৃত স্বরূপটি অধিগত করা যায় না। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধিৎসা এবং সুকঠোর অনুশীলনই হলো আঞ্চলিক ভাষা আয়ত্ব করার একমাত্র পন্থা। এর জন্য অভিনেতাকে

বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা করতে হবে দিনের পর দিন। আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ে তাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কইতে হবে। তারপর এইভাবে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলে অভিনেতা তাদের কথা বলার ঢঙ্‌টির সঙ্গে ক্রমশই পরিচিত হতে পারবেন। এবং তাঁর যদি সুরের কান থাকে, আর থাকে ভাষা-ভঙ্গী আয়ত্ত করার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা, তাহলে তাদের কথা বলার রীতিটি ক্রমশ আয়ত্ত করা সম্ভব হবে।

অভিনেতার দায়দায়িত্বের প্রসঙ্গে এই সব কথা মনে রেখেই নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ইদানীং কালের তাঁর অনেক বক্তৃতায় অভিনয় শিক্ষিচ্ছু ছাত্রদের একটি ডায়েরী সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে উপদেশ দিয়েছেন, যাতে দৈনন্দিন জীবনের পথ চলতে যে সব বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। সেগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত, এবং অবসরকালে সেইগুলির সমালোচনা এবং অনুশীলন করে অভিব্যক্তি প্রকাশের পাঠ গ্রহণ করতে পারেন অভিনেতা। একই পদ্ধতিতে উচ্চারণ ভঙ্গীর বিশেষত্বটুকুও লিখে রাখা যায়। তবে এই কাজ একটু কঠিন, কেন না phonetics বা ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে বিভিন্ন উচ্চারণ-রীতি লিখে রেখে শেখা সম্ভব নয়। কথ্য ভাষারীতি শিক্ষা করার সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো, বন্ধুত্বের প্রসারতা। খুব বেশী করে, এবং খুব ঘনিষ্টভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত। এই মেলামেশার মধ্য দিয়ে খুব সতর্কভাবে তাদের কথা বলার রীতির প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব; তারপর যদি বাড়ীতে সেগুলো বারবার উচ্চারণ করে সড়গড় করে নেওয়া যায়, তাহলে কতকটা কাজ চালানর মত কথ্যরীতি শিক্ষা সম্ভব।

আধুনিক কালের নাটকে অভিনয় করতে গেলে আঞ্চলিক উপভাষা শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কেন না, আমরা পূর্বেই বলেছি একালের নাটকে আঞ্চলিক কথ্য ভাষারীতির প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। 'নবান্ন', 'গোত্রান্তর', 'মরা চাঁদ', 'ছায়াপথ', 'বাস্তভিটা', 'দুঃখীর ইমান', 'পথিক', 'ছেঁড়া তার', ইত্যাদি নাটক অভিনয় করতে গেলে

আঞ্চলিক উপভাষা শিক্ষা না করে উপায় কি? কেন না উল্লিখিত সব কটি নাটকই বাঙ্‌লাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য ভাষারীতির আশ্রয়ে রচিত।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বিজন ভট্টাচার্যের নাট্য-প্রযোজনার ব্যাপারে ছাত্রদের ভাষা-শিক্ষাদানের পদ্ধতিটির আলোচনা করা বোধ করি অবান্তর হবে না। বিজনবাবুর "মরা চাঁদ" নাটকটি খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলের কথ্য ভাষারীতির আশ্রয়ে রচিত। ঐ নাটকে "শচীন বাবু" নামে একটি সমাজসেবীর চরিত্র আছে। বর্তমান লেখককে উক্ত চরিত্রে কয়েক বার অভিনয় করতে হয়েছে। কিন্তু খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে পরিচিত না থাকায় উক্ত চরিত্রটি আয়ত্ত করতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। এই অসুবিধার কথা বিজনবাবুকে জানালে তিনি প্রথমেই বললেন ঐ সব অঞ্চলে যাঁরা বাস করেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলো। এবং স্বয়ং ঐ সব অঞ্চলের লোকজন, যাঁরা কোলকাতায় আছেন, তাঁদের এনে হাজির করলেন আমাদের সামনে। আমরা তাঁদের সঙ্গে কথা বললাম। খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁদের কথা বলার সুর-তালটি লক্ষ্য করলাম, এইভাবে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতার ফলে ধীরে ধীরে ভাষারীতিটিও আমাদের আয়ত্ত হয়ে গেল সহজেই। 'ছায়াপথ' নাটকের বেলা কিন্তু আরো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাদের। কেননা ঐ নাটকের চরিত্রগুলি এসেছে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের ভিক্ষাজীবী মানুষের মধ্য থেকে। তাদের রাগ, দ্বেষ, হিংসা, তাদের প্রেম, পারভারসান, সকলের জানার কথা নয়। তাই যখন উক্ত নাটকের মুখ্য চরিত্রে (এক অন্ধ ভিখারীর ভূমিকায়) আমার অভিনয় করার ভার পড়ল, তখন রীতিমত মুষড়ে পড়লাম আমি। কেননা এই জাতীয় চরিত্রের হাব ভাব, কথা বলার বিশেষ ঢঙ্, রাগ-দ্বেষের বিশিষ্ট প্রকাশ কোনটির সম্বন্ধেই আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা। পরিচালক বিজনবাবু একথা জানতেন। তাই নাটকের চরিত্র অভিনয় করার দায়িত্ব অর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করলেন শিক্ষাদান। এবারেও চলল সেই একই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান। দিনের পর দিন তিনি আমাদের ভিখারীদের সঙ্গে কথা বলিয়েছেন, অনুকরণ করতে বলেছেন তাদের হাবভাব

দিনে, রাতে, সন্ধ্যায়, বিভিন্ন mood-এ আমরা ভিখারীদের দেখেছি ; কখন রাস্তায় ভিক্ষার সময়, কখন কালীঘাটের ফুটপাথে ঘুমোবার সময়, আবার কখন কোন বিয়ে বাড়ীর ধারে রাস্তার ডাস্টবিনের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট পর্যুসিত অন্ন গোগ্রাসে গলধঃকরণ করার সময়, আমরা ভিখারীদের লক্ষ্য করেছি। শুনেছি সেই সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাদের কথা বলার ঢঙটি ; এইভাবে দিনের পর দিনের চেষ্টায় তবেই হয়ত 'ছায়াপথ' নাটকের অন্ধ-ভিক্ষুক চরিত্রটি কথঞ্চিৎ পরিমাণে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

বিজনবাবু বলেন, অভিনয়-শিক্ষার এইগুলিই হলো প্রত্যক্ষ রীতি অর্থাৎ কিনা Practical Lessons। এই প্রত্যক্ষ রীতির অনুশীলনের মধ্য দিয়েই একজন অভিনয়-শিক্ষালিপ্সু ছাত্র ধীরে ধীরে অভিনয়-কলায় পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে। দক্ষতার কথা অবশ্য অনেক পরে। কেননা সেটা ছাত্রের মানস পরিমণ্ডলের ব্যাপার।

এর পর হলো সুষ্ঠু উচ্চারণ রীতি আয়ত্ত করার প্রশ্ন। আমরা আগেই বলেছি অসতর্কতার জন্য দৈনন্দিন জীবনে তাড়া-হুড়ো করে আমরা অনেক শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ করে থাকি, সেটা হলো একজন অভিনেতার পক্ষে মারাত্মক অপরাধ। আর কেবলমাত্র অসতর্কতার জন্যই নয়, অনেক সময় সাময়িক ভাবে জিভের জড়তা, যা নাকি অল্প আয়াসেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, তার জন্যও শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ আমরা করে থাকি। জন্মগত ভাবে যাদের জিভের আড়ষ্টতা আছে, তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যাদের তা নেই, তারা একটু চেষ্টা করলেই অশুদ্ধ উচ্চারণের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। এর জন্য যে প্রক্রিয়ার অনুশীলন করা উচিত, তাহলো জোরে জোরে রীডিং পড়ার অভ্যাস করা। যে সব রচনায় তদ্ভব তৎসম শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত, অর্থাৎ যে সব রচনা জোরে চেঁচিয়ে পড়তে প্রতি পদে অশুদ্ধ উচ্চারণের সম্ভাবনা, সেই ধরনের রচনা বেছে নিয়ে নিয়মিত ভাবে রীডিং পড়ার অভ্যাস করা উচিত। ধরা যাক মাইকেল মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, অথবা অক্ষয়কুমার দত্তের রচনার কথা। বাঙ্‌লা সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক মাত্রেই জানেন যে, আমাদের গদ্য-রীতির প্রাথমিক পর্যায়ে যে সংস্কৃত তৎসম শব্দের

প্রাধান্য ছিল, উল্লিখিত লেখকগণের রচনায় তা বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। বিশেষ করে মাইকেল মধুসূদন এবং অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাকে রীতিমত কঠিনই বলতে হয়। মধুসূদনের 'হেক্টর বধ', কি অক্ষয়কুমারের 'স্বপ্নদর্শন' বিষয়ক রচনাগুলি সাবলীল ভাবে পাঠ করা নিতান্ত দুরূহ। জিভের সাময়িক আড়ষ্টতা কাটিয়ে যিনি স্পষ্ট উচ্চারণ-রীতি শিক্ষায় ইচ্ছুক, তাঁর বিশেষ ভাবে মধুসূদনের 'হেক্টর বধ' অথবা অক্ষয়কুমার দত্তের "স্বপ্নদর্শন" বিষয়ক রচনাগুলি থেকে নিয়মিত ভাবে কিছু অংশ জোরে জোরে রীডিং পড়া উচিত। প্রতিদিন সকালে অন্ততঃ আধঘন্টা করে এঁদের রচনা পাঠ করলে উচ্চারণের বিশুদ্ধতা এবং জিভের আড়ষ্টতাই যে কাটবে তা নয়, বাঙ্‌লা শব্দভাণ্ডারের ঝুলিটিও পাঠকের ভরে উঠবে ক্রমশ। মাতৃভাষা শিক্ষা করতে গেলে, এঁদের রচনা দিয়েই শুরু করা উচিত, আর মাতৃভাষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়ত্ত না করলে, একজন অভিনেতা, অভিনয় জীবনে সার্থকতা লাভ করবেন কি করে?

এছাড়াও উচ্চারণ এবং আবৃত্তি অভ্যাসের জন্য রবীন্দ্রনাথ এবং শিশির কুমার ভাদুড়ীর যে সব রেকর্ড প্রচলিত আছে সেগুলি, এবং শম্ভু মিত্র প্রমুখ শিল্পীর আবৃত্তি শ্রবণ, প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ঠ সাহায্য করতে পারে। এ-বিষয়ে অভিনয় লিপ্সু ব্যক্তির বিশেষ নজর দেওয়া নিশ্চয় উচিত।

ফলকথা, নাটক সংলাপময়। আর সেই সংলাপের পরিশুদ্ধ উচ্চারণের মধ্য দিয়েই তার অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনাটি পরিস্ফুট করা সম্ভব। সেই কারণে সব কিছুর আগে সচেতন মন নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে একজন অভিনেতার বিশুদ্ধ উচ্চারণ-ভঙ্গী আয়ত্তীকরণের শিক্ষা লাভ করা উচিত। আর এইজন্য চাই ব্যাকরণ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান। তারপর আছে বিভিন্ন মানুষের কথা বলার রীতি-নীতি, এবং আঞ্চলিক উপভাষা। আর এগুলো ছাড়াও অধিকন্তু আছে তাবৎ প্রাকৃতজনের অশুদ্ধ শব্দ-উচ্চারণের রীতি। একজন অভিনেতার পক্ষে সবকটিকেই নির্ভুল ভাবে আয়ত্ত করতে হবে; শুদ্ধ-অশুদ্ধ, কোন উচ্চারণকেই বাদ দিলে চলবে না, কেননা তিনি বৈয়াকরণ নন, তাবৎ মানুষের প্রতিনিধি তাদের সুখদুঃখ, ব্যথাবেদনা

তাদের ভাষাতে প্রকাশ করে তাদেরই চিত্ত জয় করে থাকেন একজন অভিনেতা, উদ্বুদ্ধ করেন তাদের মনের প্রসুপ্ত ধ্যানধারণাগুলিকে।

মনে করা যাক কোন একটি নাটক খুব তোড়জোড় করে অভিনয়ের জন্য রিহার্সাল করা হলো। তার দৃশ্যপট, তার আলোক, সঙ্গীত ইত্যাকার ব্যাপারে ধার-দেনা করে প্রচুর খরচাও করা গেল। অপেশাদার নাট্যসংস্থার বেলায় এই ধরনের ধার দেনা করাটা যে কেবলমাত্র বিপজ্জনক তা নয়, অনেক সময় বেশ খানিকটা ঝুঁকিও বটে। তবু তা হলো; অধিকন্তু পোস্টার, বিজ্ঞাপন, হল ভাড়া, কালেক্টর, কর্পোরেশন ইত্যাদির ট্যাক্স দিয়ে খুব কম হলেও হাজার খানেক টাকা ব্যয়িত হলো একটা নাটক প্রযোজনার পেছনে।

কিন্তু অভিনয়ের সময়, দৃশ্যপট আর আলোক-প্রক্ষেপণে যতই চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করা যাক না কেন, যদি নাটকের চরিত্রে যারা রূপদান করছে সেই অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর শোনা না যায়, যদি নাটকের সংলাপে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে একজন অভিনেতা ঠিক মত উচ্চারণে অসমর্থ হয়, তাহলে ফলটা কি দাঁড়াবে? নাট্য-প্রযোজনার জন্য যে ঝুঁকিটা সকলে মিলে গ্রহণ করেছিল, সেটাই কি সিন্ধাবাদের মত গলার পাথর হয়ে ঝুলবে না? বেশীর ভাগ অপেশাদার সংস্থার প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়, তার মূলে আছে, সেখানে যারা অভিনয় করে তাদের উচ্চারণ সম্পর্কে এই অনবধানতা বা অবহেলা। বেতালা বেসুরো চীৎকার করে, একটা শব্দকে ভুল উচ্চারণ করে, তার মানে সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত করে, এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ীর সৃষ্টি হয়। সমস্ত পরিশ্রম, আগ্রহ, উত্তেজনা, পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়ে দর্শকের কাছে তা হাস্যকর হয়ে ওঠে।

চিত্তচমৎকারী আলোক-প্রক্ষেপ অথবা চক্ষু বিভ্রমকারী দৃশ্যপট, ক্ষণিকের জন্য দর্শকের মন আকৃষ্ট করতে পারে, কিন্তু নাটকের ব্যাপারে তা সব নয়। তা যদি হতো, তাহলে কেবলমাত্র সেইগুলোর চমকপ্রদ ব্যবহারেই নাট্য-প্রযোজনা সাফল্যমণ্ডিত করা যেত, দুঃখের বিষয় তা যায় না। সুস্পষ্ট উচ্চারণ এবং শব্দের যথার্থ অর্থ বজায় রেখে তার ওপর সুসংযত শ্বাসাঘাত বা emphasis,

নাটকের ব্যাপারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর তা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষা করা উচিত। যে অভিনেতা সুষ্ঠু ভাবে, সুস্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারেন না, তিনি যখন কোন সাধারণ চরিত্রে সংলাপের অশুদ্ধ উচ্চারণের অনুকরণ করেন, তাতেও ব্যর্থকাম হন। কেননা ভুল উচ্চারণ সচেতন ভাবে তখনই করা সম্ভব যখন তিনি সেই শব্দটির সত্যিকারের সঠিক উচ্চারণ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ভাবে অবহিত থাকেন।

"এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল" অভিনয় করার ব্যাপারে এই কথাটা খুব চলতি কথা। অভিব্যক্তি তেমন ফুটল কি ফুটল না, সে কথা পরে, এমনকি চরিত্রের মূল ভাবটাও কতখানি বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে কি হচ্ছে না, সে কথাও পরে, আগে দর্শককে শোনাও যে তুমি কি বলছ! কেমন করে বলছ সে বিচার তার পর। একজন অভিনেতাকে অভিনয় করার সময় দুটো কথা সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে, তা হলো "কি বলছি" এবং "কেমন করে বলছি"। এই "কি বলছি"র মধ্যেই পড়ে উচ্চারণ, শ্বাসাঘাত, ইত্যাদির কথা ; আর অভিব্যক্তি, স্বরবিন্যাস ইত্যাদি হলো "কেমন করে বলছি" এই পর্যায়ের চিন্তা। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই "কেমন করে বলছি" এই চিন্তার পর্যায়ে যে সব পর্যায়-ক্রম আছে তারই আলোচনা করবো।

চতুর্থ অধ্যায়

এক

কণ্ঠস্বর

উপযুক্ত ভাবে উচ্চারণ-পদ্ধতি আয়ত্ত করার পর আসে কণ্ঠস্বর সাধনার কথা। কণ্ঠস্বর হলো অভিনেতার সবচেয়ে বড় সম্পদ। কেননা আমরা বার বার বলেছি যে, দর্শককে শোনানর ওপরেই নির্ভর করে নাটকের প্রকৃত সার্থকতা। উচ্চারণের জড়তা, অথবা কণ্ঠস্বরের দুর্বলতার জন্য উচ্চারিত সংলাপ যদি দর্শক-সাধারণ শুনতে না পান, তাহলেই তাঁরা louder! louder! বলে চীৎকার করে ওঠেন। সুস্পষ্ট উচ্চারণের জন্য কণ্ঠস্বরের জোরের দরকার হয় না, জোরের দরকার হয় সেই উচ্চারণকে শোনাবার জন্য। তাই উচ্চারণ-সাধনার পরই আসে স্বর-সাধনার কথা।

স্বর-সাধনা ব্যাপারটা অনুশীলন করার পূর্বে একজন অভিনেতাকে তিনটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। তাহলো—

(১) জোরে চীৎকার করলেই তা স্পষ্ট হয় না, বরং তাতে কণ্ঠের ক্ষতি হয়।

(২) বেসুরো চীৎকার করলে সুস্পষ্টতা বিসর্জিত হয়।

(৩) কৃত্রিম ভাবে কণ্ঠস্বরকে মোটা বা সরু করলেই, কণ্ঠস্বর নাটকীয় হয় না।

প্রথমে জোরে চীৎকারের কথাটাই ধরা যাক। যেহেতু নাট্যাভিনয়ের প্রথম কথা হলো দর্শককে শোনান, সেই হেতু জোরে চীৎকার করলেই বুঝি সেই কার্য যথোচিত ভাবে সমাধা করা সম্ভব একথা অনেকে মনে করতে পারেন। আসলে তা নয়। Shouting is not acting, অর্থাৎ জোরে চীৎকার করলেই অভিনয় করা যায় না, একথা একজন অভিনেতাকে সদাসর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। কেননা তাতে দর্শকের শোনা দূরে থাক, গণ্ডগোলের সৃষ্টিটাই

হবে সবচেয়ে বেশী। শুধু মাত্র কতকগুলি শব্দ যেন তেন প্রকারেণ দর্শকের কানের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়াটা অভিনেতার উদ্দেশ্য নয়, সেই শব্দের ব্যঞ্জনা দর্শকের মনে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে তাকে আকুল করে তোলাতেই অভিনয়ের সার্থকতা।

দ্বিতীয়ত বেতালা বেসুরো ভাবে চীৎকার কর্ণপটাহের বিরক্তিই আনে। গানের নামে বেসুরো চীৎকার যেমন হাস্যকর, অভিনয়ের নামে তাল-লয়হীন চীৎকারও ঠিক তদ্রূপ হাস্যোদ্রেককারী এবং আরো বেশী বিপজ্জনক। গানের গায়ক তবু একক, আর অভিনয় করেন এক সঙ্ঘবদ্ধ অভিনেতা গোষ্ঠী। এক একটা নাটকে তো খুব কম চরিত্র থাকে না, অন্তত পক্ষে দশ-বারোজন মেয়ে পুরুষ তো থাকেই। ভাবুন তো, সেই দশ বারোজন মিলে মঞ্চে উঠে যদি বেতালা বেসুরো চীৎকার জুড়ে দেয়, তাহলে পরিস্থিতিটা কেমন হয়? ঢাক আর পিয়ানো দুটোই বাজনা। কিন্তু কোনটা অধিক প্রেয়, তা বোধ করি বলে দিতে হবে না। আমাদের কথা হলো অভিনয় ব্যাপারটা যেন কখনই ঢাকের বাদ্যি না হয়ে দাঁড়ায়, কেননা ঢাকের বাদ্যি না থামলে ভাল লাগেনা, এটি একটি খুব প্রচলিত কথা, এবং সেই প্রচলিত প্রবাদটি অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজিত থাক—অভিনয়কে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা তা নিশ্চয় চাইবেন না। Scale বা পর্দার সঙ্গে পরিচিত না থাকলে একটি চরিত্রের কথা বলার সঙ্গে, অপর একটি চরিত্রের কথা বলার সমতা রক্ষা হয় না। এবং এর কথা ওর ঘাড়ে পড়ে শব্দতরঙ্গে বেতালা বেসুরো কম্পনের সৃষ্টি করে, যে অবস্থাটাকে একমাত্র পাগলা ঘন্টির উন্মত্ত বাজনার সঙ্গেই তুলনা করা যায়।

শব্দতত্ত্বের আলোচনায় chorded note এবং dischorded note বলে একটা কথা আছে। পদার্থবিদ্যায় Musical sound এবং noiseএর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> "A musical sound consists of a regular and periodic vibration, while a noise is a discontinuous sound produced by a sort of confused, sharp and irregular movements in a medium"

আমাদের নাটকের ব্যাপারে এই musical soundএরই প্রয়োজন। কণ্ঠস্বরের লালিত্য, গভীরতা (intensity) এবং ঝঙ্কার (resonance) ইত্যাদির মাধ্যমে এই musical soundএর সৃষ্টি করা হয়। সাঙ্ঘটিক ভাবে অভিনয়ের সময় অভিনেতৃবর্গকে এই কথাটা মনে রাখতে হবে। নৈলে সমগ্র নাট্য ব্যাপারটা সুসঙ্গ রূপ পরিহার না করে, পরিণতিতে একটা বিশ্রী গণ্ডগোলের সম্ভাবনায় পর্যবসিত হবে। শব্দ বায়ুতরঙ্গকে তাড়িত করে ভেসে আসে। সেই তাড়িত বায়ুতরঙ্গের কম্পন যদি regular হয়, তাহলেই কর্ণের পক্ষে তা সুখকর, আর irregular হলেই noise অর্থাৎ গোলমালের সম্ভাবনা। কণ্ঠস্বরকে শ্রাব্য করে তুলতে শব্দতরঙ্গ এবং তজ্জনিত ধ্বনিতরঙ্গের ইতরবিশেষের কার্যকারণটি সম্পর্কে একজন অভিনেতার সবিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে, অযথা চীৎকার করলে কণ্ঠস্বাস্থ্য পঙ্গু হয়ে পড়তে পারে যে কোন সময়ে। এতে করে, মেডুলা; ফ্যারিংস, ল্যারিংস ইত্যাদিতে অযথা চাপ পড়ে, বক্ষগহ্বর বা থোর‍্যাক্সএ চাপ পড়ে ফুসফুসকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, পেটের বিভিন্ন শিরায় চাপ পড়ে নানা দুরারোগ্য ব্যাধির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, সুতরাং অপটুভাবে গলার জোর বাড়ানর জন্য চীৎকার করা কখনই উচিত নয়। এর জন্য চাই উপযুক্ত গুরুর অনুসন্ধান, একমাত্র যাঁর সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক প্রথাসম্মত নির্দেশই কণ্ঠস্বরকে সুন্দর স্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করে।

তৃতীয়ত কণ্ঠস্বরের বিকৃতি সাধনের কথা। অনেকে মনে করেন, গলাকে জোর করে মোটা করলে বুঝি ভাল গলার অধিকারী হওয়া যায়। আর সেই ভেবে তাঁরা নিজের স্বাভাবিক কণ্ঠকে চেপে একরকম জোর করেই এক অস্বাভাবিক গলায় কথা বলেন বা বলতে উৎসুক হন। এমন অনেক অভিনেতা আছেন যাঁরা স্বাভাবিক গলায় কথা বলেন, কিন্তু অভিনয়ের সময় এক কৃত্রিম গলা বার করেন। বিশেষ করে যাত্রাভিনয়ে গলার কৃত্রিম ব্যবহারের প্রবণতা সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। লালিত্য, ঝঙ্কার ইত্যাদি হলো স্বাভাবিক বস্তু; অস্বাভাবিক উপায়ে সেগুলো কখনই আনা যায় না।

সুতরাং সাধনার প্রাক্কালে একজন অভিনেতার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরটিকেই কেন্দ্র করে, তার পর রঙ্ চড়ান উচিত। অস্বাভাবিক উপায়ে শিল্পবস্তু আয়ত্ত অথবা প্রকাশ সম্ভব হয় না। শিল্প অস্বাভাবিক নয়, নিতান্ত স্বাভাবিক, আর স্বাভাবিক বলেই তা চিত্তচমৎকারী। অস্বাভাবিক বস্তু বিস্ময়ের কারণ, হৃদয়রঞ্জন করার ক্ষমতা তার কখনই থাকা সম্ভব নয়।

দুই

ব্যক্তিভেদে স্বরভেদ

এখন কথা হলো এই যে, ব্যক্তিভেদে কণ্ঠস্বরের বিভিন্নতা আছে। কেন না কণ্ঠস্বরের তারতম্য ব্যক্তির স্বাস্থ্য, অস্বাস্থ্য, তার চিন্তা-প্রক্রিয়া, দৈনন্দিন কার্যাবলী ও তার পরিবেশ ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্য দুর্বল হলে, স্বাভাবিক ভাবেই কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, এবং লালিত্যহীন হয়ে যায়। আবার যিনি খুব গভীর ভাবে চিন্তা করেন, তিনি স্বভাবতই খুব ধীরে ধীরে, থেমে থেমে কথা বলে থাকেন, ফলে তাঁর কণ্ঠস্বরে খুব জোর থাকে না। আবার যাঁরা কলকারখানায় চাকরী করেন, যান্ত্রিক শব্দতরঙ্গের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা বলতে বলতে তাঁদের কণ্ঠ স্বভাবতই একটা উচ্চ স্বর-গ্রামে বাঁধা হয়ে যায়। বক্তৃতা করা যাঁদের কাজ, তাঁদের বেলাতেও এ কথা সত্য।

আবার অপর পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই কারো গলার আওয়াজ খুব নিটোল, ভারী, কারো বা ক্ষীণ, পাতলা। কারুর স্বরে নাসিক্য ধ্বনির (nasal sound) প্রাধান্য, আবার কারুর গলা চাপা, ফ্যাঁসফেঁসে। বলা বাহুল্য বিধিদত্ত এই বিচিত্র কণ্ঠভঙ্গিমার বিরুদ্ধে কারুর কিছু করবার নেই। সর্বান্তঃকরণে এই বৈচিত্র্য মেনে নিতেই হবে। অবশ্য তাই বলে যাঁর কণ্ঠস্বর খুব জোরাল বা মোটা, একমাত্র তিনিই যে অভিনেতা হবার অধিকারী একথা কখনই সত্য নয়। কেন না সু-অভিনেতা হওয়াটা কণ্ঠস্বরের সরুত্ব-মোটাত্বের ওপর নির্ভর করে না। কণ্ঠস্বরের সুষম বিন্যাসভঙ্গী আয়ত্ত করে, অভিব্যক্তি প্রকাশের কাজে একজন অভিনেতা তাকে কতখানি কাজে লাগাতে পারেন,

তার ওপরেই তাঁর অভিনয়-কৃতিত্বের মূল কথাটি নির্ভরশীল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং নটশেখর নরেশ মিত্রের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শিশিরকুমারের উদাত্ত লালিত্যময় কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নরেশ মিত্রের কণ্ঠস্বরের কোন তুলনাই হয় না ; কেননা নরেশ মিত্রের কণ্ঠস্বরে নাসিক্যধ্বনির প্রাধান্যই বলবতী। তথাপি অভিনেতা হিসেবে তিনি যে অল্প শক্তিমান ছিলেন একথা নিশ্চয় কেউ মনে করবেন না আশা করি। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও কৃষ্ণচন্দ্র দে, এবং কুমার শচীন দেববর্মণের কণ্ঠস্বরের তুলনা করা যেতে পারে। শচীন-দেবের মত কণ্ঠস্বর যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কি পরিমাণে যাদুর সৃষ্টি করতে পারে, তা তাঁর গানের গুণগ্রাহী শ্রোতা মাত্রই অবগত আছেন। অথচ ভালো গলা বলতে সাধারণ ভাবে আমরা যা বুঝি, শচীন দেববর্মণ নিশ্চয় তার অধিকারী নন।

আধুনিক কালের অভিনেতাদের কথা প্রসঙ্গেও এই ভাবে নট-নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, এবং শম্ভু মিত্রের কণ্ঠস্বরের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। শম্ভু মিত্র নিটোল, উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী। শ্রীমিত্রের কণ্ঠস্বরের সহজ সাবলীল সুর-লালিত্যে দর্শকমণ্ডলী যে কি পরিমাণ মুগ্ধ হয়ে যান, তা তাঁর অভিনীত 'রক্তকরবী' নাটকে রাজা, 'দশচক্রের' ডাঃ গুহ, অথবা 'বিসর্জনের' জয়সিংহ ইত্যাদি চরিত্র যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কাছে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অপর পক্ষে বিজন ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বর শ্রীমিত্রের মত উদাত্ত নয়, বরং তুলনায় কিছুটা সরুই বলা চলে। বিজন ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বর প্রেক্ষাগৃহে শম্ভুবাবুর কণ্ঠের মত মায়াজাল বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু অভিনেতা হিসেবে বিজনবাবু যে আধুনিক নবনাট্য আন্দোলনকারীদের অন্যতম একথা নিশ্চয় অতিরঞ্জিত নয়। বিজনবাবুর 'নবান্নে'—'প্রধান সমাদ্দার', "মরা চাঁদের"পবন এবং কেতকদাসের বিপরীতধর্মী দ্বৈত ভূমিকা, 'গোত্রান্তর' এর 'হরেন মাষ্টার' এবং সাম্প্রতিক কালে 'তিতাস একটি নদীর নামে' রামকেশবের ভূমিকাভিনয় যাঁরা দেখেছেন, অভিনেতা হিসেবে তাঁর আশ্চর্য দক্ষতার কথা তাঁরা মনে মনে নিশ্চয় স্বীকার করবেন।

অতি আধুনিক কালের অভিনেতাদের মধ্যে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়,

শোভেন মজুমদার, কুমার রায়, জোছন দস্তিদার, কিরণ মৈত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। শম্ভুবাবু, বিজনবাবু, কিম্বা গঙ্গাপদ বসুর মত প্রাতভাধর এঁরা না হলেও অভিনেতা হিসেবে এঁদের ক্ষমতা নিন্দনীয় নয়। এঁদের অভিনয়ের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন,তাঁরাই জানেন যে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, বা কুমার রায়, কিরণ মৈত্র যে সতেজ সাবলীল কণ্ঠের অধিকারী, শোভেন মজুমদার অথবা জোছন দস্তিদার সেই রকম সতেজ কণ্ঠের অধিকারী নন বরং শেষোক্ত দুজনের কণ্ঠস্বর একটু চাপা এবং ফ্যাঁসফেঁসে বলা যায়। কিন্তু তবু শোভেন মজুমদারের 'বিশু পাগলা' বা "নক্ষত্র রায়ের" ভূমিকাভিনয়, অথবা জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল' কিম্বা 'স্বর্ণগ্রন্থি' নাটকের চরিত্রাভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন, যে অভিনেতা হিসেবে এরা যথেষ্ট শক্তির অধিকারী।

ভালো গলা থাকা খুব ভালো ; কিন্তু না থাকলেও দুঃখিত হবার কারণ নেই, এটাই হলো আসল কথা। কিন্তু সাধারণ ভাবে অনেক সময় একথাটা আমরা মানতে চাই না, তাই অভিনয় করতে গিয়ে স্বাভাবিক স্বরকে জোর করে অবদমিত করে, আমরা বিকৃত গলায় চীৎকার করি, অথবা কোন বড় অভিনেতার কণ্ঠস্বরকে নকল করার চেষ্টা করি। ফলটা দাঁড়ায় ন দেবায়, ন ধর্মায়। মাঝে হতে আপন কণ্ঠের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করে, তাকে বিকৃত করে ফেলে সমগ্র অভিনয়-প্রয়াসটাকেই করি পণ্ডশ্রমে পরিণত। গলার ব্যাপারে স্বভাবতই একটা সসঙ্কোচ দুঃখ দেখা যায় নতুন অভিনেতাদের মধ্যে। তাঁদের এই দুঃখের কথা স্মরণ করেই শম্ভু মিত্র যা বলেছেন এই প্রসঙ্গে তা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

> "আমার শারীরিক গঠনে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে, যার ফলে আমার গলা হয়তো কখনই ততো শ্রুতিমধুর বা ততো বিস্তৃতি পাবে না। 'যেমন, রবীন্দ্রনাথের শুনেছি অস্বাভাবিক বিস্তৃতি ছিল কণ্ঠের। কিন্তু তাই বলে যারা ভাগ্যের ওপর অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন, তারা নিশ্চয়ই আমার কথা শুনবেন না। কারণ, আমার একমাত্র পরামর্শ হচ্ছে যে, আমাদের খালি এই চেষ্টা করার

আছে যে, ভাগ্যের হাতে যা পেয়েছি, তাকে যথাসম্ভব ভালো করে তুলবো কী করে ?"

শ্রীমিত্রের মতে কণ্ঠস্বরকে সাধনার সাহায্যে কিছু পরিমাণ ভাল করে তোলা যায় এবং সেই সাধনা স্বাভাবিক স্বরকে যথাসম্ভব বজায় রেখেই করতে হবে। বিধিদত্ত ভাবে মানুষ যে কণ্ঠস্বর পেয়েছে তাকে শত চেষ্টা করলেও নতুন ভাবে বদলে নেওয়া যাবে না, তবে গলা সেধে তাকে কিছুটা সংস্কার করা যায় একথা সব সময়ে সত্য। সাধারণতঃ গলার স্বরবিন্যাস আমাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকেনা। আসাধা গলায় আড়ষ্টতা থাকে, ইচ্ছামত তার মধ্যদিয়ে আবেগ, অনুরাগ, ক্রোধ, ক্ষোভ, হিংসা, ইত্যাদির অভিব্যক্তি বার করা যায় না, তার জন্য চাই অনুশীলন। তাই একজন অভিনেতার পক্ষে কণ্ঠস্বরকে আয়ত্ত করাই প্রথম কাজ, কেননা অভিনয় ব্যাপারে উৎকর্ষতা সাধনের জন্য কণ্ঠস্বর হলো তার পক্ষে অন্যতম, অপরিহার্য উপাদান। John Bourne বলেছেন,

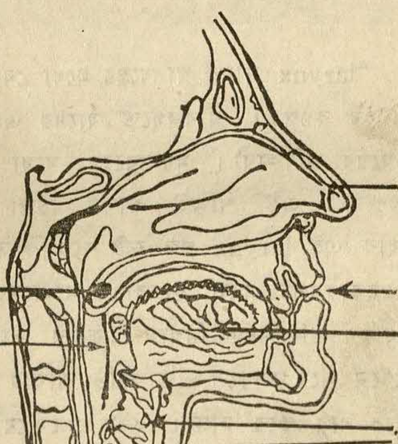
> "It is the actor's job to see that his voice is pleasing in its quality and sufficient in its quantity, and capable of an infinite variety of mood and character."

অর্থাৎ নিজের কণ্ঠস্বরের গুণগত এবং পরিমাণগত স্বরূপ সম্পর্কে একজন অভিনেতার সব সময় সতর্ক থাকা উচিত। তাঁর সব সময় যাচাই করে নেওয়া উচিত যে তাঁর কণ্ঠস্বর দর্শক মনোরঞ্জনের পক্ষে উপযুক্ত কিনা, তা চরিত্রের আন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির বিভিন্ন প্রবণতা বা moodএর অভিব্যক্তিতে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারছে কি না। বলা বাহুল্য স্বরবিন্যাস সাধনার যে কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত পর্যায়ক্রম আছে, তার অনুশীলন ব্যতীত স্বর-ভঙ্গিকে অভিনয়ের উপযুক্ত করে পরিপূর্ণভাবে আপন আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসা একজন অভিনেতার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সেই বৈজ্ঞানিক পন্থাগুলি সম্পর্কে প্রত্যেক অভিনেতার বা অভিনয়-কলা শিক্ষিচ্ছু ব্যক্তির সচেতন থাকা উচিত। আমরা বর্তমানে স্বরসাধনার সেই বৈজ্ঞানিক পন্থাগুলি সম্পর্কে যথাসাধ্য আলোচনা করবো।

তিন

শ্বাসযন্ত্র ও কণ্ঠনালী

কণ্ঠস্বরের তারতম্য নির্ভর করে মানুষের শ্বাসযন্ত্রের ওপর। সুতরাং সর্বপ্রথম এই শ্বাসযন্ত্র এবং তার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে কিছু কিঞ্চিৎ অবহিত থাকার প্রয়োজন আছে। এই শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কাজ ভালভাবে জানবার আগে, তাদের স্বরূপটা স্পষ্ট করে মনে রাখা দরকার; কেননা কেবলমাত্র গলা বা মুখ নয়, আমাদের ফুসফুস, উদর, উদরাবরণ, বক্ষ ও বক্ষপঞ্জর সমূহেরও এবিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকারিতা আছে।



সুষ্ঠু ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের কার্য যে কয়টি পর্বের মধ্যে দিয়ে সুসম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ফুসফুসের স্থিতিস্থাপকতা, উদর পেশীর সঙ্কোচন, বক্ষাবরণের স্থিতিস্থাপকতা, এবং পঞ্জরাস্থির পেশীগত সংকাচন প্রক্রিয়া বিশেষ কার্যকরী। অতএব পূর্বাহ্নে এইগুলোর অবস্থান ও কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা তাই পৃথক পৃথক ভাবে ছবির সাহায্যে

এদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করলাম, তারপর এগুলোর কার্যভঙ্গী আয়ত্ত করে কেমন করে স্বরপ্রক্ষেপ করা সম্ভব সে বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

প্রথমেই শ্বাসযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর কথা ধরা যাক। আমাদের শ্বাসযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর চেহারাটা হলো ওপরের ছবির মত।

ওপরের ছবিতে কণ্ঠনালীর যে রূপটি দেখা যাচ্ছে, তার স্বরগ্রন্থি, গলবিল, ইত্যাদি, ঐ গুলিই হলো স্বরসৃষ্টির উৎস। আমাদের গলা দিয়ে আওয়াজ উৎপন্ন হবার যন্ত্রটি, যার ইংরেজী নাম হলো Larynx, সেটি থাকে শ্বাসনালীর একেবারে আগায়। এই larynx-ই হলো শব্দ উৎপত্তিকারী যন্ত্র। এ-বিষয়ে বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নরেন বন্দ্যোপাধ্যায় "বহুরূপী" পত্রিকায় 'স্বর ও স্বর বিশৃঙ্খলা' প্রবন্ধে যা বলেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ডাঃ ব্যানার্জী বলেছেন—

> "larynx নামক শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে যে শব্দের উৎপত্তি তাকেই বলা হয় কণ্ঠস্বর। জীবজগতে যাদের এই যন্ত্র আছে তারাই কণ্ঠস্বরের অধিকারী। মুখগহ্বরের মধ্যে কণ্ঠস্বরের রকমফেরই বাকশক্তি। এই শক্তিই আপন চিন্তা প্রকাশের মাধ্যম।"

এখন দেখা যাক এই larynx শব্দ সৃষ্টি করে কি ভাবে। শব্দসৃষ্টির জন্য প্রথমেই যেটা দরকার সেটা হলো হাওয়া। আমাদের ফুসফুস হলো সেই হাওয়ার আধার। প্রতিনিয়ত নিশ্বাস-প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা বাইরে থেকে হাওয়া টেনে নিয়ে ফুসফুসে ভর্তি করছি, আবার তাকে প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার সাহায্যে বাইরে বার করে দিচ্ছি। এখন প্রথমে যে larynx-এর কথা বলা হলো, তার মধ্যে দুটি সামনে পেছনে বিস্তৃত ঠোঁটের মত পেশী আছে। আর এদের কিনারে আছে একফালি করে সাদা দুটি ছোট কলা (tissue)। এই কলা দুটি কণ্ঠনালীর সুড়ঙ্গকে একটু ঢেকে রাখে। যখন আমরা ফুসফুস থেকে হাওয়া বার করি, তখন তার ধাক্কায় ঐ কলা দুটি কাঁপতে থাকে, যার ফলে শব্দ তৈরী হয়।

অরগ্যানের হাওয়া যন্ত্রের মতই আমাদের ফুসফুস হাওয়ার আধারের কাজ করে; নিশ্বাস-প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে যার মধ্যে বাইরের হাওয়া

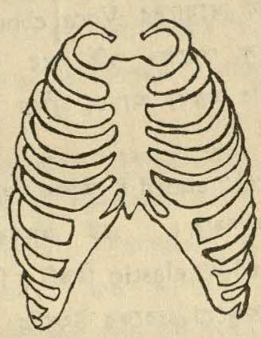
ভর্তি হয়, এবং প্রশ্বাসের সাহায্যে যা বাইরে বার করে দেওয়া হয়। তারপর আমাদের শ্বাসনালীতে আড়াআড়ি ভাবে যে তুটো কলা অর্থাৎ কিনা elastic membrane আছে, ফুসফুস থেকে হাওয়া বার হয়ে আসার সময়, তা এই elastic membrane বা vocal chord এ বাধাপ্রাপ্ত হয়, আর তারই ফলে হয় স্বরসৃষ্টি। ফুসফুসকে যেমন আমরা হাওয়া-যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, ঠিক তেমনই এই elastic membrane-কে তুলনা করতে পারি কম্পক বা Reed-এর সঙ্গে। ফুসফুস থেকে বের হয়ে আসা হাওয়ার ধাক্কায় আমাদের Vocal chord-এর elastic দিকটি তুলে উঠলে সে কতকগুলো তরঙ্গের সৃষ্টি করে শব্দের উৎপত্তি ঘটায়। এ বিষয়ে ডাঃ ব্যানার্জীর মন্তব্য আমরা নীচে উদ্ধৃত করে দিলাম। তিনি বলেন,

> "এই Vocal chord-ই কম্পক বা Reed-এর কাজ করে, আমাদের শ্বাসযন্ত্রে। এই কার্যের আশু পরিণতি হলো, Vocal chord-এর elastic দিকটি তু লিয়ে দেওয়া এবং নিয়মিত পর্যায়ে কতকগুলো তরঙ্গের উৎপত্তি ঘটানো, যা চাপের ফলে বেরিয়ে আসা হাওয়াটার স-ছন্দে বাধা প্রাপ্তির ফল, এবং এরই ফলে শব্দের জন্ম হচ্ছে।"

বলা বাহুল্য, সাধারণ অবস্থায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা যে পরিমাণ হাওয়া আমরা ফুসফুসের মধ্যে গ্রহণ এবং ত্যাগ করি, অভিনয়ের সময় তার থেকে অনেকগুণ বেশী পরিমাণ হাওয়া গ্রহণ ও ত্যাগ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কেননা তখন দৈনন্দিন জীবনের তুলনায় অনেক বেশী কথা বলার দরকার হয়, অনেক বেশী ভাব ও অভিব্যক্তির প্রয়োজন হয়, আর সেইজন্যই অনেক বেশী দমেরও দরকার হয়ে পড়ে। তাই সাধারণভাবে যে পরিমাণ হাওয়া ফুসফুসের মধ্যে আমরা টেনে নিই, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ হাওয়া সচেতন ভাবেই ফুসফুসে টেনে নিয়ে, তাকে একটু একটু করে বার করতে থাকি, না হলে দীর্ঘ সংলাপ শ্রাব্য করে তোলা এবং তা বলার মত যথেষ্ট পরিমাণ দম ধরে রাখা সম্ভব হয় না। বড়

বড় সংলাপ, যা নাকি অভিনয় করতে গেলে আবৃত্তি করতেই হয়, তার সুষ্ঠু উচ্চারণের জন্য দম ধরে রাখার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী, আর এই জরুরী কার্যটি সম্পাদন করতে গেলে শ্বাস প্রশ্বাসের কার্যটি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখার কৌশলটি আয়ত্ত করা চাই-ই।

এইবার ধরা যাক ফুসফুসের কথা। আমাদের বুকের মধ্যে ফুসফুসের অবস্থানটা নীচের ছবিটি দেখলে বোঝা যাবে।



উপরে ছবিটিতে যে, পাঁজরার আবরণটি দেখা যাচ্ছে, সেটি হলো বক্ষগহ্বর আমাদের বক্ষগহ্বরে ফুসফুস দুটি পঞ্জরাস্থি দিয়ে তৈরী ওই মজবুত খাঁচার মধ্যে সংরক্ষিত। এই ফুসফুস দুটিকে আমরা ইচ্ছামত নিঃশ্বাসের সাহায্যে হাওয়া ভর্তি করে প্রসারিত আবার প্রশ্বাসের সঙ্গে হাওয়া ত্যাগ করে সঙ্কুচিত করতে পারি। ওপরের ছবিতে যে খাঁচাটি দেখা যাচ্ছে, তার নানা সীমায় আছে, মেরুদণ্ড বা স্পাইন, পঞ্জরাস্থি বা রিব্‌স, ব্রেস্টবোন, এবং পেট ও বুকের প্রভেদ সৃষ্টিকারী কতকগুলি সূক্ষ্ম পর্দা বা শারীরতত্ত্বে যাকে বলা হয় থোর‍্যাক্স। কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ প্রণালী আয়ত্তীকরণে এই থোর‍্যাক্সের একটা বড় অংশ আছে। কেননা এই থোর‍্যাক্সের ব্যবহার না জানলে দম ধরে রাখা সম্ভব নয়। যথাসময়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

পূর্বের আলোচনায় আমরা জেনেছি যে, গলার মধ্যে larynx নামে যে বস্তুটি আছে, শব্দসৃষ্টির সেইটিই হলো উৎসস্থল। আর larynx থেকে উৎপন্ন শব্দের অনুকম্পক বা resonator-এর কাজ করে গলা এবং মুখ। গলার যেটা resonating instrument তাকে বলা হয় গলবিল বা pharynx. John Burn কণ্ঠস্বরের আলোচনায় গলা ও মুখের ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন যে, vocal chord-এর ওপরে যে নরম কলা (tissue) দুটি আছে, সে দুটিই শব্দ উৎপন্ন এবং প্রক্ষেপ করে।

> "It has the effect of throwing the voice forward. If the body is well-poised and the head carried correctly the pharynx will do its job properly."

অর্থাৎ গলবিল বা pharynx-কে দিয়ে ঠিক মত কাজ করাতে গেলে দাঁড়াবার সুঠাম ভঙ্গী এবং মাথার সঠিক অবস্থান প্রয়োজন। কথাটাকে আরো স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন আছে। ধরা যাক আমরা যদি মুখকে বুকের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে আওয়াজ করতে থাকি এবং তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে মাথাটা ঘাড়ের দিকে হেলিয়ে নিয়ে যাই, তাহলে স্পষ্ট শোনা যাবে যে, আওয়াজের একটু তারতম্য হচ্ছে। ব্যাপারটা একটু বিশদ করে চেষ্টা করা যাক।

প্রথমে যখন মুখটা বুকের দিকে ঝোঁকান অবস্থায় থাকে, সেই সময় 'সা' উচ্চারণ করলে যে শব্দ হবে, তার তুলনায় মুখ যখন নাক বরাবর সোজা থাকে, তখন ঐ একই স্বর সমপরিমাণ জোরের সাহায্যে উচ্চারণ করলে, উৎপন্ন শব্দটি প্রথমটির তুলনায় আর একটু পাতলা হবে। আবার মাথাটি যদি ঘাড়ের দিকে হেলিয়ে মুখ আকাশের দিকে তুলে ঐ একই স্বর সমপরিমাণ জোরের সঙ্গে আমরা উচ্চারণ করি তাহলে, তখন মাথার দ্বিতীয় অবস্থানের তুলনায় উচ্চারিত শব্দটি আরো পাতলা হয়ে যাবে। গলা ও মুখের বিভিন্ন অবস্থানের ফলে এক রকম জোরের সঙ্গে উচ্চারিত বর্ণের শব্দদ্যোতনায় এই পার্থক্যের কারণ, larynx এবং phraynx-এর ওপর বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধাঁচের চাপ পড়া।

অনেকে গলায় জোর করে চাপ দিয়ে নানা ধরণের শব্দ সৃষ্টি করে থাকেন, বলা বাহুল্য অভ্যাসটি মারাত্মক ; কেননা এতে করে larynx ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অভিনেতাকে মনে রাখতে হবে যে, কণ্ঠস্বর সৃষ্টি করার জন্য তিনি কখনই গলায় এমন অযথা চাপ দেবেন না, যাতে করে তাঁর গলার অভ্যন্তরের সূক্ষ্ম ঝিল্লিগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। Larynx এবং pharynx এর সহজ; সাবলীল অবস্থানই সুন্দর কণ্ঠস্বর সৃষ্টি করে। অন্যথায় তাকে যে কোন সময় বিকৃত এবং ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। এই সব কথা মনে রেখেই John Burn উচ্চারণের সময় ঘাড় ও মাথার সুঠাম অবস্থানের কথা বলেছেন। সুষ্ঠু স্বরসৃষ্টির প্রসঙ্গে Burn আরো যা বলেছেন, তাও বিশেষ ভাবে প্রণিধাণযোগ্য। তিনি বলেছেন,

> "The mouth, chief agent in the production of tonal quality in the voice, can be made a more competent resonator by exercise of the soft palate. This is the flexible part of the roof of the mouth which ends in the little bulbous excrescence known as the Uvula. If the soft palate is raised, it will give a greater clarity to the voice. Slackly held, it will muffle the passage of sound into the front of the mouth."

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, সুষ্ঠু স্বরবিন্যাস শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের সার্থক অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্ভব। বর্তমানে আমরা এই শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রন সম্পর্কেই কিছু আলোচনার চেষ্টা করবো।

চার

শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ

সাধারণ ভাবে আমরা যে সব কথা বলি তার জন্য বিশেষ কোন 'দম'-এর প্রয়োজন হয় না, একথা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। আর সাধারণ অবস্থায় এই বিশেষ দমের প্রয়োজন হয় না বলেই, তখন শ্বাসপ্রশ্বাস বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণের কথাও ওঠে না। কিন্তু অভিনয়ের কথা স্বতন্ত্র ; সেখানে

বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ কার্য আয়ত্ত করতে হয়: স্বরগ্রাম অর্থাৎ pitch, স্বরবিন্যাস অর্থাৎ modulation, ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হয়ে কণ্ঠস্বরের প্রকাশের মাধ্যমে সেগুলি আয়ত্ত করতে হয়।

একজন অভিনেতা মঞ্চে যে সব চরিত্রে রূপারোপ করেন, তারা যে এই মাটির পৃথিবীরই অধিবাসী একথা বলা বাহুল্য। রাজা-মহারাজাই হোক্, কৃষক-শ্রমিক-ভিখারি কিম্বা মধ্যবিত্তই হোক অথবা চোর, জুয়াচোর, বদমায়েস, পাগল, যাই হোক না কেন, দৈনন্দিন জীবনে তাদের আচার-আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে 'স্বাভাবিক' আচরণ করাই অভিনেতার কাজ। যদিও আমাদের সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে, দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিকত্ব আর মঞ্চের স্বাভাবিকত্ব এক কথা নয়। কেননা মঞ্চে নিরবচ্ছিন্ন কালকে একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে বেঁধে, জীবনের কতকগুলি মূহূর্তকে রূপায়িত করার মধ্যদিয়ে, সমগ্র জীবনের একটা আস্বাদ, অভিনেতা দর্শককে দিতে চেষ্টা করেন। আর এই কাজ করতে গেলে 'স্বাভাবিক' অবস্থার চেয়ে কিছু অধিক পরিমাণ জোরের প্রয়োজন আছে, নৈলে সর্বসমক্ষে তাকে বিশ্বাস্য অর্থাৎ convincing করে তোলা সম্ভব নয়। আর এই জন্য প্রয়োজন হয় স্বরগ্রাম বা pitch, এবং স্বরবিন্যাস বা modulation এর বিভিন্ন প্রক্রিয়া আয়ত্ত করা। দৈনন্দিন জীবনে কথা বলার সময় যে, এ গুলো থাকে না তা নয়, কিন্তু অভিনয়-করার সময়ে সেগুলো একটু বিশেষ ভাবে বাড়িয়ে নেবার প্রয়োজন আছে, এটাই হলো আসল কথা।

সব প্রথম 'দম' ধরে রাখার কথাটাই আলোচনা করা যাক। আমরা আগেই বলেছি যে, অভিনয়-কার্যের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন হলো দম ধরে রাখা। কেননা, 'দম' না থাকলে বড় বড় সংলাপ বলতে গিয়ে অভিনেতা হাঁপিয়ে ওঠেন, সব সারির দর্শকের কাছে উচ্চারিত সংলাপ পৌছে দিতে পারেন না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, সংলাপ বলার সময় দম হারিয়ে ফেলার জন্য, শেষের দিকে কথা বলার ঝোঁকটা কমে আসে, সুদীর্ঘ সংলাপের শেষের দিকের শব্দগুলো তাই প্রায়ই অনুচ্চারিত থেকে যায়।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এগুলো একজন অভিনেতার পক্ষে মারাত্মক ত্রুটি।

আর এই ত্রুটি সংশোধন করার জন্য কেউ কেউ হয়ত খুব তাড়াতাড়ি সংলাপ বলতে শুরু করেন ; যার ফলে এক শব্দের ওপর আর এক শব্দ হুমড়ী খেয়ে পড়ে তালগোল পাকিয়ে এক কিম্ভূতকিমাকার জটিলতার সৃষ্টি করে। অনেকে আবার দম ফুরিয়ে গেলে সংলাপ বলার সময়ে দিব্যি ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস নিতে শুরু করে দেন। তার ফলে বুক ও পেটের বেতালা ওঠা-নামায় অভিনয়ের সময় এক বিসদৃশ অবস্থা দেখা যায়। আবার কেউ কেউ আরো সহজ উপায় হিসেবে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে সংলাপ আবৃত্তি করে থাকেন। তার ফলে অভিনয়ের শেষে গলা ভেঙে যায়। অনেক অপেশাদার সখের অভিনেতাকে দেখেছি, দারুণ গরমেও গলায় কম্ফটার জড়িয়ে রোমান্টিক রোমান্টিক সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে বহুকষ্টে ফ্যাস ফ্যাস করে জবাব দেন, "আর বলো কেন ভাই, কাল রাত্তিরে থিয়েটার ছিল।" একদিন অভিনয় করে এই ভাবে গলায় কম্ফটার জড়িয়ে যদি ঘুরে বেড়াতে হয়, কিম্বা সারাবছর ধরে দেড়মণ নুনের জল করে 'গার্গল' করতে হয়, তাহলে অভিনয় না করাই ভালো। কেননা এই গলাভাঙার পরিণতিটা শুধু নুন জলের 'গার্গলে'ই শেষ নয় ; অযথা চীৎকারের ফলে larynx এবং pharynx-এ অসম্ভব জোর পড়ে, এবং যেহেতু সেগুলো মজবুত ষ্টীলের দ্বারা তৈরী নয়, সেহেতু সেগুলো মারাত্মক ভাবে জখম হয়ে যায়, যার ফলে সাময়িক ভাবে নয় শুধু, চিরকালের জন্য কণ্ঠস্বর জখম হয়ে যেতে পারে। সুতরাং তাড়াহুড়ো করে সংলাপ বলা, অথবা ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিয়ে অভিনয়কে বিসদৃশ্য কোরে তোলা, কিম্বা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে গলাকে চিরদিনের জন্য জখম করা, কোন কাজের কথা নয়। দম ধরে রেখে, অথবা ফুরিয়ে গেলে অভিনয়ের মাঝেই দর্শক-চক্ষুর অগোচরে 'চোরা দম' নেবার প্রক্রিয়াগুলো আয়ত্ত করার দরকার।

এ সম্পর্কে ছাত্রদের শিক্ষাদান কালে নট নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য যা বলে থাকেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, গভীর ভাবে নিশ্বাস নিয়ে তারপর দম না আটকে সংলাপ আবৃত্তি কর। যে অভিনয় করছে সে দম নিয়েছে কিনা তা বোঝার উপায় হলো, তার তলপেট শক্ত আছে কিনা

তাই দেখা। সঙ্গে সঙ্গে একথাটাও মনে রাখতে হবে যে, এই দম আটকানোর ফলে যেন 'মেডালায়' অযথা চাপ না পড়ে, গলার এবং রগের শির অযথা ফুলে না ওঠে, এবং মুখ রক্তবর্ণ ধারণ না করে। অবশ্য সময় বিশেষে যখন এগুলোর দরকার হয়, তখন করতে হয় বৈকি, কিন্তু এটাই যেন general practice না হয়ে দাঁড়ায়। বিজনবাবু, তাঁর ছাত্রদের উচ্চৈঃস্বরে রিডীং পড়বার যেমন উপদেশ দেন, তেমনি প্রত্যেকদিন সকালে উম্মুক্ত স্থানে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে গভীর ভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগের উপদেশও দিয়ে থাকেন। কোলকাতায় ফাঁকা মাঠ এবং নির্মল বায়ুর নিতান্তই অভাব, তবু উষাকালে লেক কিম্বা স্থানীয় কোন পার্কে, নিদেন বাড়ীর ছাদে (যেটা প্রায় অসম্ভব, কেননা কোলকাতার বাড়াতে ভাড়া থাকার ফলে ছাদের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক গৃহস্থেরই নেই) স্থর্যোদয়ের লগ্নে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের এই ব্যায়াম করা উচিত। এছাড়াও বুক ও পেটের free-hand exercise, এবং কিছু সহজ যোগাসনের প্রক্রিয়াও তিনি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যার ফলে ফুসফুসের সংকোচন ও প্রসারতা, স্বস্থ হয়, এবং উদর ও বক্ষ-প্রভেদক পেশীসমূহের কার্যকরিতা ও নিয়ন্ত্রণ শক্তি আয়ত্তীকরণ সম্ভব হয়। কেননা শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মূলে এই থোর‍্যাক্স-এর ব্যবহার বিশেষ কার্যকরী।

এর ফলে 'থোর‍্যাক্স' খুব বেশী সম্প্রসারিত হয়, এবং ফুসফুসের গভীরে খুব বেশী করে হাওয়া ঢুকতে পারে। কিন্তু এই ফুসফুসের মধ্যেকার হাওয়া বেশীক্ষণ আটকে রাখা উচিত নয়, কেননা তাহলে তা দূষিত হয়ে ওঠে, এবং তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। অনবরত বাইরের তাজা হাওয়া ফুসফুসে টেনে নেওয়া, এবং দূষিত হাওয়া বার করে দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে Miss Dorothy Birch বলেছেন,

> "Intercostal diaphragmatic breathing is the correct breathing for voice production because it allows the greatest proportionate expansion of the thorax, the use of the strongest muscles, and the filling of the base

of the lungs with a fresh supply of air, It is essential for the air to be replaced continually in the lung base, thus preventing it from becoming inactive and clogged with impurities.……"

'দম' নেবার সময় একটা কথা সব সময় মনে রাখা উচিত যে, কখনও যেন, জোর করে নিশ্বাস বন্ধ করলে যেমন গলার শির ফুলে ওঠে, মুখে রক্ত এসে লাল টকটকে বর্ণ ধারণ করে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, এ রকম না হয়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই কাজ করতে হবে; এবং সংলাপের ফাঁকে দম ফুরিয়ে গেলে লুকিয়ে লুকিয়ে চোরা দমও নিয়ে নিতে হবে। লুকিয়ে লুকিয়ে, কেননা চোরা দম নেবার সময় দর্শকরা যদি তা বুঝতে পারেন, তাহলে অভিনয়কালে যে illusion বা বিভ্রমের সৃষ্টি করা হয় তা ব্যাহত হতে পারে।

প্রচুর স্বাস্থ্য, রুচিবান মানস, আর একান্ত নিষ্ঠা না থাকলে অভিনয় শিক্ষা করতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনীর পর সপ্তাহে দুদিন তিনদিন ক্লাবরুমে বসে নাটকের পার্ট মুখস্থ আওড়ালেই অভিনয় হয় না; আর একদিন কি দুদিন (সাধারণ অপেশাদার সংস্থা মঞ্চভাড়া করে stage rehearsal বা তার কিছু আগে composition শিক্ষা করে থাকে) composition শিক্ষার দ্বারা নাট্য-প্রযোজনা হয় না। সে যা হয়, পরিশুদ্ধ অর্থে তাকে recreation বলা যেতে পারে, কিন্তু শিল্পসৃষ্টি নৈব নৈব চ।

বিজনবাবু প্রায়ই বলেন, নিজের মঞ্চ নেই, একদিন দুদিন ভাড়া করা মঞ্চে কি production হয়, না কি ঘর ভাড়া করে সপ্তাহে তিনদিন কি চারদিন একঘণ্টা দুঘণ্টা করে বসে অভিনয় শিক্ষা দেওয়া যায়। দম তৈরী, স্বরবিন্যাস, অভিব্যক্তির সাধারণীকরণ অত সহজ শিক্ষা নয়। তাঁর স্বপ্ন হলো দূর গ্রামে, সহরের সমস্ত কোলাহলের বাইরে, অনেকখানি জায়গা নিয়ে প্রতিষ্ঠা হবে এক বিরাট বাড়ী, যেখানে সমস্ত অভিনেতারা থাকবে দল বেঁধে এক হাঁড়িতে সকালে বিকেলে দুবার শুধু খিচুড়ী রান্না হবে, তাই খাবে তারা ভাগাভাগি করে, আর বাকী সময় সেই উষাকাল থেকে শুরু হবে বিভিন্ন

ব্যায়াম, যোগাসন, কণ্ঠসাধনা, স্বরশিক্ষা,—সারাদিন, দিনের পর দিন। তার পর যখন এক এক গাছা তেল খাওয়ান পাকা লাঠির মত এই সব অভিনেতারা আসবে মঞ্চে, তখন হৈ-হৈ পড়ে যাবে চারিদিকে। সত্যিকারের শিল্পীর জন্ম হবে এই ভাবেই।

পাঁচ

স্বরসাধনা

সাধারণ ভাবে আমরা কথা বলি আসাধা গলায়। এতে শব্দের সব সুর-লহরী এবং মাধুর্য ধরা পড়ে না, অবশ্য না পড়লেও যে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় তা-নয়। কিন্তু আসাধা গলা দিয়ে অভিনেতার কাজ চলে না। সু-গায়ক হতে গেলে যেমন তানপুরা অথবা হারমনিয়ম-সহযোগে নিয়মিত গলা সাধার প্রয়োজন,ঠিক সেই রকম একজন অভিনেতারও হারমনিয়মের সঙ্গে কিছু কিঞ্চিৎ পরিচয় রাখা উচিত। সা থেকে নি পর্যন্ত এই সাতটি পর্দার সঙ্গে গলা মেলান অভিনেতার প্রাথমিক কর্তব্য। তারপর বিভিন্ন পর্দার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সংলাপ আবৃত্তি করা—কোন রকম modulation না করেই।

ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা প্রথমে 'সা' এই পর্দায় গলা মিলিয়ে আবৃত্তি আয়ত্ত করা গেল, তারপর ক্রমে ক্রমে রে-গা-মা পা-ধা-নি ইত্যাদি বিভিন্ন পর্দায় সেই আবৃত্তি কণ্ঠ একটু চড়িয়ে চড়িয়ে আয়ত্ত করা গেল। এর ফলে প্রাথমিক ভাবে গলাটা পর্দায় বসে যাবে, অন্তত এইভাবে স্বর সপ্তক সম্পর্কে সাধারণ একটু কাণ্ডজ্ঞান সৃষ্টি হলে, বেসুরো চীৎকারের হাত থেকে অভিনেতা রেহাই পাবেন। সাধারণত সহ-অভিনেতা যে পর্দায় সংলাপ বলেন, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্থাৎ scale ঠিক রেখে পাল্টা সংলাপ বলাটা অনেক সময় হয়ে ওঠে না। এর ফলে অনেক সময়ই সমস্ত অভিনয় ব্যাপারটা একটা তালগোল পাকিয়ে সুর-বেসুরের দ্বন্দ্ব সমাসে পরিণত হয়।

বিজন ভট্টাচার্য এই ভাবে গলা সাধার খুব পক্ষপাতী। তাঁর ক্যালকাটা থিয়েটারের সভ্যদের তিনি প্রায়ই বলেন, প্রত্যেক দিন সকালে হারমনিয়মের

রীডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আনন্দবাজারের editorial-টা অন্ততঃ একবার করে পড়া উচিত। গলা সাধার ওপর আধুনিক সুপ্রসিদ্ধ প্রযোজক-অভিনেতা শম্ভু মিত্রও খুব জোর দিয়েছেন দেখতে পাই। শ্রীমিত্র বলেছেন যে, গলা সাধতে গেলে অভিনেতার পক্ষে নিজের গলার স্কেলটি প্রথমে জেনে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

> "নিজের স্কেল বের করবার একটা সহজ পদ্ধতি আছে। কখনও গলা মোটা করে কিছু বলার চেষ্টা না করা। সাধারণতঃ যাঁরাই অভিনয় করতে চান তাঁরাই গলা মোটা করে সংলাপ বলার চেষ্টা করেন, ভাবেন ঐতে বোধ হয় বেশী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হবে।...... ব্যক্তিত্ব ফোটে কণ্ঠের বিস্তৃতিতে, কণ্ঠের বৈচিত্র্যে।"

কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নাকের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কেননা সহজ ভাবে কথা বলার সময় নাকের ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। যখন করুণ বা কোমল করে কোন কথা আমরা বলি তখন নাকের ব্যবহার খুব স্পষ্ট হয়ে পড়ে। শ্রীমিত্র তাই অভিনেতাদের এই নাকের ব্যবহার সম্পর্কেও খুব সচেতন থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। গলা দিয়ে যেমন আমরা সা-রে-গা-মা ইত্যাদি সাধতে পারি, নাক দিয়েও তেমন সাধা যায় মুখ বন্ধ করে। এতে করে প্রথমটা হয়ত অসুবিধা হবে, তবে সড়গড় হয়ে এলে নাকের শব্দ নির্গমন পথটি ক্রমশই সাবলীল হতে থাকবে এবং অভিনেতাও কণ্ঠের মত নাককেও অবলীলাক্রমে ব্যবহার করতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে বর্তমানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা আর করতে চাই না। কৌতূহলী পাঠক কণ্ঠসাধনা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানতে চাইলে "বহুরূপী" পত্রিকায় প্রকাশিত ডাক্তার নরেন ব্যানার্জীর 'স্বর ও স্বরবিশৃঙ্খলা' রচনাটি অথবা শ্রীশম্ভু মিত্র রচিত "অভিনয় নাটক মঞ্চ" গ্রন্থখানি পাঠ করে দেখলে উপকৃত হবেন। অধিকন্তু পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য থাকলে এ বিষয়ে অনেক ইংরেজী বই আছে সেগুলি পড়লে যে বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা পাঠকের সুবিধার্থে কয়েকটি বইয়ের নাম নিচে উল্লেখ করলাম।

(১) The truth about voice—Prof E. Fenchtinger.

(২) Acting of the Drama—B. Matthews.

(৩) Problem of the Actor—Louis Calvert.

(৪) Plays, Acting and Music—Arthur Symons. ইত্যাদি

আর একটি কথা আমাদের সদাসর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, তা হলো এই যে, বই পড়ে কোন সাধনাই সম্পূর্ণ হয় না। তারজন্য প্রয়োজন গুরুর নির্দেশ। যাঁরা অভিনয় শিক্ষা করতে ইচ্ছুক, তাঁদের আধুনিক কালের যাঁরা প্রথিতযশা নট এবং প্রযোজক যেমন বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, এঁদের সঙ্গে সর্ব প্রথম যোগাযোগ করা উচিত। এঁদের উপদেশ, এবং নির্দেশগুলি যত্নসহকারে আয়ত্ত করলে অভিনয়-শিক্ষিচ্ছু ব্যক্তিদের যথেষ্ট উপকার হবে আশা করি। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার তা হলো এই যে, বাইরে থেকে এঁদের অভিনয় দেখে, এবং অনুকরণ করে অভিনয় শিক্ষা কখনই সম্ভব নয়, তা আপন ব্যক্তিত্বকে সঙ্কুচিত করে, এবং ক্রমশ একটা প্যাটার্ণ বা ছাঁচে ফেলে দেয়, যার ফলে স্বাধীন সৃষ্টি আর সম্ভব হয় না। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এঁরা সাহায্য করবেন কেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এ প্রশ্ন অবান্তর। যাঁরা সারাজীবন নিষ্ঠা এবং সাধনার সঙ্গে নটরাজের সেবা করে আসছেন, এবং আজীবন সেই সেবা করতে বদ্ধপরিকর, তাঁরা উৎসাহী ছাত্র পেলে আনন্দিতই হবেন। তবে গুরু কখন শিষ্য খুঁজে ফেরে না, শিষ্যকেই অনেক খুঁজে খুঁজে গুরুর সন্ধান করতে হয়, এবং যদি সেই শিষ্যের আকাঙ্ক্ষা এবং আকুলতা গুরুর হৃদয় আকৃষ্ট করে তাহলে তাঁরা যে তাকে শুধু প্রাণ দিয়ে আশীর্বাদই করেন তাই নয়, দুহাত বাড়িয়ে বুকেও টেনে নেন।

ছয়

পুনশ্চ

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করে আমরা বর্তমান অধ্যায়ের ছেদ টানবো, তা হলো স্বাস্থ্যচর্চা। স্বাস্থ্যচর্চা যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই বিশেষ উপকারী, অভিনেতাদের পক্ষে তো বটেই। কেননা সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের সঙ্গে দেহের ও মনের প্রফুল্লতা ও সজীবতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

রুগ্ণ দেহ মন কোন রকম কাজের উপযোগী নয়, সৃষ্টিশীলতার কথা তো আরো দূরে। আমরা অবশ্য বলছি না যে, অভিনেতাদের স্যাণ্ডো কিম্বা বিষ্ণু ঘোষ হতে হবে ; তবে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কিছু কিছু সহজ পদ্ধতির ব্যায়াম অভ্যাস করা উচিত। বার-এর প্যাঁচ, রিং-এর কিম্বা ওয়েটলিফ্‌টিং-এর কায়দাকানুন একজন অভিনেতা নাই বা শিখলেন, তাঁকে তো আর মঞ্চে দাঁত দিয়ে লোহার পাত বেঁকাতে কিম্বা বুকের ওপর হাতী তুলতে হবে না,তবে সাধারণ ভাবে 'বৈঠক', কিছু সংখ্যক "ডন", গভীর ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের কায়দাকানুন, তাঁর অভ্যাস করা উচিত। এতে শরীরে মেদের বাহুল্য কমে, দেহ সতেজ হয়, অভিনেতা চটপটে হতে পারেন, যেটা তাঁর বিশেষ দরকার। অভিনয় দেখতে গিয়ে আমরা অনেক সময় বলে থাকি অমুকে কেমন ফ্রী অভিনয় করছেন, অমুকে তা পারছেন না—ইত্যাদি। অভিনেতার এই ফ্রী হওয়া না হওয়া তাঁর দৈহিক এবং মানসিক জড়তার ওপর নির্ভরশীল। ব্যায়ামের অভ্যাসের মধ্য দিয়ে এই দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য (fitness) আসা সম্ভব। Free-hand exercise এবং কয়েকটি যোগাসন বিশেষ করে যাতে পেট, বুক এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন হয় একজন অভিনয় শিক্ষিচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে তা নিয়মিত ভাবে অভ্যাস করলে ভাল হতে পারে।

দ্বিতীয় হলো কণ্ঠ-স্বাস্থ্যের কথা। কণ্ঠ ছাড়া অভিনয় হয় না। সুতরাং এই কণ্ঠ যাতে সতেজ এবং সাবলীল থাকে সে বিষয়েও একজন অভিনেতার বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা এমন অনেক অমিতাচার করি যা দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক। এমন অনেক জিনিস আহার অথবা পান করি যেগুলো সাময়িক আনন্দদান করলেও পরিণামে মারাত্মক। কোন একদিন আমার সঙ্গে অভিনয় সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে বিগত যুগের একজন স্বনামখ্যাতা অভিনেত্রী বলেছিলেন, অভিনয় করার ব্যাপারটা মোটেই শক্ত নয়, তবে কি জান বাবা, "মুড়ী আর ভুঁড়ি' যদি ঠিক না থাকে তাহলে অভিনেতা হওয়া যায় না।" মুড়ি আর ভুঁড়ি সত্যিই ঠাণ্ডা রাখা প্রয়োজন। আজকালকার যুগে পেটের গণ্ডগোলে ভোগেন না এমন ব্যক্তি বোধ হয় খুব বিরল। বিশেষ করে যথেচ্ছ খাওয়া এবং ভেজাল খাদ্য গলধঃকরণের

জন্যেই যে অজীর্ণ, অম্বল, কোষ্ঠ কাঠিন্য ইত্যাদি নানা রোগের প্রসার তা বলা বাহুল্য। খাবার ব্যাপারে তাই অভিনেতার একটু সতর্ক হওয়ার দরকার। তারপর মুড়ী অর্থাৎ মাথার ব্যাপারটা তো আছেই।

সুকঠোর ব্রহ্মচর্যের সাধনা না থাকলে কোন শিক্ষাই সার্থক হয় না। প্রাচীন ভারতে শাস্ত্রশিক্ষার আগে গুরুরা তাই শিষ্যদের সুকঠোর ব্রহ্মচর্যের সাধনায় দীক্ষা দিতেন। এই সংযম শিক্ষা অর্থাৎ কিনা বাক্‌সংযম, ইন্দ্রিয়সংযম চিন্তাসংযম ইত্যাদি শিক্ষা যে, দৈনন্দিন জীবনে সার্থকতা লাভ করতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সে কথা জোর দিয়ে বলবার অপেক্ষা নিশ্চয় রাখে না। সে যাই হোক, এগুলো ছাড়াও প্রাথমিক ভাবে কণ্ঠ-স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একজন অভিনেতার যে কটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত সেগুলো আমরা এইভাবে বলতে পারি।

(ক) অযথা জোরে চীৎকার, যাতে গলায় আঘাত লাগতে পারে, তা সদাসর্বদা বর্জ্জনীয়!

(খ গলায় খুববেশী ঠাণ্ডা বা গরম লাগান কখনই উচিত নয়।

(গ) নিয়মিত লিস্টারিন বা ডেটল অথবা নুন জলের কুলকুচো করা উচিত।

(ঘ) স্নানের সময় নাক দিয়ে জল টেনে আবার বার করে ফেলার অভ্যাস থাকা ভালো।

(ঙ) এমন কিছু খাওয়া কখনই উচিত নয় যা গলার ক্ষতি করে। বরফ বা রেফ্রিজেটারের জল পরিহার করাই ভাল।

(চ) বিড়ি-সিগারেট গলার পক্ষে ক্ষতিকারক। অন্তত যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁদের খুব বেশী পরিমাণ ধূমপান না করাই উচিত, আর করলেও খুব সংখ্যায় কম এবং দামী সিগারেট খাওয়াই ভালো।

(ছ) যাঁদের সর্দিকাশির বা ব্রঙ্কিয়াল ধাত আছে, বা ক্রনিক ফ্যারিঞ্জাইটিস আছে, তাঁদের পক্ষে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ না নিয়ে কখনই স্বর-সাধনা করা উচিত নয়। কেননা তা তাঁদের কণ্ঠ-স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

আসল কথা হল সৎগুরু, সৎসঙ্গ, সৎপরামর্শ, সৎচিন্তা, এ না হলে সাধারণ জীবনের ক্ষেত্রে অথবা অভিনয়ের ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি কখনই সম্ভব নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

এক

অভিব্যক্তি

অভিনয়কলা আয়ত্তীকরণের শিক্ষায় সবচেয়ে দুরূহ এবং জটিল অংশ হলো অভিব্যক্তি প্রকাশের শিক্ষা। এই অভিব্যক্তির প্রকাশ একজন অভিনেতার বোধ এবং মননের ওপর পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল। কোন নীতি নিয়ম বা কোন অভিনয়ের ইতিহাস পাঠ অথবা পূর্ববর্তী অভিনেতার অভিনয় রীতির অনুকরণে এই শিক্ষা সম্ভব নয়, এমন কি অভিনেতার মানস পটে রসোপলব্ধি চেতন বা অবচেতনার কোন স্তরে উঠলে, একজন অভিনেতা চরিত্ররূপায়ণে তার আন্তর সত্তার রসময় ব্যঞ্জনাটি সার্থক ভাবে অভিব্যক্ত করতে পারেন তার সীমারেখা নির্দ্ধারণ করা যায় না। ছন্দবদ্ধ পদ সাজিয়ে গেলেই যেমন কবিতা হয়না, ঠিক তেমনি নাটকীয় চরিত্রের সংলাপ সুষ্ঠুভাবে আবৃত্তি করতে পারলেই অভিনয় হয় না। পদ্য যে কখন কোন মুহূর্তে কাব্য হয়ে ওঠে তা যেমন কবির অগোচর, তেমনি একটি অভিনয় কখন যে সত্যিকারের অভিনয় হয়ে ওঠে তা অভিনেতার বোধবুদ্ধির অগোচর। যখন হয়, তখন তা আপনা থেকেই হয়, কেমন করে, বা কি ভাবে তা হলো, এর উত্তর খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

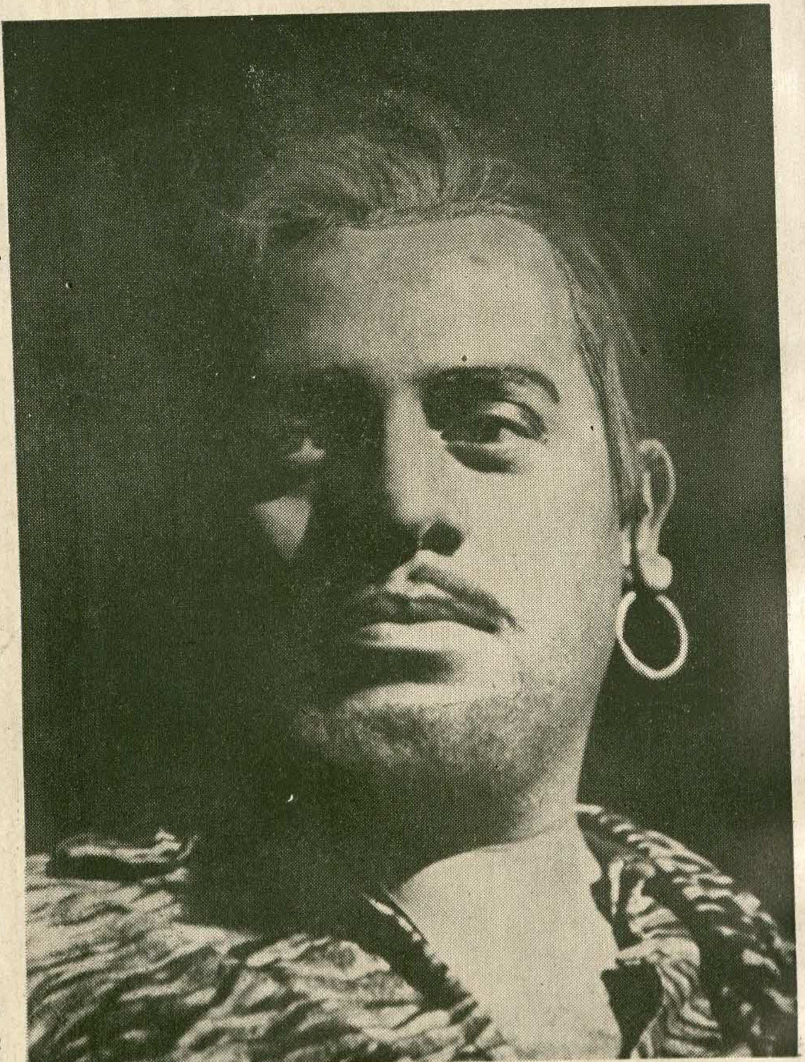
জীবন থেকে মানুষ প্রতিনিয়ত যা কিছু সংগ্রহ করছে তার সবকিছুই জমা হচ্ছে তার মনের সংগ্রহশালায়; কিন্তু সেইখানেই থেমে থাকছে না। অর্থ যদি কেবলমাত্র স্তূপাকারে সঞ্চিত করা থাকে, তবে তা কোনকালেই ঐশ্বর্যে পরিণত হয় না, তার জন্য প্রয়োজন সঞ্চিত অর্থের সঠিক মূল্যমান নির্দ্ধারণ করে প্রয়োজনের চাহিদা অনুসারে তাকে নিয়োজিত করা। ঠিক তেমনি দৈনন্দিন পথচলার ছন্দ-স্পন্দন থেকে মানুষ যা কিছু অভিজ্ঞতা তার মনের সংগ্রহ-শালায় জমা করছে, তার সঠিক মূল্যায়ন করার চেষ্টাও করছে সঙ্গে সঙ্গে।



'দশচক্র' নাটকে
ডাঃ গুহর রূপসজ্জায়
শম্ভু মিত্র



'দশচক্র নাটকে
অমর গঙ্গোপাধ্যায়



ওথেলো'র রূপসজ্জায় উৎপল দত্ত

প্রথমে সেই সংগ্রহ থাকে তার চেতনার স্তরে ; সেখানে যাচাই চলে ; তারপর যখন তার উপলব্ধি এবং আবেগের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে সেই সংগৃহীত জ্ঞান জারিয়ে যায়, তখনই চেতনার স্তর থেকে প্রজ্ঞার স্তরে তা উন্নীত হয়, প্রকাশের ব্যাপারটা তারও পরে। এই প্রকাশ তত্ত্ব নিয়ে দার্শনিক মহলে বাদ-বিতণ্ডার অন্ত নেই। উপলব্ধ জীবন-সত্যকে চেতন অথবা অবচেতন জ্ঞানের কোন স্তরে পাঠালে তার শৈল্পিক উত্তরণ ঘটে, এ নিয়ে অধ্যাত্মবাদী, ভাববাদী, বস্তুবাদী ইত্যাদি বিভিন্ন মতবাদী দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে, বর্তমান প্রসঙ্গে সেগুলির আলোচনা করতে যাওয়া অসম্ভব কেননা তাহলে আর এক মহাভারত রচনা হবে, যদিও তা মহাভারতের মত কাব্য-সৌন্দর্যপূর্ণ হবে না, কেননা আমাদের সে শক্তি নেই।

মোটামুটি ভাবে শিল্পসৃষ্টির মূলতত্ত্বটিকে আমরা এই বলে ব্যাখ্যা করতে পারি যে, বিশেষ বা particular-কে আশ্রয় করে তাকে সামান্য বা universal করে তোলাই হলো শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য ; আর জ্ঞান চৈতন্যের বিশেষ স্তর থেকে সামান্যের স্তরে উন্নীত হবার প্রক্রিয়ায় কতকগুলি মানসিক পর্যায় আছে, দার্শনিকরা সেই পর্যায়গুলি intution, intellect, feeling, emotion, wit-ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগে ব্যাখা করতে চেয়েছেন। একজন অভিনেতা সবপ্রথম বাস্তব জীবনের পথ চলতে বহু বিচিত্র মানুষকে প্রত্যক্ষ করেন, তারপর তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী ও জীবনগঠনের পরিবেশটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেন, এইভাবে যখন বিচিত্র লোকচরিত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ভাবে তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, তখন সেই জীবনযাত্রার প্রণালী এবং পরিবেশের চক্রাবর্ত্তে পড়ে, মানুষের হৃদয়ের অন্তস্থিত ভাব এবং ভাবনাগুলি, তার দৈনন্দিন আচার আচরণের মধ্য দিয়ে কি ভাবে অভিব্যঞ্জিত হচ্ছে, তাই অনুধাবন এবং অনুকরণ করার চেষ্টা করেন ; বলাবাহুল্য অভিনেতা এই অনুকরণ করেন, তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ; কিন্তু এই বিশেষ বস্তুর অনুকরণই তাকে সামান্য বস্তুতে উন্নীত করে না ; তার জন্য আমাদের লোকচরিত্র পরিত্যাগ করে, সেই লোকচরিত্রের অনুকর্তা অভিনেতার মনের দিকে তাকাতে হবে। তাঁর বোধ-বুদ্ধি, তাঁর আবেগ, সহৃদয়তা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যখন সেই অনুকৃত

রূপটি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কেবলমাত্র তখনই তাঁর মনের বিশেষ জ্ঞান সামান্য জ্ঞানে পরিণত হয়ে প্রকাশ উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। বলা বাহুল্য একজন অভিনেতার বোধ-বুদ্ধি, আবেগ এবং সহৃদয়তা যত খর দীপ্ত, তাঁর চরিত্র-অভিব্যক্তি তত বেশী দীপ্তি-গুণসমন্বিত হয়ে ওঠে।

• তবুও এই ব্যাখ্যাই সব নয়। এর পরেও আর একটা কথা থেকেই যায়, সেটা হলো ওই হয়ে ওঠার কথা। প্রেমের ব্যাখ্যায় প্রণয়-পাত্রীর স্বরূপ আলোচনায় বৈষ্ণব কবি নায়িকার নানা রূপের বিশ্লেষণ করেছেন ; কত খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতাভর্তৃকার কথাই না সেখানে আছে ; মহাজন-পদাবলীর প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রিয়া মিলনের কতই না মর্মভেদী আকুতি, তবু সবশেষেও সার্থকতা পাননি কবি : তাই সর্বভোগ-বাসনার তথাকথিত পরিতৃপ্তির পরও বৈষ্ণব কবি আক্ষেপ করে বলেছেন, "লাখে না মিলল এক"। অভিনয় ব্যাপারে সার্থক অভিব্যক্তির আলোচনায় ঐ একটি কথাই আমরা বলতে পারি, লাখে না মিলল এক।

চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে ঠিক কোন সময়টিতে যে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তাঁর ব্যক্তি-সত্তা আর চাণক্যের ব্যক্তি-সত্তাকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেন, তা তিনিও সঠিকভাবে বলতে পারবেন না। অথচ মনের চেতন এবং অবচেতন দুটো স্তরই সতত সজাগ প্রহরায় অভিনয় কালে একজন অভিনেতাকে নিয়ন্ত্রিত করে ; সীতার পাতাল প্রবেশের পর প্রিয়া বিরহে কাতর শ্রীরামচন্দ্রের "সীতা সীতা" বলে মর্মভেদী আর্তনাদের মুহূর্তটিতেই অভিনেতাকে মনে রাখতে হবে যে, আমি শ্রীরামচন্দ্র নই, শিশির কুমার ভাদুড়ী, এটা অযোধ্যার রাজপুরী নয়, শ্রীরঙ্গম নাটমঞ্চ, আমার সামনে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অগনিত দর্শক, স্টেজের উইংসের পাশে আছে বড় বড় স্পট লাইট, যার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আমাকে এসে দাঁড়াতে হবে, মুখে আলো নিতে হবে, নৈলে আমাকে লোকে দেখতে পাবে না, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে হবে, আমি শিশির কুমার ভাদুড়ী নই স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র, আমার পাশে যে ছিল সে প্রভা নয়, সীতা, আমি প্রিয়া বিরহে কাতর ; তার অন্বেষাতেই আমার এই আর্তনাদ, এই দুই বিপরীত কোটির ভাবনার মিলন

মুহূর্ত, নাট্যকার অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য যাকে twilight zone বা গোধূলী লগ্ন বলেছেন, সেই মুহূর্তে অভিনেতার সত্তা ক্ষণবিচ্ছুরিত বিদ্যুৎ চমকের মতই এক অপূর্ব রসাস্বাদনে সমর্থ হয়, অভিব্যক্তি তখনই ব্যঞ্জনাময় হয়ে দর্শক সাধারণকে মাতিয়ে দেয়। তারা উচ্ছসিত হয়ে বলে এমনটি আর দেখিনি—দেখবোও না হয়ত ভবিষ্যতে। এই twilight zone-এর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়; ওটা আপনা থেকেই হয়ে উঠে। আর এই হয়ে ওঠা ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান করতে গিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে চিন্তার অন্ত নেই। সেই বিতর্কের বিশদ আলোচনায় প্রবেশ না করে, মোটামুটি ভাবে আমরা এটুকু জেনে রাখতে পারি যে, শিল্পী মানসের এই তন্ময়ীভবনের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকরা আত্মার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা উল্লেখ করেছেন; তাঁরা মনে করেন যে, শিল্পী ঠিক যে মুহূর্তটিতে আপন সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে, আপন শিল্প রচনার সঙ্গে তদ্গত চিত্তে ওতপ্রোত হয়ে যান, সেই মুহূর্তটিকে কোন বৌদ্ধিক জ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বৌদ্ধিক জ্ঞান, চেতনার স্তরকে কতকাংশে উন্নত করতে সক্ষম হলেও, নির্বিকল্প জ্ঞানের স্বরূপে চেতনাকে অধিষ্ঠিত করতে পারে না। আর শিল্পীমানস যখন কল্পনার তূরীয় লোকে উত্তরিত হয়, অর্থাৎ যখন শিল্পী নির্বিকল্প জ্ঞানের অধিকারী হন, কেবলমাত্র তখনই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা পরম সত্যকে তিনি লাভ করতে পারেন, চৈতন্য স্বরূপে আত্মা তখন বোধ ও বোধির আশ্রয় ছাড়াই, চিদঘন সত্যস্বরূপের সাক্ষাৎ প্রকাশ অনুভব করে।

আবার বুদ্ধিবাদী যাঁরা, তাঁরা পরমাত্মা, বা ঈশ্বর স্বরূপকে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে বোধের ক্রমবিকাশেই জ্ঞানরাজ্যের সীমানা ক্রমসম্প্রসারিত। আবেগকে যাঁরা শিল্পসৃষ্টির পরমতত্ত্ব বলে মনে করেন, বুদ্ধিবাদীরা তাঁদের তাই স্বীকার করতে পারেন নি। বস্তুবাদী দার্শনিকের চিন্তা আবার ভিন্নতর। মোট কথা, শিল্পতত্ত্বের মূল রহস্যের নিরাকরণে যুগে যুগে বহু বিভিন্ন মতবাদের গৌরীশৃঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোন সুনির্দিষ্ট পথ ও পন্থার সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি। শিল্পী কেমন করে সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ একজন শিল্পীর রচনা যখন সৃষ্টি হয়ে ওঠে, তখন তার মূলে আত্মার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বর্তমান

থাকে, না প্রজ্ঞাচৈতন্যের খরদীপ্ত প্রভাব বর্তমান থাকে, এককথায় শিল্পী তখন রিয়ালিস্ট হন, না মিস্টিক হন, না স্পিরিচুয়ালিস্ট হন, তার সঠিক রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস। কেন না ব্যক্তি মানসের আন্তরপ্রবণতার গতিবিধির পথরেখা চিরকালই দুর্জ্ঞেয়; তার সঠিক লেখচিত্র পাওয়া হয়ত কেন, কোনদিনই সম্ভব নয়। প্রতিনিয়তই নানান ভাব ও ভাবনার আঘাতে-সংঘাতে তার গতিরেখা পরিবর্তিত হতে হতে চলেছে, রূপের বদল হচ্ছে, রঙের বদল হচ্ছে; জীবনের মানে হচ্ছে একমুহূর্ত থেকে আর একমুহূর্তে পরিবর্তিত। এ দুরতিক্রম্য গৌরীশৃঙ্গের সৌন্দর্য দূর থেকেই উপভোগ করা যায়, তাকে জয় করা বোধহয় যায় না। দার্শনিকদের জীবন জিজ্ঞাসায় এই রহস্য লোকের নিবিড় অন্ধকারে একটু একটু আলোকের সঞ্চার হতে পারে বটে, কিন্তু তাতে অজানার রহস্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয় না।

দুই

অভিব্যক্তি ও অনুকরণ

প্রচলিত অর্থে অভিব্যক্তি বলতে আমরা expression বুঝে থাকি। এই expression শব্দের আমরা অর্থ করি কোন চরিত্রের বহিরঙ্গ ভাব প্রকাশরীতির অনুকরণ। মনে করা যাক কোন প্রখ্যাত অভিনেতার অভিনয়ের কথা।—গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে একদিন 'মৃণালিনী' নাটক অভিনীত হচ্ছিল, নটগুরু গিরিশচন্দ্র করছিলেন পশুপতির ভূমিকা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাসের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, উক্ত চরিত্রটি প্রেম, স্বার্থ, কামনা, লোভ ইত্যাদি বিমিশ্র বাসনার সমন্বয়ে এক অদ্ভুত জটিল সৃষ্টি। গিরিশচন্দ্র যখন পশুপতির ভূমিকায় অভিনয় করতেন, তখন দর্শক সাধারণ অভিভূত হয়ে উপভোগ করতেন চরিত্রটি। একদিন এই রকম অভিনয় চলছে, পশুপতির উন্মাদ দশার অভিনয় দর্শনে সমবেত দর্শকমণ্ডলী অভিভূত, অকস্মাৎ প্রেক্ষাগৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে এক মহিলা আর্তনাদ করে উঠলেন। শোনা যায় মহিলাটি

গিরিশচন্দ্রের সম্পর্কে ভগিনী, তাঁর উন্মাদদশার অভিনয় দেখে মহিলাটির ধারণা হয়েছিল যে, হয়ত তাঁর মেজদা সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছেন, তাই ঐ ভয়-চকিত আর্তনাদ।

আমরা গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখিনি, ঘটনাটি আমরা শুনেছি, সুতরাং এর সত্য মিথ্যা সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া বৃথা; তবে উল্লিখিত ঘটনাটি সত্যই হোক অথবা মিথ্যাই হোক, অনেক বড় বড় অভিনেতার অভিনয়ে দর্শকশ্রেণী যে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে, অভিনীত চরিত্রটিকে ধ্রুবসত্য মনে করে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেন, এরকম ঘটনা অভিনয়ের ইতিহাসে দুর্লভ নয়। কিন্তু সে যাই হোক, গিরিশচন্দ্রের পশুপতি ভূমিকায় অভিনয় কালে উল্লিখিত ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা উক্ত ঘটনাটি ঘটার কার্যকারণটি কিছুটা বুঝতে পারবো।

প্রথম কথা হচ্ছে উন্মাদদশার অভিব্যক্তিতে গিরিশচন্দ্র তাঁর সর্বশরীর দিয়ে যে উন্মাদ লক্ষণের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, তার মধ্যে কোন ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না, যদি থাকতো তাহলে মহিলাটি কখনই পশুপতির উন্মত্ততার মধ্যে গিরিশ-চন্দ্রকে মিলিয়ে ফেলতে পারতেন না। অনুকার্য চরিত্র এবং অনুকর্তা নট অন্তত সেইদিন মিলেমিশে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, তাই এই চিত্তবিভ্রম। দ্বিতীয়ত, এই মিলন সম্ভব হলো কিসে, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের মানতেই হবে যে, একটি মানুষ উন্মাদ হয়ে গেলে তার মধ্যে 'উন্মাদনার লক্ষণগুলি যে ভাবে প্রকাশ পায়, সেই লক্ষণগুলি গিরিশচন্দ্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন, এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তাকে আয়ত্ব করে, নিজ দেহের আঙ্গিকে সেই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিলেন। এখানে আয়ত্ব করা অর্থে অনুকরণ করাই বুঝতে হবে। এই অনুকরণে, যে অভিনেতা যতখানি সার্থক, সেই অভিনেতার শিল্প সৃষ্টিও সমপরিমাণে সার্থকতা লাভ করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, অনুকরণ না করলে অভিব্যক্তি প্রকাশের প্রাথমিক ক্ষমতাটি আয়ত্ব করা যায় না।

অলঙ্কার শাস্ত্রে রসকে শান্ত, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ইত্যাদি মোট নটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে দেখতে পাই। দৈনন্দিন জীবনের নিত্য নূতন দ্বন্দ্ব

সংঘাতের ফলে মানুষের মনে রাগ দ্বেষ, হর্ষ, অসূয়া ইত্যাদি যে কটি ভাবের উদয় হচ্ছে, উক্ত রসের আশ্রয়েই তার প্রকাশ ঘটে। অভিব্যক্তির আয়ত্তী-করণের প্রাথমিক পর্যায়ে একজন অভিনেতার এই নবরসের প্রকাশ ভঙ্গীর অনুকরণ করা সর্বপ্রধান কর্তব্য। গিরিশচন্দ্র ছিলেন এই নবরসের সাধনায় সিদ্ধকাম পুরুষ। শুধু তিনি নিজে যে সাধনা করেছিলেন তা নয়, তাঁর ছাত্রদেরও সর্ব-প্রথম এই শিক্ষায় শিক্ষিত হতে সদাসর্বদাই উৎসাহ দান করতেন। কেমন করে ইন্দ্রিয় অভিব্যক্তির সাহায্যে নবরসের প্রকাশ আয়ত্ব করা যায়, সে সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের বহু ছবি আছে, বোধ করি ছাত্রদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন ভাবাভিব্যক্তির সেই ছবিগুলো তিনি তুলিয়েছিলেন; আমরা চিত্রসূচীতে গিরিশচন্দ্র কৃত এই ধরণের কয়েকটি অভিব্যক্তির যে ছবি উদাহরণ স্বরূপ সংযোজিত করেছি, সেগুলি একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবো যে, একজন অভিনেতা কি ভাবে রূপসজ্জার সাহায্য না নিয়েও চরিত্রের আন্তর-সত্তাটির ছাপ নিজের মুখভঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

বিশদভাবে ছবিগুলি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে মনের বিভিন্ন অবস্থার যে ভাবগুলি গিরিশচন্দ্রের মুখে প্রতিফলিত, দেখতে পাই, সেগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে অনুকরণের মধ্য দিয়েই যে সম্ভব হয়েছে, একথা সত্য। সাহিত্যে যখন মানব চরিত্রের এই আন্তর-প্রবণতা গুলি কবি অঙ্কিত করেন, তখনতিনি সেই দুরূহ কাজ সম্পাদন করেন শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি উপাদান দিয়ে, আর মঞ্চে যখন অভিনেতা সেই সব চরিত্রে রূপারোপ করেন, তখন তিনি আপন দেহপটের সাহায্যেই সেই নবরসের প্রকাশ সম্ভব করেন, চিত্রকরের ক্যানভাসের সঙ্গে এই দেহপটের স্বচ্ছন্দে তুলনা করা যায়। অভিনেতাও চিত্রকর এবং আপন দেহের ক্যানভাসেই তিনি মানবচরিত্রের বিভিন্ন অভিব্যক্তির চিত্র অনুকরণ করেন।

সুষ্ঠু অভিব্যক্তি অভিনেয় চরিত্রকে যে, কেমনভাবে উজ্জীবিত ক'রে দর্শক মণ্ডলীকে নিবিড় রসাস্বাদ করাতে পারে, তার উদাহরণ যে কোন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অভিনয় কলার কথা স্মরণ করলেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নটশেখর অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফীও গিরিশচন্দ্রের মত, অভিব্যক্তি প্রকাশের

ব্যাপারে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। "নীলদর্পনম্" নাটকে তাঁর অভিনীত অত্যাচারী সাহেবের ভূমিকা দেখে শোনা যায় স্বয়ং বিদ্যাসাগর মঞ্চে চটি ছুঁড়ে মেরেছিলেন ; অর্থাৎ উক্ত সাহেবের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুর অভিব্যক্তি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত স্থির চিত্ত প্রাজ্ঞ মানুষটিকেও স্থান, কাল, পাত্র ভুলিয়ে অভিভূত করতে সক্ষম হয়েছিল।

ইদানীং কালে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর অনেক অভিনয় আমরা দেখেছি এবং বলতে দ্বিধা নেই যে, অনেক সময় তাঁর অভিব্যক্তি দেখে আমরা ভয়ে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি ; ভুলে গেছি তিনি অভিনয় করছেন, ভুলে গেছি যে, তিনি তখন নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী নন, একটি চরিত্রমাত্র। ব্যাপারটা স্পষ্ট করেই বলা যাক।

ঘটনাটা ঘটেছিল 'ষোড়শী' অভিনয়ের সময়। সকলেই জানেন ষোড়শী নাটকের জীবানন্দ ভূমিকায় নাট্যাচার্য ছিলেন অদ্বিতীয় রূপকার। শান্তিকুঠিতে জীবানন্দ এসেছেন, নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রি, একটা চাদর ঢাকা তক্তাপোষের ওপর জীবানন্দ বেশী নাট্যাচার্য বসে আছেন, সামনে অনেক মদের বোতল, গ্লাস, মদ্যপান করতে করতে সংবাদপত্র পড়ছেন জীবানন্দ, আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নায়েব কর্তৃক জোর করে ধরে নিয়ে আসা ভৈরবী ষোড়শী, দৃশ্যটা এই। অভিনয় চলছে ; হঠাৎ জীবানন্দের লিভার পেন দেখা দিল। অতবড় দেহটা দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে গেল ; হাতের সংবাদপত্রখানা মুচড়ে প্রায় ছিঁড়ে ফেললেন জীবানন্দ, ব্যথাক্লান্ত অবসন্ন মুখে ষোড়শীকে বললেন তাকের ওপর থেকে ওষুধের বাক্সে যে মর্ফিয়া আছে তাই নিয়ে আসবার জন্য। লিভার পেন জনিত বেদনার যে অভিব্যক্তি সেদিন নাট্যাচার্য সারা দেহ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা অসাধারণ। আমাদের মনে হয়েছিল বুঝিবা অভিনয় করতে করতে স্বয়ং নাট্যাচার্যই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এতখানি সার্থক ছিল সেই অভিব্যক্তি। মাইকেল মধুসূদনের চরিত্রে অভিনয়ের সময়েও এই রকম বহুবার হয়েছে। যখন মাইকেল শেষ সময়ে জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে শুধু গ্লাসের পর গ্লাস মদ্যপান করছেন, তখন আমরা প্রায় বলে ফেলেছিলাম, "কি করছেন আর খাবেন না'। সামান্য মদ্যপানের অভিব্যক্তিতে

যে দর্শকদের স্থান,কাল, পাত্র ভুলিয়ে এভাবে মাতিয়ে দেওয়া যায়, নাট্যাচার্যের সেদিনের অভিনয় যাঁরা দেখেন নি, তাঁরা তা উপলব্ধি করতে পারবেন না।

আধুনিক কালেও মঞ্চাভিনয়ে এই ধরনের সার্থক অভিব্যক্তির কাহিনী অপ্রতুল নয়। নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট এবং নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য চরিত্রাভিনয়ে, বিশেষ করে চাষী, শ্রমিক, ঝড়ে পড়া, পোড় খাওয়া মধ্যবিত্ত প্রৌঢ়ের চরিত্রে অদ্বিতীয়।

তাঁর নীলদর্পণে তোরাপের ভূমিকা, কিম্বা গোত্রান্তর নাটকে হরেন মাষ্টারের ভূমিকাভিনয় যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই জানেন, উক্ত চরিত্রে দর্শকদের স্থান, কাল, পাত্র ভুলিয়ে কি ভাবে তিনি একাত্ম করে নিতে পারতেন। সাম্প্রতিক কালে মিনার্ভা মঞ্চে 'তিতাস একটি নদীর নাম' নাটকে, বৃদ্ধ মালো রামকেশবের ভূমিকায় বিজনবাবুর অভিনয়, অভিনয়ের ইতিহাসে আর একটি বিশেষ স্মরনীয় সংযোজন। উক্ত ভূমিকায় কোন কোন ক্ষেত্রে রামকেশবের আন্তর ভাবসত্বাটি বিজনবাবু যে ভাবে অভিব্যক্ত করেন, তা অতুলনীয়। বিশেষ করে প্রসাদের পাপ স্বীকারের পূর্বে আনন্দে আত্মহারা রামকেশবের গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে গাইতে মেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া, কিম্বা শেষ দৃশ্যে যখন তার পাগল ছেলে কিশোরকে উন্মত্ত গ্রামের মানুষেরা হত্যা করতে আসে, তখন জাল বুনতে বুনতে তাদের দিগভ্রান্ত করার দৃশ্যে যে, ভয়-ভাবনা আবার স্নেহের মিশ্র অভিব্যক্তি সমগ্র ইন্দ্রিয় আঙ্গিকের সাহায্যে তিনি অভিব্যক্ত করেন, তা এককথায় অপূর্ব। 'দশচক্র' নাটকে ডাঃ গুহর ভূমিকায় শম্ভু মিত্রের'অভিনয়ের কথাও প্রসঙ্গত স্মরণীয়। উক্ত চরিত্রে শম্ভুবাবুর অভিনয়, নিঃসন্দেহে আধুনিক কালের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের উদাহরণ। চরিত্রাভিনয়ে এই অভিব্যক্তির অংশটুকু যদি সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালিত না হতো, অর্থাৎ চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবসত্বাগুলি যদি অভিনয়ের সময়ে অভিনেতার চোখে মুখে, তাঁর চলায়-বলায়, ফুটে না উঠতো, তাহলে নাট্যকার স্বষ্ট চরিত্রটির মঞ্চরূপায়ণ যে নিদারুণ ব্যর্থতার সম্মুখীন হতো, আশা করি সে কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

তাই বলছিলাম অভিনয়ের ব্যাপারে অভিব্যক্তি অর্থাৎ কিনা ভাব প্রকাশ বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

যে কোন চরিত্রের অভিনয়ে অভিনেতা তাঁর চোখ, মুখ, হাত, মাথা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সঞ্চালন দ্বারা, সেই চরিত্রের অন্তর্নিহিত যে ভাব সত্ত্বাগুলি, যথা হর্ষ, অসূয়া ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলেন, তাকেই আমরা বলি expression বা অভিব্যক্তি। যেমন জীবানন্দের লিভার পেন ফুটিয়ে তুলতে নাট্যাচার্য হাতের সংবাদ পত্রটা মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলতেন, কোলের বালিশটাকে প্রায় পেটের সঙ্গে চেপে ধরে মুখের রেখায় রেখায় অব্যক্ত যন্ত্রনার ছাপ রচনা করতেন; যেমন মেলায় যাবার প্রারম্ভে রামকেশবরূপী বিজন ভট্টাচার্য আনন্দোচ্ছল হৃদয়ে গুন্ গুন্ করে গান ধরেন, অথবা স্থির নিকম্প দীপশিখার মত ভাবলেশহীন মুখে জাল বুনতে বুনতে ঈষৎ সংশয়ের সঙ্গে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উন্মত্ত গ্রামবাসীকে দিগভ্রান্ত করেন। যেমন শম্ভুমিত্র ডাঃ গুহ কি জয়সিংহের ভূমিকায় চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবদ্বন্দটিকে মুখের প্রতি ভাঁজে ভাঁজে প্রমূর্ত করে তোলেন।

আমাদের নাট্যশাস্ত্রে সাত্বিক অভিনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রকার অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য অভিনেতাকে বিভিন্ন আঙ্গিক ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন দেখতে পাই। যেমন স্বেদোদ্গম হলে হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলার অভিনয় করে অথবা হাত নাড়িয়ে পাখার বাতাস ইচ্ছা করে স্বেদোদ্গম অভিনয় করবে, কিম্বা হাত দিয়ে চোখের জল মুছে, অথবা চোখের জল ফেলে অশ্রুপাতের অভিনয় করবে ইত্যাদি।

কিন্তু একটা কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হাত, পা, মুখ চোখ, ইত্যাদির সঞ্চালনে এবং বিভিন্ন মুদ্রার সুকৌশল প্রয়োগে অভিনেয় চরিত্রের আন্তরসত্বার অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হলেও, সেগুলির রথাযথ সঞ্চালনই অভিব্যক্তি নয়, তাহলো অভিব্যক্তি প্রকাশের উপাদান মাত্র। ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পন্থার অনুকরণে অভিনেতা এগুলিকে আয়ত্ব করতে পারেন বা তাঁর আয়ত্ব করতে সুবিধা হতে পারে এই মাত্র।

যেমন মনে করা যাক, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একজন পরিচিত

বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ; তখন তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কণ্ঠস্বরকে এক বিশেষ স্বরগ্রামে তুলে, বন্ধুর নাম ধরে চীৎকার করে ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই আমরা হাত তুলে অথবা হাতছানি দিয়ে তাকে দাঁড়াবার কিম্বা এগিয়ে আসবার ইশারা করে থাকি। অথবা কোন ব্যাপারে যদি আমাদের খুব রাগ হয়, তাহলে সেই রাগের প্রকাশ যে কেবলমাত্র কণ্ঠ দিয়েই হয় তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রগের শির ফুলে ওঠে, মুখের পেশী শক্ত হয়, চোখ অক্ষি কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসে, সারা দেহে একটা থরথর কম্পন অনুভূত হয় ইত্যাদি। আবার অনুরাগ প্রকাশের বেলাও ঠিক উল্টোটা ঘটতে পারে, অথবা কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল হবার সঙ্গে সঙ্গে মুখের পেশীগুলিও কোমল হয়ে যায়, চোখ মুখের স্বাভাবিক কার্কশ্য বিলুপ্ত হয়ে একটা সাময়িক প্রশান্তি আমাদের সমগ্র মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, চোখের দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে আসে ইত্যাদি। এক কথায় হাসি কান্না, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি মনের বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহের বিভিন্ন অঞ্চল mood অনুযায়ী সক্রিয় হয়ে ওঠে ; সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই সক্রিয়তা মানসিক ভাব প্রকাশ অর্থাৎ mood projection-এর সঙ্গে সঙ্গে তার অজ্ঞাত সারে ঘটে থাকে ; আর একজন অভিনেতাকে এগুলি গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে অনুকরণ করতে হয়। বলা বাহুল্য হুবহু অনুকরণে ঐসব ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একজন লোক রাগলে কি রকম দেখায়, কেবলমাত্র সেটাই যদি কোন অভিনেতার অনুকরণীয় বিষয় হয়, তাহলে সেই ব্যাপারটা হাস্য রসেরই সৃষ্টি করবে।

ইতিপূর্বে নাটকের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে অনুকরণ ও ক্যারিকেচার সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করেছি বর্তমান প্রসঙ্গে সেই ক্যারিকেচার বা কৌতুক অভিনয়ের কথা পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে। একজন কৌতুক অভিনেতা মানুষের বিভিন্ন mood-এর অনুকরণ করে থাকেন। সেই mood-এর মধ্যে রাগ, অনুরাগ, হর্ষ, অসূয়া. ইত্যাদি মানসিক নানা অবস্থারই প্রকাশ থাকে। কিন্তু কৌতুক অভিনেতার মাধ্যমে সেই অনুকৃত প্রকাশ দেখে আমরা হেসে গড়িয়ে পড়ি কারণ আমাদের মনের গভীরে অবস্থিত এই সব সুপ্ত অনুভূতি-

গুলিকে তাঁরা উজ্জিবীত করতে পারেন না, উপরিতলে সাময়িক ভাবে দোলা জাগান মাত্র! কিন্তু একজন অভিনেতা যখন ঐসব ভাবগুলির অনুকরণ করেন, তখন তাঁরা আমাদের মনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আমাদের সুপ্ত বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করতে সমর্থ হন, তাই তাঁর mood-এর সঙ্গে আমরা একাত্মতা বোধ করি!

উদাহরণের সাহায্যে প্রসঙ্গটিকে আর একটু প্রাঞ্জল করা যাক। মনে করুন কোন একজন স্বনামধন্য কৌতুক অভিনেতা, উৎপল দত্ত অভিনীত সেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের কোন একটি দৃশ্য—ধরা যাক ওথেলো কর্তৃক ডেসডিমনাকে হত্যার দৃশ্যটি অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে অনুকরণ করে পরিবেশন করছেন। ডেসডিমনাকে হত্যার প্রাকমুহূর্তে উৎপলবাবু মঞ্চে যে ভাব প্রকাশ করে থাকেন, কৌতুক অভিনেতা তাঁর সেই সেই ভাবগুলির অর্থাৎ উৎপল বাবুর বাচন ভঙ্গী, তাঁর হাত পা নাড়া, তাঁর মুখের বিভিন্ন অভিব্যক্তি, এমন কি কণ্ঠস্বরেরও হুবহু অনুকরণ করে দৃশ্যটি আপনার কাছে বিশদ করে তুললেন। কিন্তু তার ফলটি কি দাঁড়াল? কৌতুক অভিনেতার মারফৎ উৎপল বাবুর 'ওথেলো' ভূমিকাভিনয় দেখে আপনি হেসে গড়িয়ে পড়লেন; অথচ ধরা যাক আপনি হয়ত আগের দিন, কিম্বা যদি সেদিন রবিবার হয় তাহলে সেইদিনই ম্যাটিনী শোতে মিনার্ভায় গিয়ে উৎপল বাবুর ওথেলো অভিনয় দেখে এসেছেন, এবং আমরা অনুমান করতে পারি যে, আপনি ওথেলো কর্তৃক ডেসডিমনার হত্যার দৃশ্যাংশটি প্রত্যক্ষ করে নিশ্চয় হেসে গড়িয়ে পড়েন নি; বরং একটা অব্যক্ত ভয় এবং করুণার (horror and pity) মিশ্র অনুভূতি আপনার সমস্ত সত্বাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল; এবং কৌতুক অভিনেতা কৃত উক্ত দৃশ্যের অনুকরণ দর্শনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সেই মনোভাব আপনাকে ব্যাকুল করে রেখেছিল নিশ্চয়।

কেন এমন হয়। অনুকরণ তো দুটোই। ওথেলোর ভূমিকায় উৎপল বাবু যেটা করেছিলেন সেটাও যেমন কতকগুলো ভাব ও অভিব্যক্তির অনুকরণ আবার কৌতুক অভিনেতা যেটা করলেন সেটাও তেমনি উৎপল দত্ত কৃত ভাব ও অভিব্যক্তির হুবহু অনুকরণ। তবে একটা আপনাকে কাঁদাল, আর একটা

আপনাকে হাসাল কেন ? কারণ একটায় অর্থাৎ কৌতুক অভিনেতার কাজে আছে কেবলমাত্র অনুকরণ, যা আপনার মনের উপরিতলে সাময়িক ভাবে দোলা জাগাল মাত্র। তাই সে দোলার পরিণতি হলো হাস্যরস, আর উৎপলবাবুর অভিনয়ে কেবলমাত্র mood-এর অনুকরণই ছিল না, ছিল তদতিরিক্ত আর একটি বস্তু আলঙ্কারিক পরিভাষায় যাকে আমরা বলতে পারি ব্যঞ্জনা, তাই তাঁর অভিনয় আপনার মনের গভীরে সুপ্ত ভাবগুলিকে জাগতে সক্ষম হয়েছিল, তাই আপনি সে অভিনয় দর্শনে হেসে গড়িয়ে পড়তে পারেন নি ; আবেগ, করুণা, ভয় ইত্যাদির মিশ্র অনুভূতি নিবিড় হয়ে আপনার মনকে গভীর আনন্দে স্থান, কাল, পাত্র ভুলিয়ে তন্ময় করে, অনন্ত রসলোকের সন্ধান দিয়েছিল ।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, অভিব্যক্তি অর্থে কেবলমাত্র চরিত্রের অন্তর্নিহিত কতকগুলি ভাব বা mood-এর ইন্দ্রিয় সঞ্চালন জনিত অনুকরণ নয় ; তা হলো গভীর আবেগ বা emotion সংমিশ্রিত ভাবময় ব্যঞ্জনার প্রকাশ। অনুকরণ সহজায়ত্ব, কিন্তু তাকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলা সহজ সাধ্য নয়। সু-অভিনেতার কাজ হলো অভিব্যক্তির অনুকরণ করা নয়, আপন মনের আবেগ ও মাধুরী মিশিয়ে সেই অনুকরণকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলা, নৈলে তাঁর অভিনয় সার্থকতা লাভ কোনদিনই করবে না।

সাধারণ ভাবে কিন্তু এই ব্যঞ্জনার ব্যাপারটা অনেকেই খেয়াল রাখেন না। বিশেষ কার সখের অভিনেতা যাঁরা, তাঁদের অভিনয়ে এই emotion এর কোন বালাই আমরা দেখতে পাই না। কারণ তাঁরা অফিসের খাটুনির পর ক্লাবে আসেন মানসিক re-creation-এর জন্য। তাঁদের কাছে re-creation শব্দটির অর্থ নতুন সৃষ্টি নয়, নিছক আনন্দমাত্র, অথচ মুখে art for arts shake নীতিটিকে তাঁরা সকলেই নস্যাৎ করে দিয়ে 'নাট্য আন্দোলন' শব্দটি বেশ জোর দিয়ে ব্যবহার করে থাকেন। অপেশাদার সংস্থাগুলিতে যাঁরা অভিনয় করতে আসেন, তাঁরা প্রায় সকলেই মনে মনে নিজেদের পূর্ণাঙ্গ অভিনেতা (finished actor) বলে মনে করেন, অনেকেই যে চরিত্রে অভিনয় করছেন, সেই চরিত্রের প্রতি একটা অসীম দয়া প্রদর্শন করে থাকেন,

যেন তাঁরা সেই চরিত্রে অভিনয় করছেন বলে, চরিত্রটিরই সকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এই ধরণের একটা মনোভাবের ফলে, চরিত্রের আন্তর সত্বার রূপটি তাঁদের অজ্ঞাতই থেকে যায়, অথবা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণের সাহায্যে, তা তাঁরা জানবার বোঝবার কোন চেষ্টা করেন না। হয় চরিত্রগুলিকে ওপর ওপর দেখেন নয়ত বা কোন বড় অভিনেতার কথা স্মরণ রেখে, চরিত্র রূপদানের সময় তাঁদের হুবহু অনুকরণ করেন। সকলেই যে অনুকরণ করেন একথা আমরা নিশ্চয় বলছি না, তবে অনেকেই যে করেন একথা সত্য।

অপেশাদার সংস্থার পুরাতন অথবা নূতন যে নাটকই অভিনীত হোক না কেন, সেই অভিনয়ের মধ্যে পূর্ববর্ত্তী অভিনেতাদের অভিনয়ের অনুকরণ যে দেখা যায় না, এমন নয়। আলমগীর কিম্বা ষোড়শী নাটকে, আলমগীর কিম্বা জীবানন্দের ভূমিকয়া, সাজাহান নাটকে সাজাহান অথবা জাহানারার ভূমিকায় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই শিশির কুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং সরযূবালার অভিনয়ের অনুকরণ দেখে থাকি। আধুনিক কালের রক্তকরবী, কাঞ্চনরঙ্গ, কিম্বা গোত্রান্তর, বা নবান্নর অভিনয়ে আমরা শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ অভিনেতাদের অভিনয়ের অনুকরণ প্রচেষ্টা যে দেখতে পাই না তা নয়। বলাবাহুল্য এই সব অনুকরণ কৌতুক অভিনয়ের পর্যায়েই পড়ে। একজন উদীয়মান অভিনেতা যতই নিষ্ঠার সঙ্গে এই অনুকরণ করার চেষ্টা করুন, তা অভিপ্রেত রস সৃষ্টি না করে হাস্যরসেরই উদ্রেক করে।

অভিব্যক্তির ব্যাপারটা একজন অভিনেতার পক্ষে সাধনার বিষয়, তাই সেটা যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গেই আয়ত্ব করা উচিত। তবে মনে রাখতে হবে যে, এটা কেবলমাত্র অনুকরণের ওপর নির্ভর করে না ; যদিও অনুকরণ থেকেই এর সূত্রপাত। এই প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে যে গাতি কাব্যের কথা উল্লেখ করেছি তা পুনর্বার স্মরণ করা যেতে পারে। একটা ভাল অভিনয়কে আমরা পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ গীতি কাব্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। কোন একজন শ্রেষ্ঠ গীতি কবির কাব্যের হুবহু অনুকরণে যেমন আর একটি শ্রেষ্ঠ গীতি কাব্য রচনা করা যায় না, তেমনি পূর্ববর্তী কোন অভিনেতার অভিনয় ধারা'র অনুকরণে আর একটি ভাল অভিনয় রচনা সম্ভব হয় না। তার জন্য চাই অভিনেতার

ব্যক্তিগত আবেগ এবং অনুভূতির সঙ্গে তাঁর রুচি এবং বোধের সৌসাম্য। সুতরাং অভিব্যক্তির অনুকরণ করতে গিয়ে একজন অভিনেতা যেন কোন কারণেই পূর্ববর্তী কোন অভিনেতার অনুকরণ না করেন। তাঁর অনুকরণীয় বিষয় হলো লোক চরিত্র, তাদের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সত্বার ভাবস্পন্দন গুলিকেই একজন অভিনেতা তাঁর আবেগ এবং বোধের শক্তিতে নিজের হৃদয়ে জারিয়ে তুলবেন, এবং তারপর তাকে আপন দেহের সাহায্যে বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত করবেন।

তিন

অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা

কিন্তু অভিব্যক্তি প্রকাশের মূল তত্বটির এইখানেই শেষ নয়। কেননা নিছক অনুকরণের দ্বারা সার্থক সৃষ্টি সম্ভব হয় না। আমরা ইতিপূর্বে সৃষ্টি তত্বের রহস্যের আলোচনায় twilight zone বা গোধূলী লগ্ন শব্দটি ব্যবহার করেছি। অভিনয় করতে করতে কখন যে, একজন অভিনেতা অনুকার্য চরিত্রের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যান, সে কথা বলা দুরূহ। সকল অভিনেতার ভাগ্যে তাতো ঘটেই না, খুব বড় বড় অভিনেতার জীবনেও সেই স্মরণীয় মুহূর্ত আসে মাত্র অল্প কয়েকবার। গিরিশচন্দ্র পশুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন একাধিকবার; কিন্তু তাঁর উন্মাদদশার অভিব্যক্তি দেখে দর্শক আত্মভোলা হয়ে চীৎকার করে উঠেছিলেন একবার মাত্র। হয়ত বা গিরিশ-চন্দ্রের সামগ্রীক অভিনয় জীবনে, এই চেতন অবচেতনের মিলন মুহূর্তে নিবিড় রসপোলব্ধি দ্বিতীয়বার ঘটে ওঠে নি। সুতরাং অভিনয় অভিব্যক্তির আলোচনায় ঐ দুর্জ্ঞেয় রহস্যটির কথা আমরা বাদ দিতে পারি। কিন্তু তাহলে কি কেবলমাত্র অনুকরণ করা ছাড়া অভিনেতার আর কোন কাজ থাকে না? না একথাও আমরা স্বীকার করি না, কেননা আজকের দৃষ্টিতে নট কেবলমাত্র অনুকর্তা নন, তিনি সৃষ্টিকর্তাও বটে। আর কোন সার্থক সৃষ্টিই কেবলমাত্র

অনুকরণের দ্বারা যে সম্ভব হয় না, একথা আমরা বহুবার বলেছি। তাহলে থাকলো কি? অনুকরণের সূত্র ধরে আয়ত্বীকৃত অভিব্যক্তির প্রকাশ অনুকরণের অতিরিক্ত কোন বস্তুকে আয়ত্ব করে সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবো, ব্যঞ্জনাই হলো সেই অতিরিক্ত বস্তু, যা একজন অভিনেতার অভিনয় কলাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে, তাঁকে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীতে-পরিণত করে। এই প্রসঙ্গে কাব্যের উপমাটা আর একবার স্মরণ করা যাক।

কবি যে কাব্য রচনা করেন। তার বিশ্লেষণে আমরা প্রাথমিক ভাবে শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার, ইত্যাদি কতকগুলি বস্তুর সন্ধান পাই ; বলাবাহুল্য এগুলো হলো কবির কাব্য রচনার উপাদান। ঠিক তেমনি সুস্পষ্ট উচ্চারণ, কণ্ঠের স্বরবিন্যাস, লোক চরিত্রের বিভিন্ন ভাবের, আপন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুকরণ, হলো অভিনয় রচনার উপাদান। কাব্যরচনা করতে গেলে যেমন শব্দার্থ বোধ, ছন্দ জ্ঞান, ইত্যাদি একজন কবির থাকা প্রয়োজন, তেমনি অভিনয় করার পূর্বে বাচনভঙ্গী, স্বরবিন্যাস ইত্যাদিও একজন অভিনেতার সতর্কতার সঙ্গে আয়ত্ব করা উচিত। কিন্তু সেগুলি আয়ত্বের পরও সার্থক অভিনয় সম্ভব হয় না, প্রয়োজন হয় বিশেষ ভাব বা mood-কে ব্যঞ্জনার দ্বারা সামান্য করে তোলার ; ঠিক যেমন শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কারের সমন্বিত প্রয়োগ করলেই পদ্য কবিতা হয়ে ওঠে না।

ব্যক্তিগত জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত যে সব সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার সম্মুখীন হচ্ছি, পৃথক পৃথক ভাবে তার সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পর্ক থাকলেও তার সামগ্রীক রসাভাস সম্পর্কে আমরা প্রায় উদাসীনই থাকি। রামবাবুর একমাত্র সন্তান যখন মারা যায়, তখন তাঁর প্রতিবেশী শ্যামবাবুর ঘরে হয়ত ভোজের নিমন্ত্রণ। রামবাবুর স্ত্রীর কান্নায় হয়ত তিনি একবার "আহা" বলে, অথবা কোন এক ফাঁকে তাঁদের বাড়ী গিয়ে দেখা করে, প্রতিবেশীর কর্তব্য সমাপ্ত করেন। আবার আনন্দের ব্যাপারে বরং একটু ঈর্ষ্যার উৎপত্তিই ঘটায়। পাশের বাড়ীর মেয়ের বিয়েতে যদি কন্যাকর্তা খুব বেশী ধূমধাম করেন, তাহলে এ বাড়ীর মেয়ে মহলের মধ্যাহ্ণ মজলিসের প্রথম বির্তক বস্তু হবে ঘুষের টাকার বাড়বাড়ন্ত নিয়ে, একথা প্রায় অবধারিত। আবার শ্যামবাবুর বাড়ীতে যদি

উল্টোটা ঘটে, তাহলে রামবাবুর বাড়ী তার প্রতিক্রিয়া, তাঁর বেলা শ্যামবাবুর বাড়ীতে যা ঘটেছিল অনেকটা সেইরকমই ঘটে। আসল কথা হলো ব্যক্তিগত ভাবে সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনার, অংশীদার হলেও, তাবৎ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি আমাদের মনে জারিয়ে উঠে একটা বৃহত্তর রূপ নেবার অবকাশ দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বড় একটা ঘটে না। কিন্তু এই সব ঘটনাগুলো যখন অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ এই সকল ঘটনার যখন শিল্পোত্তরন ঘটে, তখন কিন্তু আর আমরা নিস্পৃহ থাকতে পারি না। তখন রামবাবুর সন্তান আমাদের সন্তান হয়ে ওঠে, এবং তার মৃত্যু, রামবাবুর পিতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিতৃত্ববোধেও দোলা জাগায় ; এবং তার ফলে আপন সন্তানের মৃত্যুশোকে আমরা অভিভূত হই। ব্যক্তির দুঃখকে অথবা আনন্দকে সমষ্টির দুঃখ অথবা আনন্দ করে তোলাই হলো শিল্পের ধর্ম ; অভিনয় কলায় শিল্পের এই আন্তর প্রবণতাটিকে যে অভিনেতা যতখানি সার্থক করে তুলতে পারেন, তাঁর অভিনয় ততখানি জীবন্ত এবং বাস্তবানুগ হয়ে ওঠে।

অভিনেয় চরিত্রের অন্তর্নিহিত মানস সত্বাটিকে সর্বজনীন করে তোলার কোন সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নেই, কেননা ব্যঞ্জনা ব্যাপারটা ব্যাখ্যার বস্তু নয়। ছন্দ বদ্ধ একটি পদ কোন সময় কাব্য হয়ে ওঠে তা কবিও জানেন না। তবে সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে, সহৃদয়তা হলো এর প্রাথমিক উপাদান। অভিনয়কলা যাঁরা দর্শন করেন, সেই সামাজিকবর্গকে আলঙ্কারিকরা সহৃদয় বলে উল্লেখ করেছেন, কেননা রসের উদ্বোধন সহৃদয়ের চিত্ত ছাড়া সম্ভব নয়। আমাদের কথা হলো, যিনি সেই রসের প্রদর্শন করেন অর্থাৎ অভিনেতা, তাঁকেও সহৃদয় হতে হবে, নচেৎ অনুকর্তা চরিত্রের আন্তর রস সত্বাটি তাঁর চিত্তে উদ্বোধিত হবে কেমন করে? আর তা যদি না হয় তাহলে কেমন করে তিনি সেই রস স্বরূপকে অগণিত দর্শক মণ্ডলীর হৃদয় সংবেদ্য করে তুলবেন? এই কারণেই অভিনেতার দায়িত্বের আলোচনায় আমরা বলেছি যে, একজন অভিনেতাকে সর্বপ্রথম হতে হবে পরিশুদ্ধ মনন ও বোধের অধিকারী, এবং ঋষি না হলেও ঋষিকল্প মানুষেরই সেই অধিকার আয়ত্ব করা সম্ভব হয়।

চার

অভিব্যক্তি, পরিমিতি এবং অতি-অভিনয়

রসসৃষ্টির জন্য যেমন পরিশুদ্ধ মানস ও বোধের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন পরিমিতি জ্ঞানের। একক চরিত্রের অন্তর্নিহিত সত্তা অর্থাৎ তার রাগ, দ্বেষ, হিংসা, কপটতা, স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য, ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলায়, এবং তাকে সর্বজনীন করে তোলায় একজন অভিনেতা নিজেকে কতখানি অভিব্যঞ্জিত করবেন, তার ওপর নির্ভর করে। আর এই পরিমিতির মাপকাঠি একজন অভিনেতাকেই বার করতে হবে।

আপন অপমানের প্রতিশোধ-সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চাণক্য যখন নন্দকে বলিদান করলেন, তখন তাঁর সেই দুর্জয় আনন্দ, অথবা বহুদিন পর হারান কন্যা আত্রেয়ীকে ফিরে পেয়ে নীরস চাণক্য-হৃদয়ে যে বাৎসল্য ও সংশয়ের দোলা জাগল, তার রূপায়ণ একজন অভিনেতা কোন পদ্ধতিতে করবেন বা করলে লোকের ভাল লাগবে, তা কি বলে দেওয়া যায়? মনে করুন, শিশির কুমার ভাদুড়ীর কথা। চাণক্য-চরিত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় অভিনেতা। নন্দের বলিদানের পর নাট্যাচার্য মঞ্চে প্রবেশ করতেন তাণ্ডব নাচের আঙ্গিকে আর সেই সঙ্গে দুহাতে আজানুলম্বিত বেণীবন্ধন করতেন, সারা মুখে ফুটে উঠত দুর্জয় আনন্দের এক পৈশাচিক উল্লাস। চাণক্য-চরিত্রের ক্রূরতা, তার আত্মাভিমান, এবং দম্ভ যেন শতধা বিচ্ছুরিত হয়ে পড়তো নাট্যাচার্যের সমগ্র দেহভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে। তখন উন্মত্ত চাণক্যের সেই রূপ দেখে রোমাঞ্চিত হতো দর্শকমণ্ডলী। আবার যখন আত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা হতো চাণক্যের, যখন তাকে চিনি চিনি করেও চাণক্য চিনতে পারছেন না, তখন একদিকে সুপ্ত বাৎসল্যের উজ্জীবন, আর একদিকে প্রতারণার সংশয়, একদিকে কূটনীতিবিদ, খরবুদ্ধিসম্পন্ন চাণক্য, অপরদিকে এক কন্যাহারা দরিদ্র পিতা চাণক্যের সংঘাতে, তখন নাট্যাচার্যের সারা দেহে যে প্রশান্তি ও সংশয়ের খর-দীপ্ত প্রকাশ ঘটতো, তা অনবদ্য। কেমন করে এ তিনি করতেন, তা

বোধ করি তিনি নিজেও বলতে পারতেন না। বলা যায় না। কিন্তু আমরা এটুকু বলতে পারি যে, চাণক্যের ভূমিকায় ঐ সব দৃশ্যে নাট্যাচার্য যে আঙ্গিক এবং অভিব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলির প্রকাশ যদি আর একটু কম কি বেশী হতো তাহলে হয়ত সঠিক চরিত্রায়ণ হতো না, হয়ত তাঁর অভিনয় নিছক অনুকরণ অথবা অতি-অভিনয়ে (melo-drama) পরিণত হতো। পরিমিতিবোধের অভাবই melo-drama বা অতি-অভিনয়ের কারণ। পরিমিতিবোধ আয়ত্ত করতে গেলে তাই সর্বপ্রথম পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অভিনেয় চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করে নেওয়া দরকার, এবং তারপর তার আন্তর-সত্তার রসরূপটিকে অনুধ্যান করে আপন মনের আবেগ কল্পনার সঙ্গে জারিয়ে নেওয়ার দরকার। এইভাবে অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতা যখন নিজের সত্তাটিকে বিলুপ্ত করে দেন, তখন তাঁর অভিনয়ে সেই চরিত্রটি আপনা থেকে তার সমগ্র রসরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। পরিমিতি আসে আপনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। সচেতনভাবে তাকে আনা যায় না, নিয়ন্ত্রণ করা হয়ত যেতে পারে।

সাধারণ ক্ষেত্রে অভিনেয় চরিত্রের যথাযথ বিশ্লেষণ হয় না বলেই, অভিনয়ের সময় অভিনেতাকে লোকচক্ষুকে ফাঁকি দেবার জন্য অনেক কিছু কারচুপি করতে হয়। অযথা চেঁচিয়ে, বেশী হাত পা নেড়ে, বা কণ্ঠকে খুব করুণ বা গম্ভীর করে অভিনেতা দর্শককে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য তাতে করে ফাঁকি তিনি নিজেই পড়েন, কেননা দর্শক কিছুক্ষণ পরেই এই ফাঁকিটি ধরতে পেরে অভিনেতার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন এবং অভিনয় শেষে তাঁর অভিনয়কে melo-dramatic বলে রায় দিয়ে আসেন। অভিনয়-কালে অভিনেতা যদি তাঁর পরিমিতিবোধ হারিয়ে ফেলেন, তাহলেই তাঁর অভিনয়ে এই বাড়াবাড়ির উৎপত্তি হয়।

অবশ্য সকল সময়েই যে melo-drama সম্পর্কে দর্শকের রায় চরম একথা মনে করা ভুল হবে। অনেক সময় অভিজ্ঞতার অভাব একটি চরিত্রাভিনয়কে অতি-অভিনয় বলে পরিগণিত করতে পারে। সকল সময়েই যে দর্শকমণ্ডলী তাবৎ শ্রেণীর মনুষ্য-চরিত্র এবং তাদের অভিব্যক্তি

সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এমন কথা নয়। বরং অনেক সময় অভিনেতার জ্ঞানকাণ্ডের সীমানা তাঁদের চেয়ে অধিক সম্প্রসারিত, যেহেতু অভিনেয় চরিত্রটিকে তিনি বিশেষ রূপে বিশ্লেষণ করে তাকে রূপায়িত করছেন। অবশ্য একথা কেবল মাত্র সহৃদয় অভিনেতার পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু সে যাই হোক, সাধারণ ক্ষেত্রে, সাধারণ দর্শক অর্থাৎ আমরা, আমাদের জ্ঞানগোচর ও বুদ্ধিগোচর বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করে থাকি, এবং যা আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে আছে, বা যা আমাদের চিরাচরিত সংস্কার বিশ্বাসের পরিপন্থী, তাকেই আমরা সচরাচর বর্জন করে চলার পক্ষপাতী। অভিনয়ের ক্ষেত্রে কোন চরিত্রে একজন অভিনেতা যে অভিনয় করে থাকেন সেই অভিনয় আঙ্গিকে যদি এমন কোন বস্তু থাকে, যা আমাদের জ্ঞান অথবা বুদ্ধিগোচর নয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে সেই অভিনয়-কলাকে আমরা অতি-অভিনয় বা melo-drama বলে আখ্যা দিয়ে থাকি। উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটাকে আরও একটু বিশদ করে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

এই পৃথিবীতে বহু বিচিত্র মানুষের বাস। সেই বিচিত্র মানবগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত তার জীবন-পথ পরিক্রমায় যে নিত্যনূতন জ্ঞান ও সত্যের সম্মুখীন হচ্ছে, তাকে যে সে কেবলমাত্র সর্বান্তঃকরণে উপলব্ধি করার চেষ্টাই করছে তা নয়, সেই উপলব্ধ সত্যকে সে প্রতিনিয়ত নানা ভঙ্গীতে প্রকাশও করে চলেছে। তাবৎ মানুষের নিত্য চলমান মিছিলের দিকে নিবিড় ভাবে দৃষ্টিপাত করলে এই সত্যই আমাদের কাছে দীপ্তিমান হয়ে উঠবে।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে এই উপলব্ধি এবং তার প্রকাশ ভেদাত্মিকা। আর বৈষম্য একদিকে যেমন মানুষের ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি, সংস্কৃতি এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল, তেমনি অন্যদিকে জন্মভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশ তার মানসিক পরিমণ্ডলের ওপর রেখাপাত করে, এবং তার জীবনের উপলব্ধ সত্য ও তার প্রকাশের তারতম্য ঘটায়। একজন শিল্পী বা দার্শনিক দৈনন্দিন জীবনছন্দের ছোটখাট বুদ্বুদ-গুলি সম্পর্কে যেরকম সতর্ক, একজন চাষী বা শ্রমিক সেরকম নয়। একটি মধ্যবিত্ত মানস, তার জীবনযাত্রা এবং তার সফলতা ও ব্যর্থতার সংঘাতে

জীবন-সত্যকে যেভাবে যাচাই করে এবং তার অর্থ যেভাবে করে, একজন অভিজাত ধনী কখনই সেই দৃষ্টিতে জীবনের পরিমাপ করতে পারে না। আবার প্রকৃতির সঙ্গে যাদের সরাসরি সম্পর্ক সেই চাষী সম্প্রদায় জীবনকে যে মাধ্যমে ভাবে, নাগরিক সভ্যতার আবেষ্টনীর মধ্যে বিধৃত মানুষের পক্ষে তার স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়।

এ ত গেল প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা। এ ছাড়াও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনও মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং তার অভিব্যক্তিকে সদা সর্বদা নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। সামাজিক উৎপীড়ন, এবং অবজ্ঞার ফলে যে চাষী যুগ যুগ ধরে দারিদ্র্য আর অনাহারের সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছে, জমিদার আর তাঁর নায়েব-গোমস্তাকে যে চাষী চিরকাল ভয় করে এসেছে, জীবন সম্পর্কে তার মনোভঙ্গী এবং যে নায়েব-গোমস্তা, চিরকাল সামান্য অর্থলোভে জমিদারের পদলেহন করে, আপন স্বজাতি স্বজনের প্রতি অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে এসেছে, জীবন সম্পর্কে তার ধ্যান-ধারণা এবং অভিব্যক্তির প্রকাশ স্বাভাবিক ভাবেই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হবে। ফরাসী বিপ্লবের সময় যে মানুষেরা একখণ্ড রুটির জন্য রাজপ্রাসাদের দ্বারে জমায়েত হয়েছিল, আর যে রানী তাদের রুটির দাবি শুনে আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, "রুটি না পেলে ওরা কেক খায় না কেন?" তাদের দুজনের মনোভঙ্গীর পার্থক্যের মূলে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার মানদণ্ড কি পরিমাণে নির্ভরশীল, তা বোধ করি ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন নেই।

বলা বাহুল্য, মানুষের জীবনযাত্রার মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে, তাদের ভাবাভিব্যক্তির রকমফেরের ব্যাপারটা আমাদের মাথায় থাকলেও সেটা সব সময় স্পষ্ট হয়ে থাকে না; অনেক সময় আবার ব্যক্তিগত নানা স্বার্থ সুবিধার কূটচক্রে জড়িয়ে পড়ে, সেই পার্থক্যের স্বরূপটাকে আমরা না বুঝতেই চেষ্টা করি। কিন্তু একজন অভিনেতা যিনি তাবৎ লোকচরিত্র রূপায়িত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁর তো আর এ ব্যাপারে উদাসীন থাকলে চলে না; তাই তিনি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের শ্রেণীজাত বৈষম্যের স্বরূপটি বিশ্লেষণ করে, জীবন সম্পর্কে তার ধ্যান-ধারণা

এবং অভিব্যক্তির তারতম্যটি আয়ত্ত করেন, এবং নিষ্ঠা সহকারে মঞ্চে তা রূপায়িত করে থাকেন। সেই রূপায়ণ যথাযথ হলেও অনেক সময় আমাদের অজ্ঞতা, অনবধানতা, অথবা সচেতন অবহেলার জন্য, আমরা সেই অভিনয়কে অতি-অভিনয় আখ্যা দিয়ে থাকি। বলা বাহুল্য সেই আখ্যা সব সময়ে যে সার্থক হয় তা নয়। একটা অভিনয়কে অতি-অভিনয় বলে রায় দেবার পূর্বে আমাদের কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার তা হলো, অভিনেতা কোন্ চরিত্রে অভিনয় করছেন, তার সামাজিক পরিবেশটি কি এবং আমরা যারা অভিনয় দেখতে গেছি তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে সেই চরিত্রটি কতখানি ধরা দেয়। বিদগ্ধ দর্শকের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু আমাদের মত সাধারণ দর্শকের অভিজ্ঞতার গণ্ডীর প্রসারতা খুব বেশী নেই। গ্রামের একটি চাষীকে, কি বাউল বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে, বা জেলে মালোকে, আমরা যে খুব বেশী চিনি, তা নয়। তাদের কথা আমাদের জানা আছে, পড়াও হয়ত আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাস্তব জীবনে কিন্তু সেই সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আমাদের খুবই অল্পই, তাই তাদের আচার-আচরণ, এবং তার প্রকাশ রীতি আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরেই থেকে যায়। বলতে দ্বিধা নেই যে, অধিকাংশ শহরবাসী মানুষের চাষার অথবা জেলের সঙ্গে পরিচয় প্রাত্যহিক বাজার করার সময়। চাষী দেখেন নি এমন লোকও বিরল নয়। সুতরাং এই সব মানুষ যখন মঞ্চে একটি চাষী অথবা জেলের অভিনয় দর্শন করবেন, তখন অভিনেতা, যিনি বহুদিন সাধনার পর চাষী বা জেলে-জীবনকে খুঁটিয়ে খুটিয়ে হৃদয়ঙ্গম করে রূপদান করছেন, সেই অভিনয়কে যেহেতু তাঁরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবেন না, সেইহেতু অতি-অভিনয় বলে রায় দিয়ে আসতে পারেন। তাই বলছিলাম যে, একটা অভিনয়কে অতি-অভিনয় বলে আখ্যা দেওয়ার পূর্বে দুবার ভেবে নেওয়া উচিত।

কিন্তু সে যাই হোক; অতি-অভিনয় আছে, এবং অতি-অভিনয় হয়। যাঁরা স্বল্পশক্তিমান অভিনেতা, যাঁরা যথেষ্ট অভিনিবেশ সহকারে অভিনেয় চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করেননি, অথবা যাঁরা শক্তিমান অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত জীবনের নানা ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়ে অন্তরে অন্তরে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে

গেছেন, তাঁরা যথেষ্ট সহৃদয়তার সঙ্গে অভিনয় না করার ফলেই অভিনয় অতি-অভিনয়ে পরিণত হয়।

অতি-অভিনয়ের কারণ সাধারণতঃ দুটি এক, শক্তির স্বল্পতা; দুই, দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা। শক্তির স্বল্পতার জন্য আসে পরিমিতিবোধের অভাব, কর্তব্যনিষ্ঠ শিল্পী এই অভাব নানা প্রকার অনুশীলনের সাহায্যে কাটিয়ে উঠতে পারেন, পরিমিতিবোধ তাঁর আসতে পারে। আর যাঁরা সব জেনেও দায়িত্বজ্ঞানহীন, তাঁদের কথা আলাদা, সে রোগ সারবার নয়। একজন অভিনেতার জীবনে যখন সচেতনভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখা দেয় তখন বুঝতে হবে, তাঁর প্রতিভা নিঃশেষিতপ্রায়। উৎসাহের যে ধূম তখনও তাঁর মধ্যে দেখা যায়, তা নির্বাপিত দীপশিখার ধূম, প্রজ্বলিত বহ্নিশিখার নয়।

পাঁচ

অভিব্যক্তি প্রকাশের প্রাথমিক সংকট ও সামাধান

অভিব্যক্তির মূলতত্ত্ব যাই হোক না কেন, এর আয়ত্তীকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে অভিনেতাকে বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। যথা, মনোযোগের অভাব, অতিরিক্ত আত্ম-সচেতনতা, দর্শক সম্পর্কে একটা অকারণ ভীতি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য অভিনয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে উল্লিখিত সংকটের সম্মুখীন হতে হয় বলেই একজন অভিনেতার অভিনয়, আড়ষ্ট, ভাবলেশহীন, এবং নিরুত্তাপ বলে মনে হয়; তিনি যতই প্রাণপণে অভিনয় করুন না কেন, তাঁর সেই প্রাণান্ত-কারী প্রচেষ্টা দর্শক-মনে কোন রেখাপাতই করতে সমর্থ হয় না।

সুতরাং অভিনেয় চরিত্রের আন্তর-সত্তার রসরূপটি সর্বাঙ্গসুন্দর করে অভিব্যঞ্জিত করে তুলতে গেলে, সর্বপ্রথম একজন অভিনয়শিক্ষিচ্ছু ব্যক্তিকে এই সংকটগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, এবং যাতে সেগুলোকে কাটিয়ে

উঠে অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে, এই সংকটগুলির বেশীর ভাগই মনস্তাত্ত্বিক কারণে উদ্ভূত। যদি নিজের সম্পর্কে অভিনেতার কোন দৃঢ়তা অর্থাৎ confidence না থাকে, অথবা যদি তাঁর মধ্যে আবেগ বা সাধনা বা 'সিনসিয়ারিটির' অভাব থাকে, তাহলেই এই সংকটের দেখা দেয়।

সু-অভিনেতা হবার পক্ষে তাই প্রথম সর্তই হলো আত্মসংযম এবং আত্মপ্রত্যয় অর্থাৎ self-confidence। একজন অভিনেতাকে সদাসর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, তিনি যে সব চরিত্রে রূপদান করেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীর পরিপোষণ করার জন্য নয়। তাবৎ দর্শক সাধারণকে সেই চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবরূপটির সাহায্যে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই হলো একজন অভিনেতার কাজ। অভিনেতা যখন একটি চরিত্র হয়ে মঞ্চে হাসেন অথবা কাঁদেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দর্শক সাধারণকেও হাসতে অথবা কাঁদতে হবে, অর্থাৎ একজন অভিনেতা নিজের অভিনয়-ক্ষমতার সাহায্যে কখনও হাসাবেন, কখনও বা কাঁদাবেন, এককথায় আপন ইচ্ছানুসারে দর্শক মনের উত্তাল ভাব-সমুদ্রের দোলাচল বৃত্তিকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করবেন। তা যদি না পারেন, তাহলে তাঁর অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করাটা নিষ্ফল হয়ে যাবে। মানসিক দৃঢ়তা না থাকলে, আপন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাবৎ দর্শক সাধারণকে কখনই উদ্বুদ্ধ করা যায় না। আত্মপ্রত্যয় হলো সেই ইচ্ছা শক্তির নিয়ন্তা। আপন কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে যার সুদৃঢ় প্রত্যয় বর্তমান, একমাত্র সেই শ্রেণীবদ্ধ দর্শক সমাজকে আপন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত করতে পারে। আত্মপ্রত্যয় না থাকলে এই দুর্দান্ত ইচ্ছাশক্তি আয়ত্ত করা যায় না।

যে চরিত্রে একজন অভিনেতাকে রূপ দিতে দেওয়া হলো, যদি তিনি সেই চরিত্রের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের প্রতি সচেতন না থাকেন, যদি বার বার তাঁর মন মনোযোগের বস্তু থেকে বিক্ষিপ্ত হয়, তাহলে নিজের প্রতি বিশ্বাস একজন অভিনেতা হারিয়ে ফেলতে পারেন। সুতরাং অভিব্যক্তির

আয়ত্তীকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে আত্মপ্রত্যয়লাভ শিক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হলো মনোযোগের অভাব। সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত বিচিত্র রকমের ঘটনা প্রবাহের সংঘাতের ফলে, কোন একটি বিষয়ে একনিষ্ঠ মনঃসংযোগ করা আমাদের প্রায়ই হয়ে ওঠে না। আমাদের মনে হয় শহরের মানুষের পক্ষে এই কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। একান্নবর্তী পরিবার উঠে গেলেও শহরের ফ্ল্যাট বাড়ীতে একান্নবর্তী প্রভাবের মধ্যেই আমাদের বাস। এঘরের ছেলে যখন ফাইনাল পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করতে ব্যস্ত, ওঘরের মেয়ের তখন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চর্চার ধুম পড়ে যায় সবচেয়ে বেশী। এবাড়ীর বড় কর্তা যখন অকস্মাৎ থ্রম্বোসিসের স্ট্রোকে হতজ্ঞান, ওবাড়ীর বৈঠকখানায় তখন হয়ত দেশের পলিটিক্যাল আবহাওয়ার তর্ক সপ্তসুরের মাত্রাকেও ছাড়িয়ে উঠেছে। তাছাড়াও নাগরিক জীবনে নিত্য-নূতন নানা চমকপ্রদ বৈচিত্র্যের ফলে কোন একটা বস্তুর প্রতি একনিষ্ঠ মনঃসংযোগের অভ্যাস প্রায়ই বানচাল হয়ে যায়। এ ত গেল বহিরঙ্গ প্রভাবের কথা। এতদিরিক্ত আছে অন্তরঙ্গ ভাব ও ভাবনার জটিলতা। আধুনিক যুগের রাজনীতি, সমাজনীতি, এবং অর্থনীতিগত নানা সমস্যা অহরহ আমাদের একনিষ্ঠ চিন্তার পক্ষে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজকের একটি ছাত্র একনিষ্ঠভাবে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে পারে না, কেননা অল্প বয়স থেকেই তার মনে জেগেছে নানা দুশ্চিন্তা, হয়ত তার পরিবারে বৃদ্ধ পিতা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি নেই; হয়ত তাকে ছেলে পড়িয়ে স্কুলের অথবা কলেজের মাইনে জোগাতে হয়। হয়ত তাকে পড়াশুনা বন্ধ করে কোন্ উপায়ে দুটো পয়সা উপায় করে সংসারে সাহায্য করবে সেই কথা ভাবতে হয়, চাকরী করতে করতে পড়া, অথবা জোর করে সব দুঃখদারিদ্র্য সাংসারিক গঞ্জনা সহ্য করেও লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করতে যাওয়া, একজনের পক্ষে সমান বিড়ম্বনার কারণ হয়ে ওঠে। নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত মানুষ আজ কোন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না। তার মন সর্বদাই বিভ্রান্ত। স্থৈর্য এবং তিতিক্ষা আজ আভধানের পাতার মধ্যে

সীমাবদ্ধ হতে চলেছে। দৈনন্দিন জীবনেই মন যখন বিভ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত, তখন অভিনয় করার সময় তাকে একনিষ্ঠ করে তোলা স্বাভাবিক ভাবেই কঠিন হয়ে পড়ে। আসল কথা হচ্ছে নিষ্ঠাসহকারে কোন বস্তুর প্রতি মনঃসংযোগ করতে আজকাল আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। অথচ অভিনয়-কলাটা মনঃসংযোগ ব্যাপারের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত।

চরিত্রায়ণ ব্যাপারটা একনিষ্ঠ মনঃসংযোগ ভিন্ন সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের অর্জুনের পরীক্ষার কাহিনী আমাদের মনে পড়ে। অস্ত্রপরীক্ষার আসরে ভাস-পক্ষীর প্রতি শরসন্ধান করতে গিয়ে অর্জুনের কেবল পক্ষীর অক্ষিকোটর ভিন্ন আর কোন দিকেই নজর ছিল না, তাই মনঃসংযোগের পরীক্ষায় তিনি স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চরিত্রায়ণের সময় একজন অভিনেতার অর্জ্জুন সুলভ এই আচরণই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, মঞ্চে অভিনয়ের সময় একজন অভিনেতা দর্শকের আসনে কে কোথায় বসে আছে, বা তাঁরা কখন হাসলেন, কখন কথা বললেন, তা প্রায় হুবহু বলে যান। দ্বিতীয়তঃ নিজের সংলাপটুকু বলা হয়ে গেলে ভাবলেশহীন মুখে সহ-অভিনেতার অভিনয় দেখার অভ্যাসটাও কোন কোন অভিনেতার মধ্যে দেখতে পাই। অত্যধিক দুঃসাহসীরা আবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে সহকর্মী অভিনেতা কোন কারণে সংলাপ ভুলে গেলে, তাকে প্রম্পটও করে দেন বলে শোনা যায়। এই সব ঘটতে পারে তখনই, যখন সেই অতি দুঃসাহসী অভিনেতাটি ভুলে যান যে, তিনি একটি চরিত্র মাত্র; বাস্তব জীবনের অমুকচন্দ্র অমুক নন। বলা বাহুল্য অভিনেয় চরিত্র সম্পর্কে মনোযোগের অভাব থাকলেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের অভিনেয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, এমন কি প্রায় সময় তার অস্তিত্বও ভুলে, অন্যের ভুল অথবা দর্শকের হাভভাবের দিকে অভিনেতার নজর পড়ে, আর তার ফলে তাঁর অভিনীতব্য চরিত্রটিই যে শুধু মাঠে মারা যায় তা নয়, সমগ্র নাট্যপ্রযোজনায় যে একটি অখণ্ড সুর-তাল-ছন্দের সৌসাম্য থাকে, তা ব্যাহত হয়; অভিনয়ের সুর বা tone কখন উঁচু কখন নীচু লয়ে বাজতে বাজতে এক বেতালা, বেসুরো, অবস্থার সৃষ্টি করে।

এই মনোযোগের অভাব থেকেই আসে অবহেলা। অনেক সময় এই অবহেলা এমন পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, অভিনেতা অভিনেয় চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে তার অভিব্যক্তিগুলিকে আয়ত্ত করা দূরে থাক, সেই চরিত্রের মুখে নাট্যকার যে সংলাপগুলি বসিয়েছেন, সেগুলোকেও মুখস্থ করেন না। স্টেজে মেরে দেবার এক অদ্ভুত হাস্যকর মনোভাব তাঁদের পরিচালিত করে। মানুষ মেশিন নয়, তাই কিছু ভুল ভ্রান্তি তার পক্ষে অপরাধের নয়, বরং স্বাভাবিক। কিন্তু না-মুখস্ত করা সংলাপ বেধে গিয়ে অভিনয়ের সময় বিপর্যয় ঘটালে যদি আমরা মেশিনের দোহাই দিয়ে সরে পড়তে চেষ্টা করি, সেটা নিশ্চয় অপরাধের। এই অপরাধ প্রবণতা মনের সুপ্ত দাম্ভিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে একটি প্রতিভার অকাল মৃত্যু ঘটায়।

তৃতীয় সংকট হলো পেশী সঞ্চালনে আড়ষ্টতা। অভিব্যক্তির ব্যাপারে অভিনেতার চোখ-মুখ, হাত ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি সক্রিয় সহযোগীতা না করে তাহলে তা কখনই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। অনভ্যাস এবং মানসিক সঙ্কোচের ফলে অনেক সময় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ভাব প্রকাশের মুহূর্তে যথোপযুক্ত সহযোগীতা করতে অপারক হয়, ফলে অভিব্যক্তি সুচারু না হয়ে অতিরঞ্জনের পর্যায়ে গিয়ে ওঠে।

দৈনন্দিন জীবনে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা যে সব অঙ্গভঙ্গী এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকি, তার মূলে কোন সতর্ক সচেতনতা থাকে না। আমরা যা করি তা স্বাভাবিক অভ্যাসের ফলেই করে থাকি। কিন্তু অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক অভ্যাস আয়ত্ত করতে হয়, কেননা সেখানে থাকে সত্য এবং সত্যকল্প বস্তু-জীবনের সংঘাত। মঞ্চে যে ঘর সাজান হয়, তা ঘর নয়, ঘরের মতো ; যে ফুল, লতা, পাতা,নদী, জল, পাহাড় ইত্যাদি আমরা দেখি তা সত্যকারের নদী, জল, ঢেউ বা পাহাড় নয়, তাকে সত্য বলে মনে করি মাত্র। এই মনে করার ব্যাপারে স্বভাবতই অভিনেতাকে একটু বেশী মাত্রায় সচেতন হতে হয়, আর তার ফলেই প্রথম প্রথম সৃষ্টি হয় অহেতুক বিপত্তির। সাধারণ জীবনে ভয় পেলে আমরা যে-ভাবে দৌড়ে পালাই, তার মধ্যে আত্মরক্ষার বাসনাটাই প্রবল থাকে, তাই দৌড়ে পালানটা

ঠিক কেমন ভাবে পালাচ্ছি, তা অনুধাবন না করলেও চলে, কিন্তু অভিনয়ে ভয় না পেয়ে ভীত হবার অনুকরণ করতে হয়, তাই সেই সময় একজন মানুষ ভয় পেয়ে কেমন করে দৌড়ে পালায়, এবং সেই সময় তার পদক্ষেপের রীতিটি কেমন হয়, মুখের ভাঁজে ভাঁজে ভয়ের চিহ্ন কেমন ভাবে ফুটে ওঠে, ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ লক্ষ্য করে, তবে অনুকরণ করতে হয়। প্রথমটি হল স্বাভাবিক প্রয়াস, আর দ্বিতীয়টি হল কার্য-কারণ সম্বন্ধ না থেকেও স্বাভাবিক করে তোলার প্রচেষ্টা। এর জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন। অভ্যাস না থাকলে অভিব্যক্তি স্বাভাবিক করে তোলা প্রায়ই সম্ভব হয় না। এই কারণেই বাস্তব জীবনে দৌড়ের প্রতিযোগীতায় যে লোক চিরকাল কাপ মেডেল পেয়ে এসেছে, তার দৌড়ের রীতি যে অস্বাভাবিক নয়, একথা বলাই বাহুল্য ; কিন্তু সেই ব্যক্তিটি যদি অভিনেতা না হন, তাহলে তাঁকে একঘর লোকের সামনে অভিনয় কালে মঞ্চের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত দৌড়ে যেতে বললে তিনি নিঃসন্দেহে গলদঘর্ম হয়ে উঠবেন, হাজার চেষ্টা করলেও দৌড়-এর স্বাভাবিক রীতি তিনি কিছুতেই বজায় রাখতে পারবেন না। বাস্তব জীবনে সহজ হবার অভ্যাস আর মঞ্চে সহজ হবার অভ্যাস তাই এক কথা নয়।

পেশীর আড়ষ্টতা, অনভ্যাস, অমনোযোগীতা ইত্যাদির মত, মানসিক লজ্জা সঙ্কোচও অভিনয়ের অভিব্যক্তিকে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে দেয় না। মানসিক চিন্তা প্রণালীর তারতম্য অনুসারে মানব চরিত্রকে আমরা extrovert এবং introvert অর্থাৎ বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। লোক চরিত্রের বিচিত্র ভাবাভিব্যক্তির অনুকরণ একজন extrovert বা বহির্মুখী চরিত্রের ব্যক্তির পক্ষে যেমন সহজ, একজন introvert বা অন্তর্মুখী চরিত্রের ব্যক্তির পক্ষে তেমন নয়। Introvert চরিত্রের ব্যক্তিরা দৈনন্দিন জীবন-সংঘাতের ফলে উপজাত ভাবময় ব্যঞ্জনাগুলি মনে মনে অনুভব করতে পারে ; কিন্তু তার প্রকাশ তাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে না। অন্যপক্ষে extrovert চরিত্রের ব্যক্তিরা দৈনন্দিন আচার আচরণের মধ্য দিয়ে নিজেদের সদাসর্বদা প্রকাশ করে চলেছে। অভিনয় আসরে introvert শ্রেণীর ব্যক্তিরা চরিত্রের ভাবাভিব্যক্তির ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত

সঙ্কোচের সম্মুখীন হয়, তাই মনে মনে অনুভব করলেও তার প্রকাশে তারা কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। ফলে এই শ্রেণীর অভিনেতারা নিজেরাই নিজেদের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর একজন অভিনেতা যখন ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে নিজেই নিজেকে 'resist' করতে সুরু করে তখন অভিনয় কলায় পারদর্শীতা লাভ দূরে থাকুক, সাধারণ ভাবে একটা চরিত্রকে রূপায়িত করাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ধরণের বিচিত্র সংকটই একটা অভিনয়কে আড়ষ্ট, সারহীন করে তোলে। চরিত্রায়ণের স্বাভাবিকতা বজায় থাকে না। এর ফলে আবার অনেক সময় কেউ কেউ নিজেকে ঢাকবার জন্যে অত্যধিক জোর দিয়ে অভিনয় করেন, অথবা স্বাভাবিক emotion বা আবেগকে চেপে রেখে অভিনয়কে false climax এ তুলতে চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য এই ফাঁকিও দর্শকের চোখে সহজেই ধরা পড়ে যায়, এবং তখন তাঁরা অভিনয়কে হয় বাজে, যাচ্ছেতাই নয়ত বা অতি-অভিনয় (melo-dramatic) বলে রায় দিয়ে বেজার মুখে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

একজন অভিনেতার সব সময় মনে রাখা উচিত যে, তিনি মঞ্চে যে কাজ করবেন, অঙ্গভঙ্গী, চলা-বসা, দাঁড়ান ইত্যাদি, তার কোনটাই অহেতুক নয়। তাঁর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীই চরিত্রের কোন না কোন বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং মঞ্চে অভিনয়ের সময়, একজন অভিনেতা যে সব অঙ্গভঙ্গী, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, ইত্যাদি করেন, তা যেন কখনই অযৌক্তিক না হয়। চরিত্রের সঙ্গে প্রতিটি অভিব্যক্তির কার্যকারণের যৌক্তিকতা আবিষ্কার করা অভিনেতার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। অভিনয়কালে অভিনীতব্য চরিত্রের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাৎ কার্যকারণ সম্পর্ক-বিহীন action, সমস্ত অভিনয়ের তাল-ভঙ্গ করে তাকে বিশ্রী জগাখিচুড়ীতে পরিণত করবে। তাই একজন অভিনয় শিক্ষিচ্ছু ছাত্রের সর্বপ্রধান কর্তব্য হলো সর্বপ্রথম অভিনয়কালীন প্রাথমিক সংকটগুলি অতিক্রমনের উপায় শিক্ষা করা।

প্রখ্যাত প্রযোজক অভিনেতা স্টানিস্লাভস্কি এই সংকটগুলি অতিক্রমনের উপায় হিসেবে কতকগুলি অনুশীলনের তালিকা দিয়েছেন। অভিনয় কল

শিক্ষা করতে যাঁরা উৎসুক তাঁদের সর্বপ্রথম এই অনুশীলনীগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ব করতে শেখা উচিত। পরবর্তী প্রসঙ্গে আমরা স্টানিস্লাভস্কি প্রদর্শিত সেই অনুশীলনীগুলির যথাসাধ্য পরিচয় প্রদান করে, অভিনয় কলা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করবো।

ছয়

ষ্টানিস্লাভস্কির অনুসরণে

কনস্টানটাইন স্টানিস্লাভস্কি অভিনয় কলা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে গিয়ে তাঁর ছাত্রমণ্ডলীকে যে সব আচরণীয় অনুশীলনী পালনের নির্দেশ দান করে-ছিলেন সেগুলি তাঁর মন গড়া কথা নয়; ব্যক্তিগত জীবনে, তা বহু পরীক্ষিত সত্য। অভিনয়ে আড়ষ্টতা, সঙ্কোচ, ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাথমিক সংকটগুলি কাটিয়ে তোলার জন্য এই অনুশীলনীগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ আয়ত্ত করলে অভিনেতারা লাভবান হবেন।

প্রথমে ধরা যাক মনোযোগের কথা। অভিনয় কালে চরিত্রের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য গভীর মনোযোগের সঙ্গে আয়ত্ত করা প্রয়োজন, কিন্তু, সাধারণ ক্ষেত্রে তা যে হয় না অর্থাৎ অভিনেতা যে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন না, তা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখন দেখা যাক এই মনোযোগ কেমন ভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব।

মনোযোগের অভিব্যক্তি কোন বস্তুকে গভীরভাবে দেখার অথবা কোন কিছু খুব প্রগাঢ় ভাবে শোনার মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করা যায়। যখন কোন ব্যক্তি গভীর মনোযোগের সঙ্গে কোন বস্তুকে নীরিক্ষণ করে, তখন তার সারা দেহের পেশীতে একটা সতর্ক ভঙ্গীমার উদ্ভব হয়। তার চোখের দৃষ্টি সেই বস্তুটির প্রতি (object of attention) স্থির নিবদ্ধ থাকে। মুখের পেশীগুলির মধ্যে কোন চঞ্চলতা থাকে না, এবং বাইরে থেকে মনে হয় যেন সে প্রায় বাহ্যজগতের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উদাসীন।

মনে করা যাক, কোন বৈজ্ঞানিকের চরিত্রে একজন অভিনেতাকে অভিনয় করতে হবে। ল্যাবরেটারী ঘরে পরীক্ষা-রত বৈজ্ঞানিকের তন্ময় ভাবের অভিব্যক্তিটি তিনি কি করে প্রকাশ করবেন যদি না কোন একটা বস্তুর দিকে ক্ষণকাল মাত্র তাকিয়েই তিনি সেই বস্তুর প্রতি তাঁর যে আকর্ষণ তা দর্শকমনে জাগিয়ে তুলতে পারেন। গভীরভাবে, বা অভিনিবেশ সহকারে কোন কিছু দেখতে শিক্ষা করার মাধ্যমে মনোযোগ-এর অভিব্যক্তি শিক্ষা করা সম্ভব।

ক্লাব ঘরে সমস্ত অভিনেতারা বসে আছেন। এমন সময় পরিচালকের নির্দেশে একজন উঠে দাঁড়ালেন এবং কোন একটা বস্তু, মনে করা যাক, একটি বই, কি সংবাদ পত্র, তাঁকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে বলা হলো। পরিচালকের নির্দেশে সেই ছাত্রটি যখন চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বইখানি অথবা খবরের কাগজখানি পড়তে সুরু করলেন, তখন অন্যান্য ছাত্রদের বলা হলো তা বেশ ভাল করে দেখতে। তারপর একসময় তাদের প্রশ্ন করা হলো যে ঐ ছেলেটি যখন বই পড়ছিল তখন তার চোখমুখের ভাব কেমন ছিল তা বর্ণনা করো, এবং নিজে তার অনুকরণ করে দেখাও। বলা-বাহুল্য একবারেই তা অনুকরণ করে দেখান হয়ত সম্ভব হবেনা, তখন বার বার তা করতে হবে, এবং অবশ্যই ভুলত্রুটি হলে পরিচালক তা শুধরে দেবেন। এইভাবে বার বার করতে করতে, object of attention-এর প্রতি মনঃসংযোগ করার প্রক্রিয়াটি ছাত্রদের অধিগত হতে থাকবে। আর যতই সেটা মনের সঙ্গে জারিয়ে যাবে, ততই সেটা স্বাভাবিক অভ্যাসে হবে পরিণত, তখন অভিনয়ে আড়ষ্টতা বা অস্বাভাবিকতা আসার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হবে।

কোন বস্তুকে চোখ দিয়ে দেখার মধ্য দিয়ে যেমন, তেমনি কাণে শোনা অথবা হাত দিয়ে স্পর্শ করা, অথবা নাক দিয়ে গন্ধ গ্রহণ করার মধ্য দিয়েও মনোযোগের অভিব্যক্তি আয়ত্ত করা যায়।

কাণে শোনার কথাই ধরা যাক। যত গোলমালই হোক না কেন, কোন বস্তুর প্রতি মনঃসংযোগ যাতে তার জন্য ব্যাহত না হয়, তার জন্য একজন

ছাত্রকে বিশেষরূপে শিক্ষিত করার দরকার। পূর্বের দৃষ্টান্তের কথাই মনে করা যাক, ছাত্রটি যখন মনোযোগের সঙ্গে বই বা সংবাদ পত্র পড়ছে, তখন বাকী সকলকে বলা হলো নিজেদের মধ্যে জোরে জোরে কথা বলো, বা যে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বই পড়ছে তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করো, তার পড়ার ভঙ্গী বা বসার ভঙ্গীর সমালোচনা করো ইত্যাদি। স্বভাবতই এই ধরণের মন্তব্য সুরু হলে পড়তে বিঘ্ন ঘটবে ; কিন্তু যে পড়বে, তাকে সেই বাধা বিপত্তির দিকে নজর দিলে চলবেনা। তার কাজ, তাকে এমন ভাবে করে যেতে হবে, যেন সে ইতিমধ্যে কি কি ঘটলো, তা জানেই না।

এইভাবে স্পর্শেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ইত্যাদির দ্বারা কোন বস্তুর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে সেই আকর্ষণ দর্শকের মধ্যে জারিয়ে দেবার প্রক্রিয়া অভিনয় শিক্ষিচ্ছু ছাত্রকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষা করতে হবে।

ছাত্রদের বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব, তার কৌতুহল, ইত্যাদি আয়ত্ত করার জন্য স্টানিস্লাভস্কি এই ধরণের বহু অনুশীলনের কথা বলেছেন। তার মধ্যে আর একটি হলো 'আয়নার ব্যায়াম, বা mirror exercise. মনে করা যাক, পরিচালক দুজন ছাত্রকে মুখোমুখি উঠে দাঁড়াতে বললেন, এবং তারপর একজনকে আদেশ দিলেন তার মুখমণ্ডলের সাহায্যে যথেচ্ছ ভাবের প্রকাশ করতে ; এবং অপর জনকে বললেন সেই ভাবের হুবহু অনুকরণ করতে ; অথবা স্বয়ং পরিচালক উঠে দাঁড়িয়ে যে কোন একটা কাজের খানিকটা অনুকরণ করলেন। মনে করা যাক, তিনি ঘরে ঢুকেই প্রথমে চারধারে তাকালেন যেন কিছু খুঁজছেন, তারপর সেটা না পেয়ে হতাশভাবে চেয়ারে বসে পড়লেন, তারপর ঘরের কোণে একটা নির্দিষ্ট অংশের দিকে তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি পড়ল, তিনি কয়েক মুহূর্ত সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে সেই দিকে এগিয়ে গেলেন এবং যে বস্তুটি খুঁজছিলেন সেটা যেন অবিষ্কার করলেন ; বস্তুটি হাতে পেয়ে তাঁর চিন্তাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে আনন্দের হাসি পরিব্যাপ্ত হলো, ইত্যাদি।

এই অংশটুকু অভিনয় করার পর একজন ছাত্রকে বলা হলো সেটি হুবহু অনুকরণ করতে। বলাবাহুল্য যে যত মনোযোগের সঙ্গে ব্যাপারটি লক্ষ্য

করেছে সেই তত হুবহু অভিনয়টির অনুকরণ করতে পারবে। না পারলে তাকে আবার দেখিয়ে দিতে হবে। এইভাবে বার বার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ঘটনাটি ছাত্রের আয়ত্তের মধ্যে এসে তার অভিব্যক্তিকে স্বাভাবিক করে তুলবে।

দ্বিতীয় হলো, পেশীর সাবলীলতা শিক্ষা বিষয়ক অনুশীলনী। বাস্তব জীবনে আমরা যে হাসি, কাঁদি, চীৎকার করে কথা বলি, ঝগড়া করি, ভালবাসি, এবং তার ফলে আমাদের পেশীগুলির যে যে পরিবর্তন হয়, সেগুলিকে জোর করে আনতে হয় না বলে, তার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা থাকেনা। কিন্তু অভিনয় কালে এই প্রক্রিয়াগুলি কার্যকরী করে তুলতে গিয়ে অনেক সময়ই অনাবশ্যক ভাবে পেশীগুলির ওপর জোর পড়ে, এবং অভিব্যক্তিটি অস্বাভাবিক হয়ে যায়। অভিনয় অনুকরণ হলেও তা জীবনের অনুকরণ, এবং জীবনের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই, সুতরাং অভিনয়ের মধ্যেও তা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। অথচ প্রথম প্রথম প্রায় অভিনেতার ক্ষেত্রেই যে, এই অস্বাভাবিকত্ব আসে, তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এই অস্বাভাবিকত্ব কাটিয়ে উঠে পেশী সঞ্চালনকে সহজ সাবলীল করার জন্য কতকগুলি অনুশীলনী পালন করা উচিত।

মনে করা যাক, পরিচালক ছাত্রদের মধ্যে একজনকে বললেন চেয়ারে গিয়ে বসো। এই বসে থাকার সময় তিনি দেখবেন যেন কেবলমাত্র বসার প্রয়োজন ব্যতীত, আর কোন অস্বাভাবিক জোর তার দেহের কোন অংশে না পড়ে। বসাটা যেন ঠিক সাবলীল হয়। জোর করে বসিয়ে রেখেছে বলে যেন মনে না হয়। এই শিক্ষার পর তাকে বলা হলো, দেহের অনান্য অংশ যথাযথ রেখে কেবলমাত্র ডান হাতটা তোল। তারপর বাঁ-পাটা তোল, ইত্যাদি। এই ভাবে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনার সময় দেখতে হবে, যেন দেহের অন্য অংশের ওপর তার কোন জোর না পড়ে, এই ভাবে পেশীসঞ্চালনকে স্বাভাবিক করার পদ্ধতি আয়ত্ত করা যায়।

তৃতীয় হলো, যৌক্তিকতার নির্দ্ধারণ। আমরা আগেই বলেছি যে, অভিনয় কালে চরিত্রের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন কোন কাজ অভিনেতা করবেন না যা যুক্তিহীন। তাঁর প্রতিটি action-এর মধ্যে যুক্তির পারম্পর্য অবশ্য রক্ষণীয়।



রক্ত করবী নাটকে
তৃপ্তিমিত্র, শোভেন মজুমদার



নবান্ন নাটকে হারুদত্তের ভূমিকায়
গঙ্গাপদ বসু



দলিল নাটকে ঋত্বিক ঘটক ও মমতা চট্টোপাধ্যায়



স্বর্ণগ্রন্থি নাটকে জোছন দস্তিদার, চিন্ময় ঘোষ দস্তিদার ও শিশির চন্দ

অভিব্যক্তির প্রকাশে যুক্তির পারম্পর্য আনার শিক্ষা নিম্নলিখিতভাবে করা যেতে পারে। মনে করা যাক পরিচালক ছাত্রদের বললেন যে কোন একটা ভঙ্গী (Pose) করতে; এবং তারা তা করল, এর পর তাদের প্রশ্ন করা হলো যে, সেই ভঙ্গী তারা কেন করলো তা ব্যাখ্যা করতে। 'কি করছি' এবং 'কেন করছি।' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই কার্য কারণের যৌক্তিকতা স্থাপন সম্ভব। ধরে নেওয়া যাক পরিচালকের আদেশ অনুসারে ছাত্রদের একজন ডান হাত তুলল, অন্যজন কপালে হাত দিল, তৃতীয় জন জামার পকেট হাতড়াল, চতুর্থ জন আনন্দের হাসি হাসল। এই বিভিন্ন ভঙ্গীগুলি বেশ খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে পরিচালক পঞ্চম ছাত্রকে বললেন সেগুলো অনুকরণ করতে, এবং আরো বললেন যে তার অনুকরণে ঐ ভঙ্গীগুলির যেন যৌক্তিকতা থাকে। অযথা হাত তোলা বা হাসা, বা পকেটে হাত দেওয়া যেন না হয়। বলা বাহুল্য এই কথায় ছাত্র প্রথমটা ঘাবড়ে যেতে পারে। তখন পরিচালক তাকে সেটি বুঝিয়ে দেবেন, যেমন হয়ত, কোন ব্যক্তি বক্তৃতা করতে আসছেন, দর্শকরা তাঁকে দেখে গুঞ্জন করে উঠল, তিনি হাত তুলে তাদের থামালেন, তারপর কি বলবেন একটু ভাবতে গিয়ে কপালে একবার হাত দিলেন, তারপর পকেটে হাত দিয়ে বক্তৃতার বিষয়-বস্তু লেখা একটুকরো কাগজ খুঁজলেন এবং যখন পেলেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল প্রশান্ত হাসিতে ভরে উঠল। এই ভাবে বিভিন্ন ভঙ্গীর মধ্যে একটা যৌক্তিকতা স্থাপিত হলো, এবং যখনই তা হলো, তখনই সমস্ত ভঙ্গী গুলির মধ্যে একটা অর্থের প্রতীয়মান হওয়ায়, তা আর অস্পষ্ট বা অস্বাভাবিক রইল না।

এই ভাবে প্রতিটি ভঙ্গীমা বা অভিব্যক্তির মধ্যে কার্যকারণের সম্পর্ক-সূত্র আবিষ্কারের সাধনার দ্বারা, অভিনয় শিক্ষিচ্ছু ছাত্রের সৃজনী-ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়, আর এই সৃজনী-ক্ষমতা না থাকলে একজন ছাত্র ভাল অভিনেতা হিসেবে কখনই সিদ্ধি লাভ করতে পারে না।

চতুর্থ হলো, মঞ্চ সচেতনতা বা stage consciousness-এর কথা। অভিনয়ের ব্যাপারে stage free কথাটা আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি। বলা বাহুল্য উক্ত শব্দটি স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক অভিনয়ের কথা স্মরণ রেখেই

ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্বাভাবিক জীবনে আমাদের অভিব্যক্তি প্রকাশের কার্য কারণটি বাস্তবরূপেই অবস্থিত থাকে, কিন্তু অভিনয়ের সময় সেটিকে ধরে নিতে হয়, একথা আগেই বলেছি। অভিনয় কালে এই ধরে নেওয়ার ব্যাপারটা স্বাভাবিক করে তুলতে পারলেই অভিনয় ধারায় সহজ সাবলীলত্ব আনা সম্ভব হবে। এই স্বাভাবিকত্ব শিক্ষার জন্য ছাত্রদের মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করে, সেই মত অভিব্যক্তি প্রকাশের শিক্ষা আয়ত্ত করা উচিত।

মনে করা যাক, মঞ্চে যে ঘর সাজান হয়েছে, সেখানে টেবিলের ওপর একটা এ্যাসট্রে রাখা হলো। পরিচালক ছাত্রদের মধ্যে একজনকে ডেকে বললেন যে, ঐ এ্যাসট্রে-টাকে তুমি মনে কর একটি ইঁদুর অথবা ঐরকম জাতীয় একটা কিছু; এবং ড্রইংরুমের টেবিলের ওপর হঠাৎ একটা ইঁদুর দেখলে একজনের মনে যে রকম ভাবের উদয় হয়, ঐ এ্যাসট্রে্টিকে দেখে তুমি সেই সেই ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করো; অথবা একটি আলুর পুতুল হাতে দিয়ে অভিনয় শিক্ষিচ্ছু ছাত্রীকে পরিচালক বললেন, মনে কর এটি তোমার সন্তান; কোন কারণে আঘাত পেয়ে, এ ভীষণ কান্না সুরু করেছে, তুমি একে কোলে নাও এবং ভোলাও, অথবা একে কোলে শুইয়ে চাপড়াতে চাপড়াতে এবং ঘুমপাড়ানী গান গাইতে গাইতে একে ঘুম পাড়াও। সত্যিকারের ইঁদুর না দেখে একটি এ্যাসট্রেকে ইঁদুর বলে মনে করে, অথবা সত্যিকারের ছেলে কোলে না নিয়ে একটি আলুর পুতুলকে সত্যিকারের সন্তান মনে করে, তাকে ঘুমপাড়ানর প্রক্রিয়ার মধ্যে যে মাতৃত্বের অভিব্যক্তি ফোটাতে পারে, সে অভিনেতা হিসেবে সিদ্ধি-লাভ করতে সক্ষম হয়। এই সব অনুশীলনীগুলি নানা ভাবে বার বার পালন করে, তাকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করাই হলো অভিনেতার কাজ। এগুলি করার পর তবে সে যে-কোন চরিত্রে অভিনয়ের উপযুক্ত হয়ে ওঠে, তার আগে নয়।

এই জন্যই অভিনয়ের পথকে বলা হয় বন্ধুর। এ হলো, ধৈর্য, তিতিক্ষা, আত্মসংযম, এবং কঠোর তপস্যার পথ। বড় বড় পরিচালকেরা যে অভিনয় শিক্ষিচ্ছু ছাত্রদের কোন ভূমিকা না দিয়ে দিনের পর দিন বসিয়ে রাখেন, তা উদ্দেশ্যহীন নয়। এই বসে থাকার মধ্য দিয়ে সেই ছাত্রের ধৈর্য, সংযম,

ইত্যাদি গুণাবলী কতখানি আয়ত্তের মধ্যে আছে, তাই তিনি লক্ষ্য করেন দিনের পর দিন। যে ছাত্র এই নীরব পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারে তাকেই তিনি আদর করে কাছে টেনে নেন, সুরু হয় শিক্ষা, আর যে পারে না, তার প্রতি নাট্যাচার্য নির্মম, সে থাকুক, বা চলেই যাক, সে বিষয়ে তিনি খুব মাথা ঘামান না। কেননা ধৈর্যহীন ব্যক্তির পক্ষে অভিনয় শিক্ষা কোন কালেই সম্ভব হবার নয়।

মূলকথা হলো ধৈর্য এবং তিতিক্ষার সঙ্গে জীবন-ছন্দের সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাত গুলি বিশ্লেষণাত্মক মনোভঙ্গীর সাহায্যে দর্শন করা, এবং সেগুলিকে নানা ভাবে, তাদের স্বাভাবিকত্ব বজায় রেখে, অনুকরণ করা। অভিনয় শিক্ষার আগে এই শিক্ষাই হলো অভিনেতার প্রাথমিক কার্য। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, তিনি কি করছেন, কেন করছেন, এবং কি ভাবে করছেন। এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর যদি তিনি স্ব-অনুকৃত প্রকাশভঙ্গীর যৌক্তিকতার উপস্থাপনার মাধ্যমে দিতে পারেন, তাহলে তাঁর অভিনয়-কলা আয়ত্বের পথ অনেকখানি সুগম হবে।

এর পর হলো সেই অভিব্যক্তিতে ব্যঞ্জনার প্রয়োগ। যেটা কোন শিক্ষার দ্বারাই হওয়া সম্ভব নয়। আর তন্ময় রসোপলব্ধি (twilight zone) বলতে যা বোঝায় তার কথা আরো পরে। সেগুলো হলো শিল্পের perfection-এর ব্যাপার। অনন্ত জীবন বৈচিত্র্যকে অনুধাবন করে, তারপর তার মধ্যেকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব তরঙ্গগুলিকে মনের অনুভূতির সাহায্যে জারিয়ে তুলে, সেই বিশেষ অনুভূতিকে সামান্যে পরিণত করা সহজ সাধ্য নয়। তা যখন হয় তখন আর অভিনেতা কেবলমাত্র অনুকর্তা নটের সীমানায় আবদ্ধ থাকেন না, তখন তিনিই হয়ে উঠেন স্বয়ং স্রষ্টা।

অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনাগত প্রকাশের ব্যাপার এবং অভিনেতার মনন ও পরিমিতি বোধ ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি মত যথাসাধ্য আলোচনা করেছি, সুতরাং এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

প্রযোজনা

ষষ্ঠ অধ্যায়

এক

প্রযোজনা ও প্রযোজক

নাটকের প্রাণবস্তু হলো অভিনয়; কিন্তু এই অভিনয় কলাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে সর্বসাধারণে পরিবেশন করতে চাই প্রয়োগ-নিপুণতা। সৌন্দর্য বস্তুটা পরিবেশ সাপেক্ষ। যখনই কোন একটি বস্তুকে সুন্দর বলে মনে হয় আমাদের, তখনই বুঝতে হবে যে, যে পরিবেশের মধ্যে সেই বস্তুটি পরিস্ফুটিত, সেটি আমাদের মনের কোন এক বিশেষ ক্ষণের, বিশেষ ভাবকে,দোলা জাগাতে সক্ষম হয়েছে। স্বাভাবিক সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে এই পরিবেশ রচনার কাজটি প্রকৃতি নিজে হাতেই করে রাখেন। কিন্তু সৌন্দর্য রচনা করতে গেলে মানুষকে এই পরিবেশটিও সৃষ্টি করে নিতে হয়। ফুল যখন লতাকুঞ্জের শ্যামল চেলাঞ্চলের অবগুণ্ঠনে প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে, তখন তাকে আমাদের আপনা থেকেই ভাল লাগে; কিন্তু তাকে গাছ থেকে তুলে নিয়ে ফুলদানীতে রাখার সময় প্রয়োজন হয়—বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে সাজাবার। যেমন তেমন করে একগুচ্ছ ফুল ঘরে ফেলে রাখলেই তা ভাল লাগেনা।

নাটক-কে ও এই ভাবে সাজাতে হয়। নাটকের কাব্য শরীরে নাট্যকার যে সব স্থান, কালের নির্দেশ দিয়ে বিষয়-বস্তুকে অভিব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন, সেগুলিকে যথাযথ রূপায়িত করে, তার মধ্য দিয়ে নাট্যবস্তুর ভাব-রূপটিকে বাস্তবরূপে প্রকাশ করার জন্য, নাট্যকার বর্ণিত ঘটনার পরিবেশগুলি, মঞ্চের নির্দ্ধারিত সীমায়তির মধ্যে সৃষ্টি করে নিতে হয়। এই পরিবেশ রচনার জন্য কেবলমাত্র তাই অভিনয়ের ওপর নির্ভর করলেই চলেনা, তার জন্য প্রয়োজন হয় আনুসঙ্গিক অন্যান্য উপকরণের।

সেই উপকরণগুলি হলো যথাক্রমে,

ক ॥ মঞ্চসজ্জা

খ ॥ আলোক নিয়ন্ত্রণ

গ ॥ আবহ সঙ্গীত

ঘ ॥ রূপসজ্জা

নাটকের আঙ্গিক বলতে আমরা সাধারণভাবে নাট্যাভিনয়ে পরিবেশ সৃষ্টিকারী এই সব উপকরণগুলিকেই বুঝে থাকি। যে কোন নাটক অভিনয় করতে গেলেই উল্লিখিত উপকরণগুলির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তাই নাটক যিনি বা যাঁরা অভিনয় করবেন, তাঁদের এই উপকরণগুলির কার্যকারীতা সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন। এই গুলি সম্পর্কে সতর্ক থেকে নাটকীয় বিষয় বস্তুর সম্বন্ধে বিশেষরূপে জ্ঞাত হয়ে ; তাকে সহজভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে বিকশিত করে তোলার জন্য আনুসঙ্গিক আরো অনেক কিছুর সঙ্গে, এই উপকরণ বা উপাদানগুলিকে যিনি যথাযথ প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারেন, তিনিই প্রযোজক। আর সমগ্র নাট্যাভিনয় যখন এগুলির সমন্বয়ে এক ছন্দবদ্ধ রূপশ্রী ধারণ করে, তখনই তাকে বলা যায় সার্থক নাট্য প্রযোজনা।

নাটকের বিষয় বস্তু বা কাব্য-শরীরকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে সাজিয়ে তুলে তার অন্তর্নিহিত ভাবরূপ বা রসবস্তুটিকে সহৃদয় সামাজিকের সামনে উপস্থাপিত করে, এবং তদ্বারা রসবেত্তা সামাজিকের মনে রসম্বোধন করে, তাঁদের আপ্লুত করে তোলা, নাট্যবস্তুর সঙ্গে সুসম আঙ্গিক প্রয়োগেই সম্ভব। কেননা ভাববস্তুর ব্যঞ্জনায় এইগুলিই অলঙ্করণের কাজ করে। অবশ্য এক্ষেত্রে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, তাহলো এই যে, নাটকের মধ্যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য থাকা চাই। অলঙ্করণের দ্বারা স্বাভাবিক সৌন্দর্য আরো ব্যঞ্জনাময় হয়ে প্রকাশিত হতে পারে, কিন্তু যা সুন্দর নয়, তাকে সাময়িক ভাবে মনোহারী করা সম্ভব হলেও, সুন্দর করে তোলা যায় না। সুতরাং আঙ্গিকের ব্যাপারটা সার্থক শিল্পবস্তুর সঙ্গেই জড়িত।

আধুনিককালে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে আঙ্গিকের প্রয়োজন কতখানি,

বা আদৌ আছে কিনা তা নিয়ে নানা প্রকার বিসংবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিসংবাদের নিরাকরণ হয়ত এখনই সম্ভব নয়, কেননা আধুনিক কালে নাট্যপ্রযোজনা এবং তার অভিনয়-আঙ্গিক সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা যতই বেড়ে চলেছে, ততই তার উপস্থাপনার রীতিগত বৈচিত্র্যও সৃষ্টি হচ্ছে নানা প্রকরণের প্রয়োগ মাধ্যমে। তথাপি নাটকের সামগ্রীক আলোচনায় অঙ্গ এবং আঙ্গিকের বিতর্ক সম্পর্কে কিছু কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যায়। কিন্তু তৎপূর্বে আঙ্গিকগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশ সৃষ্টিতে তারা কিভাবে সাহায্য করে সে সম্পর্কে অবহিত হয়ে নেওয়া দরকার।

দুই

প্রযোজনার উপকরণ

ক ॥ মঞ্চসজ্জা

নাট্য প্রযোজনার আলোচনায় প্রথমেই মঞ্চ-সজ্জার কথা ধরা যাক। মঞ্চসজ্জা হলো নাটকীয় পরিবেশ রচনার সর্বপ্রধান উপকরণ।

সাহিত্য জীবন সঞ্জাত, এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বিধৃত করেই সাহিত্যকার সেই জীবনকে রূপায়িত করেন। সাহিত্য পাঠের সময় সেই পরিবেশ পাঠকের কল্পনার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। সমগ্র দৃশ্যমণ্ডলটি সহৃদয় পাঠক মনে মনে কল্পনা করে নিয়ে, তার মধ্যে বিচরণ করেন। সাহিত্যিকের বর্ণনার গুণ যে, পাঠকের কল্পনাকে উজ্জীবিত হতে সাহায্য করে সেকথা বলাই বাহুল্য।

নাটকে কিন্তু তা করার সম্ভাবনা নেই, কেননা পঠণ নয়, দর্শনের মধ্য দিয়েই নাট্যকলার "রসসৌন্দর্য প্রতিভাত হয়। সুতরাং নাট্যকার নাটকের দৃশ্যসজ্জার যে বর্ণনা করেন, সেগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকা দর্শকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর বর্ণনীয় বিষয়টিকে প্রযোজক বাস্তবায়িত করেন; abstract কে concrete করে দর্শকের কল্পনার সামনে হাজীর

করেন। তাই নাট্যকার বর্ণিত দৃশ্যগুলির বাস্তব রূপদান করা অভিনয় কালে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

যাত্রা নাটকে অবশ্য এর কোন প্রয়োজন নেই। সেখানে নাটকীয় পরিমণ্ডল রচনার ভার থাকে দর্শকের কল্পনার ওপর। ফাঁকা জায়গায় অভিনয় হলেও, অভিনীত স্থানের দৃশ্যটি সংলাপের মাধ্যমে বুঝে নিয়ে দর্শকশ্রেণী সেই স্থানটি কল্পনা করে নেন। যেমন ধরা যাক কৃষ্ণ যাত্রায় কথা। যমুনা পুলিনে কেলি কদম্বমূলে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধিকার প্রণয়লীলার দৃশ্য রচনায়, যাত্রাকার যমুনা পুলিন, কেলীকদম্ব, ইত্যাদি কিছুই রচনা করেন না। সংলাপের মধ্যদিয়েই সেটি দর্শককে তিনি বোঝার সুযোগ দেন, আর সেই অবসরে নিজ কল্পনার রঙ দিয়ে দর্শক যমুনা পুলিন, কেলীকদম্ব, ইত্যাদি সৃষ্টি করে নেন।

প্রাচীন সংস্কৃত নাটকেও দৃশ্যপট রচনার বহুল ব্যবহার ছিল না; যদিও মঞ্চে পরিবেশ রচনার জন্য বিভিন্ন আসবাব পত্রের আমদানী করা হতো। দেশীয় যাত্রা বা সংস্কৃত নাটকের এই ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে মঞ্চে দৃশ্য রচনার ব্যাপারে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে নাট্যাভিনয়ে দৃশ্য রচনার পক্ষপাতী নন। তাঁদের মতে নাটকীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টির ভারটা দর্শকের কল্পনার ওপর ছেড়ে দেওয়াই বিধেয়; কেননা মঞ্চে প্রকৃতির অনুরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। পাহাড়, বা নদী, বা সমুদ্র ইত্যাদি যথাযথ ভাবে মঞ্চে যখন দেখান সম্ভব হয় না, তখন তাদের অনুকরণে দৃশ্যপট অঙ্কন করলে একদিকে যেমন সেগুলি যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টিকারী না হয়ে হাস্যকর হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি তাবৎ মানুষের কল্পনার প্রসারতাকেও খাটো করে দেয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নাট্য প্রযোজনায় এই ধরণের অবাস্তব দৃশ্য রচনার বিরোধী ছিলেন।

কিন্তু মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত থাকলেও, থিয়েটারী নাটকে মঞ্চসজ্জার ব্যাপারটা প্রায় সকলেই স্বীকার করে থাকেন। এবং শত বিভেদ সত্ত্বেও দৃশ্যসজ্জার পদ্ধতিটা চলেই আসছে সর্বদেশে, যদিও রীতি প্রকরণের পরিবর্তন হয়েছে অনেক। তাই থিয়েটারের আলোচনায়

মঞ্চের দৃশ্যসজ্জার অবস্থানের কথা স্বীকার করে নিয়েই এর প্রয়োজনের কথা আমরা আলোচনা করবো।

যে কোন একটি নাটক হাতে নিলেই দেখা যাবে যে, তার ঘটনা-বস্তু বিভিন্ন অঙ্কের মধ্যে বিভক্ত। আবার এই অঙ্কগুলি এক বা একাধিক দৃশ্যমালার মধ্যে খণ্ডিত। এই দৃশ্যগুলি নাটকীয় ঘটনা সংস্থানের নির্দেশিকা। কোন একটি ঘটনা নদীতে, পাহাড়ে, বনে, আকাশে, ট্রেনে, জাহাজে, অথবা ড্রইংরুমে, ইত্যাদি কোথায় ঘটছে এই দৃশ্যগুলির মধ্যে থাকে তারই নির্দেশ; এবং নাট্যকার কেবলমাত্র নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন না, সেই দৃশ্যের কোথায় কি আছে, ইত্যাদির খুঁটিনাটি পরিচয় দিয়ে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টাও করেন। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে, নাট্যকার দৃশ্যগুলির যত বর্ণনাই দিন অভিনয়ের সময় দর্শকের সেগুলি কোন কাজে লাগেনা। নাট্য প্রযোজক সেই বর্ণনা অনুসরণ করে দৃশ্য রচনা করেন।

মঞ্চে এই দৃশ্য রচনার দুটো ভাগ আছে। একটা হলো requisite অর্থাৎ আসবাবপত্র; আর একটা হলো scene বা দৃশ্যপট। ধরা যাক কোন একটি নাটকের কোন একটি ঘটনা, এক ড্রইংরুমের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে। প্রথমে মঞ্চের ওপর ঘরের দেওয়াল, জানালা, দরজা ইত্যাদি ক্যানভাসে এঁকে, অথবা কাঠ দিয়ে কেটে তৈরী করে দাঁড় করানো হলো, তারপর সেই ঘরের মধ্যে টেবিল, চেয়ার, সোফা, বুককেস, টিপয়, তার দেওয়ালের ছবি, ঘড়ি, জানলা, দরজার পর্দা, ইত্যাদি দিয়ে সেই ঘরখানিকে সাজানো হলো। এই শেষোক্ত বস্তুগুলিকেই বলা হয় stage requisite, অর্থাৎ মঞ্চে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার্য দ্রব্য-সম্ভার। সীন বা সেটের মত এই requisite বা মঞ্চ ব্যবহার্য দ্রব্যগুলোও দৃশ্যরচনার পরিবেশ সৃষ্টির উপকরণ। নাটকের স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে, নাট্যপ্রযোজক এগুলির সাহায্যে নাট্যকারের বর্ণনা অনুযায়ী যথাযথভাবে দৃশ্য-সজ্জা করেন।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, তাহলো এই যে, শুধুমাত্র দৃশ্য সাজানর জন্যই নাটকে scene বা সেটের ব্যবহার করা হয় না। নাটকীয় বস্তুর অন্তরের ভাবটি সুপ্রকাশিত করতে এই সীন বা সেট কতখানি সচেতন অংশ

গ্রহণ করলো, সেটাও ভেবে দেখার দরকার। মঞ্চের দৃশ্য অথবা আসবাব পত্রও মূক অভিনেতা। তারাও অভিনয় করে এবং সেই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনী-বস্তুকে সম্প্রসারিত করে। একটা উদাহরণ দিই। স্বনামখ্যাত প্রযোজক শম্ভু মিত্র পরিচালিত 'পুতুলখেলা' নাটকটি অনেকেই দেখেছেন, এই নাটকের দৃশ্য-সজ্জার খুঁটিনাটির কথা বাদ দিয়ে শুধু ঘরের দরজা জানালার পর্দা, বিছানার চাদর, টেবিল-ক্লথ, ইত্যাদির কথা মনে করুন। নাটকের প্রথমে যখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটি খুব উচ্ছল এবং প্রাণবন্ত, তখন এই সব পর্দায় বা চাদরে খুব উজ্জল রঙ ব্যবহার করা হয়ে ছিল। কিন্তু যখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটি নাটকীয় ঘটনার অনিবার্যতার ফলে ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর হতে হতে, অবশেষে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের সম্মুখীন হতে চলেছে, তখন ঐ একই ঘরের পর্দা বা চাদরের রঙও গেছে বদলে। উজ্জল রঙের পরিবর্তে প্রযোজক সেখানে জালের মত প্যাটার্ণে বোনা পর্দা ব্যবহার করেছেন। মাকড়সার জালের মত দেখতে পর্দা বা চাদর, উক্ত দৃশ্যে কেবল মাত্র ঘর সাজানর আধুনিক উপকরণ হিসেবেই আসেনি, ঐগুলি স্বামী-স্ত্রীর মানস জটিলতার প্রতীক হিসেবেই অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এখানে নট-নটীর মত ঐ পর্দা বা চাদর এরাও অভিনেতা। তাদের মৌন উপস্থিতি নাটকের সংঘাতকে নিঃসন্দেহে রূপায়িত করে প্রযোজনাকে শক্তিশালী করেছে।

তাই বলছিলাম মঞ্চের দৃশ্য-সজ্জা কেবলমাত্র ঘর সাজানর উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় না, তা হলো নাটকের অঙ্গীভূত, এবং নাট্যরসের অভিব্যঞ্জনায় সাহায্যকারী। সার্থক প্রযোজক দৃশ্যসজ্জার এই মৌন উদ্দেশ্য সম্পর্কে সদাসর্বদাই সতর্ক থাকেন।

নাটকের প্রযোজনা শিল্প নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা নীরিক্ষার ফলে, দৃশ্যসজ্জার রীতি-প্রকরণ নিয়ে নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদগুলিকে realism, symbolism, impressionism ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। প্রযোজনার ইতিকথা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

খ ॥ আলোক সম্পাত।

দৃশ্যসজ্জার পর, নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো, আলোর কথা। এককালে যখন বিদ্যুতের আবিষ্কার হয়নি, তখন নাটক অভিনয় হতো দিনের বেলা, প্রখর সূর্যালোকের নীচে। সে সময়ে নাটকে আলোক সম্পাতের প্রশ্ন স্বভাবতই অবান্তর ছিল।

কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রমাগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যখন বিদ্যুতের আবিষ্কার হলো, প্রয়োজন মত সূর্যের আলো-কে ধরে রেখে, তাকে দিয়ে নিজের কার্য সিদ্ধি করতে শিখল মানুষ, তখন অন্যান্য কাজকর্মের মত নাটকেও সেই শিক্ষার নিয়োজন করল তারা। বাইরের চত্বর ছেড়ে প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে উঠে এলো নাটমঞ্চ। দিন ছেড়ে রাত্রিতেও অভিনয় হতে আর বাধা রইল না। কেননা মানুষ অন্ধকারকে জয় করেছে। আলোর শত বর্ণ-বিচ্ছুরিত বর্ণালী রঙীন করে তুলেছে তার কল্পনালোক।

আলোর প্রয়োজন নাটকে দু'রকম। প্রথমত আজকাল দিন ছেড়ে রাত্রিকালে অভিনয় হয়, এবং দিনে অভিনয় হলেও, তা প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারের মধ্যেই হয়ে থাকে, সুতরাং আলোর সাহায্যে সেই অন্ধকার দূর করে, নাট্যবস্তুকে দৃশ্যমান করে তোলা এবং নাট্যাভিনয়ে যে দৃশ্যসজ্জা বা নটনটীর রূপসজ্জা করা হয়, তার অবাস্তবতা দূর করে দর্শক মনে বাস্তব-বিভ্রম সৃষ্টি করা। নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই বস্তু-বিভ্রম সৃষ্টি করাই হলো আলোর প্রধান কাজ। চড়া রঙের মেক-আপ বা রূপসজ্জা, সাধারণ চোখে নিতান্তই অবাস্তব। কিন্তু অভিনয়ের কালে এই মেক-আপ না থাকলে চলেনা। অভিনেতার চোখেমুখে বিভিন্ন দাগ (shades) টেনে তাঁর বয়স, বা চরিত্রের আন্তর-প্রবণতা ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা হয়, কিন্তু আলোর মরীচিকা যদি সেই উজ্জল রঙের ছাপকে ঢেকে না দিতে পারে, তাহলে রূপসজ্জা অবাস্তব বলে মনে হয়ে, আসল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ করে দিতে পারে।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় হতো, তখন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের বয়স ছিল তিরিশের এপারে। সেই সময় উক্ত নাটকে বৃদ্ধ প্রধান সমাদ্দার চরিত্রে তিনি অভিনয় করতেন। বলা বাহুল্য উক্ত চরিত্রের অনুযায়ী

বয়সের ছাপ তখন তাঁর চোখেমুখে আসেনি। তাই বিজনবাবু বৃদ্ধের রূপসজ্জায়, গাঢ় করে বার্লি করে নিয়ে, সেই বার্লি খুব পুরু করে মুখে মাখতেন, এবং সেগুলো শুকিয়ে গেলে, চাকলা উঠে যে সব রেখার সৃষ্টি করতো, রঙ দিয়ে সেগুলোকে উজ্জল করে মুখে বয়সোচিত রেখা নিয়ে আসতেন। মুখের ওপর শুকনো বার্লির ফাটা চটা দাগ, এমনিতে অস্বাভাবিক দেখানরই কথা ; কিন্তু আলোর মায়াজাল, সেই অস্বাভাবিকত্ব মুছে দিয়ে একটি বৃদ্ধের বলীরেখাঙ্কিত মুখকেই প্রকটিত করতো।

দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারেও এই একই কথা। মঞ্চে যে দৃশ্য তৈরী করা হয়, তা realistic, impressionistic, বা symbolic যাই হোক না কেন, সেগুলি সাধারণত হাল্কা কাঠে, চট বা ক্যানভাস জাতীয় বস্তু এঁটে রঙ করে তৈরী করা হয়। এই অঙ্কনে শিল্পী রঙের সাহায্যে যে সব shades-এর সৃষ্টি করেন, আলোক-প্রক্ষেপ সেইগুলোকেই উজ্জল করে সমগ্র দৃশ্য-পরিমণ্ডলকে বাস্তব রূপ দান করে। অর্থাৎ আঁকা দৃশ্যপট গুলিকেও বাস্তব বলে ভ্রম হয় দর্শক সাধারণের। এ ছাড়াও নদী, আগুন, বিদ্যুৎ, রামধনু, ইত্যাদির সৃষ্টি করে, নাট্য-দৃশ্যের পরিমণ্ডলটিকে বাস্তবানুগ করে তোলার কাজ তো আছেই।

কিন্তু এগুলো ছাড়াও আলোর আর একটি কাজ আছে। সেও অভিনেতা। দৃশ্যপটের মত, অভিনেতাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আলোও অভিনয় করতে পারে। তারও একটা নিজস্ব ভাষা আছে। বিখ্যাত আলোক-শিল্পী তাপস সেন একদিন মিনার্ভা মঞ্চে কোন একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে আলোর এই ভাষার কথা বলেছিলেন। রঙের সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে আলো কথা বলে অভিনেতার মানস ভঙ্গীকে দর্শকের সামনে প্রাঞ্জল করে দেয়। 'তিতাস একটি নদীর নাম' নাটকে হোলী উৎসবের দৃশ্যটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। উক্ত দৃশ্যে উন্মত্ত কিশোরকে যখন তার স্ত্রী অনন্তর মা পূর্বকথা স্মরণ করানর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে, এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কিশোরের মনে যখন সুরু হয়েছে অতীত স্মৃতিচারণের দুরন্ত প্রয়াস, তখন সেই প্রয়াসের প্রকাশটিকে আলোকের সাহায্যে অপরূপভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাপস সেন। এখানে আলোক

কেবলমাত্র মঞ্চসজ্জার উপকরণ হয়েই নেই; অভিনেতার অভিব্যক্তির সঙ্গে মিশে গিয়ে সেও অভিনেতার আসন গ্রহণ করেছে।

গ ॥ আবহ-সঙ্গীত।

নাট্য-প্রযোজনার তৃতীয় উপকরণ হলো আবহ-সঙ্গীত। পরিবেশ সৃষ্টি করার পক্ষে সঙ্গীতের মত উপযুক্ত উপকরণ বোধকরি আর কিছু নেই। মনের ভাব প্রকাশের জন্যই সুরের সৃষ্টি করেছে মানুষ; আর আবহমানকাল ধরে এই সুরের দোলায় যে সৃষ্টি করেছে অপরূপ সৌন্দর্য সুষমার।

হিন্দু সঙ্গীত প্রকৃতির বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রাগরূপ কেন্দ্র করেই গঠিত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্তে, প্রকৃতি যখন যে যে রূপে সজ্জিতা হয়, ভারতীয় সুরকার সুরের মাধ্যমে তার সেই সবকটি রূপ ধরে রেখে দিয়েছেন। সকালের রঙ, বিকেলের রঙ, এই প্রকৃতিতে পৃথক, আর এই পার্থক্য বিভিন্ন mood-এর সৃষ্টিকারী। হিন্দুসঙ্গীত সেই সব mood গুলো প্রকাশে সার্থক।

মার্গ সঙ্গীতের আসরে ভৈরবী, বাহার, পূরবী, পিলু, বসন্ত, হিন্দোল, ছায়ানট, ইত্যাদি যত রাগরূপের পরিচয় পাই, সেগুলি এই প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ-রঙের বর্ণ-বিচ্ছুরণে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত। মানব মনের অন্তর্নিহিত ভাবের অভিব্যক্তি কেন্দ্র করে; নাট্য-প্রযোজনায় সুরভিজ্ঞ ব্যক্তি যখন এই রাগ-রাগিণীগুলি কাজে লাগান, তখন নাটকীয় মুহূর্ত আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়ে দর্শক মানসকে রসাপ্লুত করে। নাট্যপ্রযোজনায় আবহ সঙ্গীতের যোজনা এই mood সৃষ্টি করে অভিনয়কে প্রাণবন্ত করবার জন্যে।

তবে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, তাহলো এই যে, নাটকের আবহ-সঙ্গীত বলতে কেবল মাত্র রাগ-রাগিণীর আলাপকেই আমরা বুঝিনা। এগুলি ছাড়াও, প্রকৃতির মাঝে প্রতিনিয়ত যে সব শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে, সেগুলিও আবহ-সঙ্গীত রচয়িতার আকর্ষণের বিষয়। পাখীর কলকাকলী, জলের কলোচ্ছ্বাস, ট্রেণের শব্দ, ইস্পাতের টুং টাং, কলকারখানায় যন্ত্রের গর্জ্জন, ইত্যাদিও নাটকের আবহ-সঙ্গীত রচনার পর্যায়ে পড়ে। 'সেতু'

নাটকে চলমান ট্রেণের শব্দ, কিম্বা 'অঙ্গার' নাটকে খনিগর্ভে জল ঢোকার সময় জলের কলোচ্ছাস, কিম্বা 'রক্তকরবী' নাটকের প্রারম্ভে যন্ত্রপাতির আওয়াজ ইত্যাদিকেও effect সৃষ্টিকারী আবহ-সঙ্গীতের পর্যায় ফেলাই বোধ করি সঙ্গত।

ঘ ॥ রূপসজ্জা

রূপসজ্জা বা make up হলো নাট্য প্রযোজনার আর একটি বিশেষ উপকরণ। ক্যানভাসের গায়ে ছবি ফুটিয়ে তুলতে যেমন রঙের দরকার, অভিনেতার দেহে, অন্য আর একটি চরিত্রের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতেও তেমনি রূপসজ্জার প্রয়োজন। নানা বর্ণের রঙ মেখে, গোঁফ-দাড়ী, চুল ইত্যাদি পরে অভিনেতা নিজের মধ্য দিয়ে একটি চরিত্রের বাস্তব রূপটি ফুটিয়ে তোলেন।

প্রাচীন কাল থেকেই অভিনয় ব্যাপারে রূপসজ্জার প্রচলন ছিল। সেই চর্যার যুগে যখন মসকরা বা তামাসার দল হাটে মাঠে বুদ্ধ নাটক গান গেয়ে বেড়াত তখন তারা রূপসজ্জা গ্রহণ করতো, একথা চর্যা পদের মধ্যে উল্লিখিত আছে দেখতে পাই। মসকরার দল যে "নড়পেড়া" বা নটপেটিকা সঙ্গে নিয়ে বেড়াত, তার মধ্যেই থাকতো তাদের নাটকোপযোগী সাজ পোষাক এবং অঙ্গ রচনা অর্থাৎ রূপসজ্জার উপকরণ। সংস্কৃত নাটকের যুগে, মঞ্চে দৃশ্য পটের ব্যাপক ব্যবহার না থাকলেও রঙ তুলি দিয়ে রূপসজ্জা গ্রহণের ব্যাপক প্রচলন ছিল, শ্রী মনোমোঁহন ঘোষ তাঁর প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা গ্রন্থে, ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রে এই রূপসজ্জার যে বিবরণ আছে, তার থেকে কিছুটা উল্লেখ করেছেন। কৌতুহলী পাঠকদের জন্য আমরা সে অংশটুকু নিচে উদ্ধৃত করে দিলাম। শ্রীঘোষ লিখেছেন ;

> "... ...অঙ্গ রচনায় এক প্রধান অংশ ছিল মুখ হাত আদিতে রঙ মাখানো অর্থাৎ একালের ভাষায় যাকে বলে পেন্টিং। সেকালকার পেন্টিং এ যে প্রধান রঙ গুলি ব্যবহৃত হতো উপাদান সমেত তাদের নাম নিচে দেওয়া যাচ্ছে—

পাণ্ডুবর্ণ = নীল + শ্বেত
পদ্মবর্ণ = রক্ত + শ্বেত
হরিৎ (সবুজ) = নীল + পীত
কষায় = নীল + রক্ত
গৌর = রক্ত + পীত।"

এই ধরনের রঙ ব্যবহার করার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল অভিনেতার মধ্যে ভিন্ন ব্যক্তিত্বের আরোপ। এছাড়াও ছিল দাড়ী গোঁফের ব্যবহার আর মুখোশের প্রচলন। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমক নাট্যকলাতেও যে মুখোশ-এর ব্যবহার ছিল, একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে make-up-এর জন্য মুখোশের ব্যবহার আদিম কাল থেকেই চলে আসছে। রঙের প্রাধান্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই মুখোসের বিলোপ ঘটেছে, যদিও কোন কোন শিল্প-প্রকরণে মুখোশের ব্যবহার এখনও আমরা করে থাকি।

যেমন ছৌ-নাচ, বা আদিবাসীদের যাত্রা-পালায় আজও মুখোশের ব্যাপক ব্যবহার আছে। বাঁকুড়া অঞ্চলে কংসাবতী নদীর ওপারে যে আদিবাসীদের কিছু গ্রাম আছে, সেখানে উৎসব আনন্দ উপলক্ষে যে সব পালার প্রচলন আছে, তাতে মুখোশের ব্যবহার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবেই মনে করা হয়।

কিন্তু সে যাই হোক, রূপসজ্জার মূল ব্যাপারটা তাহলে হলো অভিনেতার দেহে ভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিত্বের আরোপ এবং তদ্দ্বারা তাঁর অভিব্যক্তিকে সুস্পষ্ট করে সাধারণ্যে বোধগম্য করে তোলা। কেমন করে মেক-আপ করতে হয়, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, এটুকু মনে রাখতে হবে যে, নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই রূপসজ্জার প্রয়োজনীয়তা যেমন বিশেষ জরুরী, তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তি চরিত্র দর্শন করে, তাদের অভিব্যক্তির প্রকাশ রীতিটি তুলির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাও কঠিন। রূপসজ্জা দেবার সময় প্রযোজককেই যে এগুলি করতে হবে তা নয়,তবে ব্যক্তি চরিত্রের অভিব্যক্তি প্রকাশের রীতিটি তাঁর জানা না থাকলে তিনি রূপসজ্জা সম্পর্কে নির্দেশ দিতে অসমর্থ হবেন।

নাটকে রূপসজ্জার প্রয়োজন এবং রূপসজ্জা গ্রহণ সম্পর্কে অভিনেতাকে কোন কোন বিষয়ে সচেতন হতে হবে, সে বিষয়ে 'বহুরূপী' বিদ্যা প্রবন্ধে নটগুরু গিরিশচন্দ্র যা বলেছেন তা প্রসঙ্গত স্মরণীয়। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

> "অভিনেতার ধ্যানের মূর্তি অভিনেতার প্রকৃত মূর্তি নয়। সাজের সাহায্যে তাঁহার শরীরে ধ্যানের মূর্তি যতদূর প্রকাশ পায়, নিশ্চয় তাঁহাকে তাহা করিতে হইবে। রং, পরচুলা, মোম ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির সাহায্যে এতদূর মূর্তির পরিবর্তন হওয়ার সম্ভব যে, পরিবর্তিত মূর্তিতে পরমাত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে চেনা যাইবে না। একজন সুন্দর পুরুষ কাফ্রী সাজিয়াছে, কালো রং-এ রং ঢাকিয়াছে। নাকের অগ্রভাগ দড়ি দিয়া তুলিয়া দড়ি রং-এর সহিত মিশাইয়া দিয়া কাফ্রীর নাসিকা করিয়াছে, গালের হাড় মোম দিয়া উঁচু করিয়াছে, মোম দিয়া ঠোঁট পুরু করিয়াছে, কোঁকড়া পরচুলা পরিয়াছে, পোষাকও কাফ্রীর মত। কাফ্রীর চলন অনুকরণ করিয়াছে ; ইহাতে সহজে তাহাকে চেনা কোন মতেই যায় না।"

গিরিশচন্দ্রের এই সুদীর্ঘ উক্তি যে, অভিনয় কালে রূপসজ্জা গ্রহণের কি প্রয়োজন তাই পরিস্ফুট করেছে তা নয় ; তাঁর সময়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনেতারা কি ভাবে রূপসজ্জা গ্রহণ করতেন, তারও একটি মনোজ্ঞ বিবরণ আমরা এই উক্তিটির মধ্যে পাই। উল্লিখিত উদ্ধৃতির মধ্যে যে কাফ্রীর মেক-আপ বা রূপসজ্জার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে, খুব সম্ভবত তা "ধীবর ও দৈত্য" নাটকে কাপ্তেন বেলবাবু'র অভিনয় উপলক্ষ্য করে বর্ণিত। কিন্তু সে যাই হোক, নাটকের রূপসজ্জা শুধু মাত্র সাজবার জন্যেই অভিনেতারা গ্রহণ করেন না। এই রূপসজ্জা গ্রহণের সময় দর্শকের কথাটাও তাঁর মনে রাখা অবশ্য প্রয়োজন। মেক-আপ অথবা রূপসজ্জার সঙ্গে দর্শকের কি যোগাযোগ, এই প্রসঙ্গের আলোচনায় উক্ত প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র বলেছেন,

> "অভিনেতা কুরূপই সাজুক, বা সুরূপই সাজুক, এমন কি ভিখারী সাজিলেও যে সাজে দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক হয়, সে সাজ পরিহার্য। কেননা, দর্শক আমোদ করিতে আসিয়াছে, গলিত কুষ্ঠ রোগী ভিখারী

দেখিয়া তাহার আমোদের নিতান্ত ব্যাঘাত হইবে। এ আবার এক তর্কের স্থল; কেহ বা বলিবেন—"স্বাভাবিক দেখান উচিত।" কিন্তু যদি বোঝেন, কলা-বিদ্যা ও স্বভাব এক নয়, কলা-বিদ্যাবলে স্বভাব ছবি হৃদয়ে উদয় করিয়া দেয় মাত্র, কলা-বিদ্যা আনন্দপ্রদ, যদি ইহা সকলে বুঝিতেন, তাহা হইলে স্বাভাবিক, স্বাভাবিক, বলিয়া এত চীৎকার করিতেন না।"

অবশ্য গিরিশচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যে বিতর্কের অবকাশ আছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পকলাকে অবিমিশ্র আনন্দের উপকরণ বলে স্বীকার করে নিয়েই গিরিশচন্দ্র উল্লিখিত কথাগুলি বলেছেন। বর্তমান যুগে শিল্পকে নিছক আনন্দের উপকরণ বলে মেনে নেওয়া হয় না। নাটকের চরিত্র সমাজের যে শ্রেণী থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে, সেই শ্রেণীর মানুষের যথাযথ প্রতিচ্ছবি দেহ পটের সীমানায় ফুটিয়ে তুলতে বাস্তবতার আশ্রয় নিতেই হয়, তবে যেখানে symbol বা প্রতীকের ব্যবহার করা সম্ভব, সেখানে অতিবাস্তবতাকে পরিহার করাই বোধ করি বিধেয়। কিন্তু বিতর্কের কথা রেখে রূপসজ্জা সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ বক্তব্যটি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। রূপসজ্জা গ্রহণে অভিনেতার দ্বিতীয় দায়িত্বের কথায় তিনি বলেছেন,

"চিত্রকরের ন্যায় অভিনেতারও রঙ বোঝা আবশ্যক। চিত্রকর যেমন তাঁহার অঙ্কিত ছবি কোথা হইতে দর্শক দেখিবে, তাহা লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ রং দেন, অন্যাবস্থায় তাঁহার ছবি দেখিলে তাঁহার চিত্র-বিদ্যা সে রূপ বোঝা যায় না। অভিনেতাও সেইরূপ দর্শক যাহাতে তাহার সজ্জিত রূপের ছবি সম্পূর্ণ পায়, সেই অনুসারে রং মাখিবেন। দৃশ্যপট দিনের বেলায় দেখিলে একথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে। রজনীতে দূর হইতে দর্শক দেখিবে, চিত্রকর সেই ভাবে লিখিয়াছেন। দৃশ্যপট দীপালোকে দূর হইতে ভ্রমোৎপাদন করে, দিবালোকে মোটা মোটা রঙের দাগ দেখা যায়। অভিনেতাকেও রং মাখিবার সময় বিবেচনা করিতে হইবে যে, বৈঠকখানায় যে রূপ পাউডার মাখিয়া সুন্দর হইলে চলে, রঙ্গমঞ্চ হইতে সে রূপ চলিবে

না। বেশী করিয়া লাল রং গালে দিতে হইবে, তবে গোলাপী আভার ন্যায় দূর হইতে দেখাইবে। ক্ষুদ্র চক্ষু বৃহৎ দেখাইতে গেলে চোখের কোণে কাজলের রেখা বিশেষ করিয়া দিতে হইবে, বা চক্ষু কোটরগত করিতে হইলে চোখের কোলে বেশী করিয়া কালো রঙ্ দেওয়া আবশ্যক। দোকানে পরচুলা ভাল দেখিয়া লইলে চলিবে না। পরচুলা তাহার উপযুক্ত হওয়া উচিত। ভূমিকা (part) অনুসারে বৃহৎ ললাট, ক্ষুদ্র ললাট হওয়া যাঁহার প্রয়োজন, তাঁহাকে প্রয়োজন অনুসারে ফরমাস দিতে হইবে, ভাল পরচুলাটি দেখিয়াই পরিলে চলিবে না। আমরা দেখিতে পাই, যদি কেহ পরের দেখিয়া চুল ফেরান, তাহাতে অনেক সময় কদর্য দেখায়। কিন্তু যদি নিজের আকার অনুসারে অনুকরণ না করিয়া যে ভাব তাঁহাকে শোভা পায়, সেই ভাবে চুল ফেরান, তাহা হইলে সুন্দর দেখায়। অতএব কিরূপ পরচুলা ও পরিচ্ছদে তাঁহাকে ভাল দেখাইবে, তাহা অভিনেতার বিশেষ বোঝা আবশ্যক।"

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের এই সুদীর্ঘ উক্তি থেকে রূপসজ্জা গ্রহণের কতকগুলি প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা কিছু কিঞ্চিৎ অবহিত হতে পারি। ফলকথা, নাটক অভিনয়ে রূপসজ্জার প্রয়োজন হলো অভিনীতব্য চরিত্রের সাকার অবয়ব অভিনেতার দেহপটে ফুটিয়ে তুলে, দর্শক মনে সেই চরিত্রের সম্পর্কে যে ধ্যান-ধারণা আছে, তাকে উদ্ভাসিত করে তোলা। আর এই কাজ করতে গেলে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই যে, তা করতে হবে সে কথা বলা বাহুল্য। চিত্রকরের ছবি আঁকার মতই অভিনেতার মেক-আপ বা রূপসজ্জা, সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় সার্থক হতে গেলে, অভিজ্ঞতা, পারদর্শীতা ও শিল্পবোধ, থাকা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

মোটামুটি এই হলো নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কিত বিভিন্ন উপকরণের পরিচয়। এই পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে কেমন করে দৃশ্য রচনা করতে হয়, কি করে আলোক নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, অথবা সুর সৃষ্টি করতে হয়, এ আলোচনা আমরা করিনি। সেগুলি বিশেষজ্ঞের ব্যাপার। আমাদের মূল বক্তব্য হলো

নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই আঙ্গিকগুলির প্রয়োজন কতখানি তাই আলোচনা করা।

সুতরাং এখন পূর্বের কথায়, অর্থাৎ অঙ্গ এবং আঙ্গিকের বিতর্ক প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক।

তিন

অঙ্গ এবং আঙ্গিক

ইতিপূর্বে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে অঙ্গ বড় না অঙ্গিক বড় এ ধরনের একটা প্রশ্ন যে উঠেছে, তা আমরা বলেছি। বর্তমানে সেই বিতর্কের যথাসাধ্য নিরাকরণের চেষ্টা করা যাক।

মঞ্চ অধিকারের পর যাযাবর নাট্যকলা যখন সমাজে একটা স্থায়ী আসনের সন্ধান পেল, তখন ধীরে ধীরে রাজা মহারাজা বা অন্য কোন পদস্থ নাগরিকের পৃষ্ঠ পোষণার আশ্রয় ছেড়ে নাটমঞ্চ দাঁড়াতে চেষ্টা করলো নিজের পায়ে। নাটমঞ্চ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হলো, আর ভ্রাম্যমান নটনটীরা প্রযোজক এবং পরিচালকের আওতায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে, জমায়েত হলো নাটমঞ্চে, সন্ধান পেল অভিনয়ের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা অর্জনের পন্থার। এই সময় থেকেই তাবৎ শ্রেণীর দর্শককে আকৃষ্ট করার জন্য একটা সচেতন প্রচেষ্টা মঞ্চমালিকদের মধ্যে দেখা যায়। প্রয়োগ-কর্তারা নিত্যনূতন গবেষণার মধ্য দিয়ে নাট্য প্রযোজনাকে চক্ষুরঞ্জনকারী করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। এবং বলা বাহুল্য যে, এই উদগ্রীবতাই জন্ম দিয়েছে প্রযোজনার ক্ষেত্রে নতুন নতুন মতবাদের।

এককালে যখন আলোক-সম্পাত বা সুপরিকল্পিত দৃশ্য-পট ব্যবহারের কোন প্রশ্নই ছিলনা তখন স্বভাবতই নাটকের দৃঢ় সংবদ্ধ কাহিনী বস্তুর প্রতিই প্রযোজকদের মনোযোগ দিতে হতো বেশী। কিন্তু পরে বিভিন্ন আঙ্গিক কৌশল জানার পর, সেগুলোর প্রয়োগ যখন করা হলো, এবং দেখা গেল যে

তাদের মাধ্যমে নাট্য বিষয়কে আরো সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করা যায়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবসায়িক খাতিরে আঙ্গিক পরিচর্যার দিকেই নজর পড়ল বেশী। অনেক সময় নাটকটি সার্থক সাহিত্য বলে পরিগণিত না হলেও, দৃশ্য-পটের এবং আলোক-সম্পাতের কলাকৌশলে তা জনরঞ্জনে সমর্থ হলো। কোন কোন প্রযোজক তখন নাটক ছেড়ে এই কলাকৌশলগুলোর দিকেই আকৃষ্ট হলেন বেশী।

কিন্তু এই কলাকৌশল নাটকের প্রাণবস্তু নয়। আর আমরা আগেই বলেছি যে, কাব্য-শরীরে যদি সৌন্দর্য থাকে তবেই তাকে অলঙ্করণের দ্বারা আরো সুষমা মণ্ডিত করা যায়। এবং নাটকের ক্ষেত্রে এই অঙ্গিকগুলো হলো তার বিষয় বস্তুর সৌন্দর্যকে আরো সুষমা মণ্ডিত করে তোলার উপাদান। আঙ্গিক নাট্যবস্তুকেই পরিস্ফুট করে, তাকে চাপা দিয়ে বা দাবিয়ে রেখে, আপন কৃতিত্বের চমৎকারীত্ব জাহির করে না। অলঙ্করণের প্রয়োজন দেহের জন্য কিন্তু দেহটা একমাত্র অলঙ্করণের জন্য সৃষ্টি হয় নি।

নাট্য প্রয়োগ কলায় এই অঙ্গ এবং আঙ্গিকের প্রশ্নে তাই আমরা বলতে পারি যে, আজকের প্রযোজকের দেখা উচিত যে, আঙ্গিকের ব্যবহার তাঁর প্রযোজনার উদ্দেশ্যকে কতখানি সাফল্য মণ্ডিত করছে; এবং নাটকের বিষয় বস্তুকে সর্বজন-সংবেদ্য করে তুলতে কী ধরনের আঙ্গিকের প্রয়োজন। আঙ্গিকের ঔজ্জ্বল্য যেখানে নাট্যবস্তুকে চাপা দিয়ে আপন চমৎকারীত্ব প্রকাশ করে, সেখানে একজন সর্তক প্রযোজকের রাশ টেনে ধরাই উচিত। কেননা নাটকের উদ্দেশ্য পণ্য স্ত্রীর মত আপনাকে সাজিয়ে গুছিয়ে দুদণ্ডের জন্য সামাজিকের চিত্তবিনোদন করা নয়, তার হৃদয় জয় করে, ভবিষ্যৎ জীবনপন্থার ধারাটির উদ্দেশ্যে তাকে সুষ্ঠু এবং সর্তকভাবে পরিচালিত করা। চিত্ত-রঞ্জনের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সাধিত হলেও, চিত্ত-রঞ্জন বৃত্তিটাই তার প্রথম এবং প্রধান কথা নয়।

চার

প্রযোজক

নাটকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত থেকেই আজকের প্রযোজক নাট্য প্রযোজনার মহৎ কর্মে ব্রতী হয়েছেন। তাই আধুনিক কালের প্রযোজকের সর্বপ্রধান দায়িত্ব হলো নাট্যবস্তুর যথাযথ বিশ্লেষণ করে, তার প্রযোজনা আঙ্গিকের স্বরূপ সন্ধান, এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ।

ধরা যাক, প্রযোজক কোন একটি নাটক বেছে নিলেন প্রযোজনার উদ্দেশ্যে। এখন নাটকটি হাতে পেয়ে তাঁর সর্ব প্রধান কর্ত্তব্য হলো, সেটিকে বার বার খুব মনোযোগ সহকারে আদ্যপান্ত পাঠ করা। কেননা নাট্যবস্তুর সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ যতক্ষণ না সংস্থাপিত হচ্ছে, ততক্ষণ তার আন্তর সত্বাটিকে নিজের ধ্যান ধারণার সঙ্গে জারিয়ে নিয়ে সর্ব সাধারণ্যে তা তিনি উপস্থাপিত করতে পারবেন না। সুতরাং নাটকটি তাঁকে বার বার পড়তে হবে। আর বলা বাহুল্য এই পাঠ পল্লবগ্রাহী হলে চলবেনা।

এই ভাবে নাটক নির্বাচনের পর, তিনি তার চরিত্র, দৃশ্য সংখ্যা, এবং সেই দৃশ্যকেও চরিত্রের ভাবাভিব্যক্তি পরিস্ফুটনের জন্য আলোক-কে কী ধরনের ব্যবহার করবেন তার রীতি, আবহ-সঙ্গীত, ও রূপসজ্জার ধরণ ইত্যাদি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করবেন। তারপর সেগুলির প্রকাশ-রীতি সম্পর্কে যখন তিনি একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছবেন, তখন সুরু হবে তাঁর কর্ম পদ্ধতির দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ চরিত্র বণ্টন, বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের হাতে দৃশ্য, আলোক ইত্যাদির পরিচালনার ভার দেওয়া। তৃতীয় পর্যায়ে সুরু হবে মহলা বা রিহার্সাল। নাটকের ক্ষেত্রে এই রিহার্সালের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আর শুধু নটের অভিনয় পদ্ধতির মহলা নয়, দৃশ্য-পট, আলোক, ইত্যাদি সব কিছুর রিহার্সালই দিনের পর দিন দিয়ে দেখতে হয় যে, সমগ্র নাটকের সঙ্গে তা সমন্বিত হয়ে উঠে সমগ্র নাট্য প্রযোজনাকে একটা অখণ্ড মালিকায় পরিণত করতে সক্ষম হচ্ছে কিনা। এই মহলার সময় থেকেই

প্রযোজকের কর্ম পদ্ধতির চতুর্থ পর্যায়ের সুরু। এই সময় সমগ্র প্রযোজনার সুর-তালটির কথা স্মরণ রেখে তাঁকে নাটকের অঙ্গ এবং আঙ্গিকের প্রকাশ-রীতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। আলোক-সম্পাতকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, দৃশ্য সজ্জাকে প্রয়োজন মত পরিবর্তন পরিবর্জন করতে হয় এবং নাটকের সংলাপের প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে সংযোজন অথবা বিয়োজনও করতে হয়। অর্থাৎ এক কথায় আমরা বলতে পারি যে, এই পর্যায়টা হলো সম্পাদনা বা editing-এর সময়। এই সম্পাদনার পর প্রযোজক যখন নাটকটি সাধারণ্যে পরিবেশন করার মত উপযুক্ত হয়ে উঠেছে বলে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন, তখনই নাটকটির নাম ও অভিনয়ের কথা সাধারণে ঘোষণা করেন।

অবশ্য এই 'স্থির সিদ্ধান্ত' কথাটা বর্তমান প্রসঙ্গে rigide অর্থে গ্রহণ করলে চলবে না। কেননা শিল্পের ক্ষেত্রে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ কখন কোন সময়েই সম্ভব হয় না। নাটক অভিনয় হওয়া কালীন সময়ের মধ্যেও তার পরিবর্তন, পরিমার্জন হতে পারে ; এবং তা হয়ও অনেক সময়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নাট্য প্রযোজনা ব্যাপারটি সহজ সাধ্য নয়। এবং তা করতে গেলে একজন প্রযোজকের জীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণা, এবং নাট্য-কলার বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান, সামাজিক, রাজনীতিক ও শিল্পনীতিক তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত থাকা প্রয়োজন। এর পরও অবশ্য ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীরও দরকার। কেননা অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে enterpriser বলে, একজন নাট্য-প্রযোজক ঠিক তা না হলেও, তাঁকে তার ভূমিকাও মাঝে মাঝে গ্রহণ করতে হয়, বিশেষ করে তিনি নিজেই যখন মঞ্চ মালিক হয়ে ওঠেন।

নাট্য প্রযোজনার পর্যায়গুলির তাহলে সংক্ষেপে মোটামুটি চারিটি স্তরে বিন্যাসিত করা যেতে পারে।

ক। নাটক নির্বাচন
খ। আঙ্গিক নির্দ্ধারণ
গ। মহলা
ঘ। সম্পাদনা

পরবর্তী প্রসঙ্গে আমরা এই পর্বগুলির বিস্তারিত আলোচনা করে প্রযোজকের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে যথাসাধ্য অবহিত হওয়ার চেষ্টা করবো।

পাঁচ

প্রযোজকের ইতি কর্তব্য

প্রথমে নাটক নির্বাচনের কথাই ধরা যাক। প্রযোজনার সর্ব প্রথম এবং সর্বপ্রধান অঙ্গ হিসেবে এই কাজটি অত্যন্ত দুরূহ, কেননা সব নাটকই নাটক-নয়। মানুষের মন অনুকরণ প্রিয় এবং ভাবপ্রবণ। সেই কারণে সাহিত্য শিল্পকে অনেকেই নিজের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়ে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। কিন্তু প্রতিভার তর তম অনুসারে সকল রচনার শিল্পোত্তরণ ঘটেনা। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাঙলায় সব প্রথম উপন্যাস রচনা সুরু করলেন, তখন উপন্যাস সাহিত্যের চমৎকারীত্বে এবং নতুনত্বে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে নিজেদের ঔপন্যাসিক বলে প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহে সাহিত্য সেবী হয়ে উঠেছিলেন। এবং তার ফলে বাঙলা সাহিত্য যে কী পরিমাণ ভেজাল এবং জঞ্জালে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, এবং স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রকে, সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে, কি ভাবে সেই আগাছা পরিস্কার করে সাহিত্য মন্দিরের প্রবেশ পথটি সুগম করে রাখতে হয়েছিল তা বাঙলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। নাটকের ক্ষেত্রেও ঐ একই ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন আমাদের নাট্য-সাহিত্য রচিত হলো, তখন ছোট বড় অনেকেই নাটক প্রহসন ইত্যাদি রচনায় মেতে উঠলেন,.এবং কেবল অনুবাদ ভাবানুবাদ নয়, অক্ষম, রুচিহীন অশালীন রচনায় বাঙলা নাট্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাটি প্রায় রুদ্ধগতি হতে বসেছিল। বাঙলা নাটকের এই পর্যায়ে আমাদের নাট্য-সাহিত্য যে কী অসীম দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছিল, তা কলিমাহাত্ম্য, আচাভুয়ার বোম্বাচাক, গোপনচুম্বন ইত্যাদি জাতের নাটক যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরাই অবহিত

আছেন। বিদেশী নাটকেরও নিস্তার ছিলনা। খুব বেশী উদাহরণ না দিয়ে কেবলমাত্র হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত Shakespeare-এর রোমিও জুলিয়েট নাটকটির কথা স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে। হেমচন্দ্রের হাতে রোমিও জুলিয়েট নাটকটির যে কি অসীম দুর্গতি হয়েছে,তা উক্ত নাটকের পাঠক মাত্রেই রচনার। প্রযোজনার প্রাক্কালে সত্যিকারের নাটক এবং নাট্যরূপী এই সব জঞ্জালের সম্পর্কে একজন প্রযোজকের সদাসর্বদা সতর্ক থাকার প্রয়োজন। কেননা যথেচ্ছ ভাবে নাটক নির্বাচন করাটা কোন কাজের কথা নয়। নাট্য প্রযোজনার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আর সেটা হলো যুগজীবনের ভাব ও ভাবনার সঙ্গে নাটক কতখানি ওতপ্রোত বিজড়িত, এবং তার ফলে জনমানসকে সে কতখানি ভবিষ্যৎ পূর্ণতার দিকে প্রাগ্রসরিত করতে পারছে, তার সম্বন্ধে সচেতন থাকা। সুতরাং যুগ ও জীবন চিন্তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে তাকে নতুন ধ্যান ধারণায় যে নাটক আরো উদ্বুদ্ধ করে দিতে পারে, আজকের প্রযোজকের ঝোঁক সেই নাটকের দিকেই। আর এই উদ্দেশ্যে নাটক নির্বাচন করতে গেলে সর্বপ্রথম বিচারের একটি নিরিখ নির্ণয়ের প্রয়োজন। বলা-বাহুল্য জীবনই হলো সেই নিরিখ।

Stream of life বা জীবন স্রোত নিরবধি কাল ধরেই প্রবাহিত। নদী প্রবাহের মতই অনন্ত নীলাম্বুরাশির অর্থাৎ এক অখণ্ড পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্যেই তার যাত্রা। সেই পরিপূর্ণতার স্বরূপ এবং পরিণতি সম্পর্কে অনেক গবেষণাত্মক দার্শনিক মতবাদ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলেও তার স্বরূপ সন্ধান এখনও সম্ভব হয় নি। অনন্ত ভবিষ্যতেও তা হবে কিনা সন্দেহ। কেননা নিরবধিকালের স্বরূপ চির কালই অপরিজ্ঞাত, আর সেই কারণেই আমরা সীমাহীন অনন্ত কালকে একটা সীমিত গণ্ডীর মধ্যে ধরে, তাকে আমাদের জ্ঞান সীমার আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেছি। নিরবধি কালকে ভাগ করে নিয়েছি কতকগুলি খণ্ড খণ্ড অবধির মধ্যে।

এই 'অবধি'গুলি আমাদের যুগ পরিবেশের এবং তার প্রভাব সঞ্জাত ধ্যান-ধারণা ও সত্য উপলব্ধির সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। প্রাচীন যুগে আমাদের যে সমাজ জীবন ও পরিবেশ ছিল এবং তার প্রভাবে আমাদের জীবনধারা যে

ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, এবং সেই নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা যে সত্যগুলিকে গ্রাহ্য করেছিলাম, প্রাচীন কাল সীমার সমাপ্তি রেখায় তা কিন্তু আর সত্য রইল না। কেননা অনাবিল প্রাগ্রসরতার পথে নতুন ধ্যান-ধারণা ও বোধ এসে আমাদের জীবন যাত্রা আর সমাজ পরিবেশকে করল পরিবর্তিত। আর তা করলো বলেই সূচনা হলো এক কাল থেকে আর এক কালান্তরের। নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে একজন প্রাজ্ঞ প্রযোজক এই কালান্তরের সূচনা কালটি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত থাকেন। কেননা সাহিত্য এই কালান্তরের পর্যায় ধরেই পরিবর্তিত হয়ে সাহিত্যের ইতিহাসের একযুগ থেকে আর এক-যুগে উত্তরণ ঘটায়।

এখন কথা হচ্ছে যে, যা কিছু প্রাচীন ও পুরাতন তাই পরিত্যাজ্য নয়। কেননা ঐতিহ্যের পথ ধরেই একটি জাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবর্তন পরিবর্জন থাকলেও নবযুগের ধ্যান-ধারণা জাতির সনাতন ঐতিহ্যের বিবর্তন-ধারাতেই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে, যুগেযুগে যা কিছু সাহিত্য, রচিত হয়েছে, তাই ঐতিহ্য মণ্ডিত হয়ে উঠছে একথা সত্য নয়। সুতরাং ঐতিহ্যসম্পন্ন প্রাচীন নাটক বার বার অভিনয় করে জাতিকে ঐতিহ্য সচেতন করার যেমন প্রয়োজন এবং দায়িত্ব আছে, তেমনি সেই দায়িত্ব পালনে কোন নাটক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক তাও নির্বাচনের প্রশ্ন আছে। এই কারণেই আমরা বলেছি যথেচ্ছভাবে নাটক নির্বাচন একজন প্রাজ্ঞ প্রযোজক কখনই করেন না।

ধরা যাক, চৈতন্য অভিনীত লক্ষ্মীস্বয়ম্বরা অথবা বিশ্বানাথ বাচস্পতি রচিত চিত্রযজ্ঞ নাটকটির কথা। যদি এদুটি নাটকের পাণ্ডুলিপি অকস্মাৎ উদ্ধার করা যায় তাহলে সেগুলি একজন প্রযোজক প্রযোজনার উদ্দেশ্যে বেছে নেবেন কি না? যদি কেউ এ বিষয়ে উৎসুক হন, তাহলে পাণ্ডুলিপিটি হাতে পাওয়ার পর তিনি নিশ্চয়ই একবার ভেবে নেবেন যে, কেন করবো? এবং আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এদের অভিনয়, একমাত্র ঐতিহাসিক কৌতুহলের নিবৃত্তি-করণ ছাড়া আর কোন সুনির্দিষ্ট জীবন পন্থার সন্ধান দেবে কিনা। যদি তা না দেয়, যদি দেখা যায় যে, কেবল আধ্যাত্মিক ভাববিলাসিতা এবং

রাজামহারাজের ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য নাটকগুলি লিখিত, এবং যদি দেখা যায় যে,সেই রচনায় শিল্পীর মগ্নতা একেবারেই নেই অর্থাৎ তার মধ্যে শিল্পকলা চাতুর্যের কোন পরিচয় নেই, তাহলে প্রাজ্ঞ প্রযোজক নিশ্চয় তা বেছে নেবেন না। কেননা তিনি জানেন যে, সমকালীন যুগ মানসের ধ্যান-ধারণার নতুন খোরাক জোগাতে যেমন সে নাটক অক্ষম, ঠিক তেমনি প্রাচীন সমাজ জীবনের ঐতিহ্যের পরিচয় প্রদানেও তা অপারক।

উনবিংশ শতাব্দীর অনেক স্বনামধন্য নাট্যকারের রচনার তালিকা বিশ্লেষণেও এই ধরনের অনেক জঞ্জাল স্বরূপ নাটকের সন্ধান আমরা পাবো। উদাহরণ স্বরূপ গিরিশচন্দ্রের কথাই ধরা যাক। তাঁর সমসাময়িককালে এক-দল ব্যক্তি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অহেতুক অবজ্ঞা এবং পাশ্চাত্য জীবন-পন্থার অন্ধ অনুকরণ তাদের মানসিক এবং নৈতিক অধঃপতন ঘনিয়ে এনেছিল, তার ফলে সমাজ কঠামোয় হয়েছিল এক নিদারুণ অবক্ষয়ের সূত্রপাত। এই সব পথভ্রান্ত অন্ধ অনুকারীদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করার জন্য গিরিশচন্দ্র কয়েক খানি পঞ্চরঙ জাতীয় নাটক রচনা করেছিলেন।

কিন্তু সেই পঞ্চরঙগুলি পাঠ করলে আমাদের বলতেই হয় যে, এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নাট্যকারের সুস্থজীবনবোধ প্রণোদিত ছিলনা। তাদের অধঃপতন নিয়ে হাল্কা হাসি ঠাট্টা করে তিনি দর্শককে দুদণ্ড আনন্দ দান করতে চেয়ে ছিলেন। এবং তা করতে গিয়ে অনেকাংশে তাদের অপরিমার্জিত রুচিবোধেরই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র বিরচিত বড়দিনের বখশিস্, বেল্লিক বাজার, সপ্তমীতে বিসর্জন, পাঁচকনে ইত্যাদি পঞ্চরঙগুলি পাঠ করলেই একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই রচনাগুলি যে কেবলমাত্র ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে হাল্কা হাসিঠাট্টায় ভরপুর মজাদার নাটক তা নয়,অনেক অংশে এরা শালীনতার মাত্রাও অতিক্রম করেছে। হোক সে গিরিশচন্দ্রের রচনা তবু বলতে দ্বিধা নেই যে, সেগুলি নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী না করে, জঞ্জালের স্তূপকেই করেছে পরিপুষ্ট। আজকের প্রযোজক গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও নিশ্চয় এই নাটকগুলি অভিনয়ের জন্য বেছে নেবেন না। কেননা

বিগত যুগের ঐতিহ্য বিমণ্ডিত কোন চিত্র, অথবা আধুনিক যুগের জীবনজিজ্ঞাসার কোন সদুত্তরই এইসব পঞ্চরঙ দিতে সক্ষম নয়। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস রচনায় এগুলির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হলেও, নাট্যাভিনয়ের প্রসঙ্গে এরা নিশ্চয় অবান্তর; আর শুধু গিরিশচন্দ্র নয় তাঁর পূর্ব এবং পরবর্ত্তী কালেও এই ধরনের অনেক অক্ষম রচনা দেখা যায়। নাট্য প্রযোজক সেই অক্ষম রচনাগুলি সযত্নে পরিহার করে, যুগ-জীবনের নব্য দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতেই নাটক নির্বাচন করে থাকেন।

আজকের প্রযোজক তাই নাট্য নির্বাচনের পূর্বে বেশ ভাল করে ভেবে দেখেন বা তাঁর ভেবে দেখা উচিত যে, তাঁর যুগের চাহিদাটা কি? এবং সেই চাহিদা কোন নাটক কতখানি পুরণ করতে সক্ষম। যদি এমন হয় যে, সমকালীন যুগের চাহিদা অনুযায়ী তেমন কোন নাটক স্বদেশের নাট্য সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে তিনি পেলেন না, তখন তিনি কি করবেন একথা উঠতে পারে। এবং অনেক ক্ষেত্রে যখন দেখা যায় যে, প্রযোজক বিদেশী নাটকের অনুবাদ বা অক্ষম অনুকরণ অভিনয় করছেন, তখন কেন করছেন এই প্রশ্নের উত্তরে দুঃখিত ভাবে বলেও থাকেন যে, ভাল নাটক রচিত হচ্ছেনা। এ সমস্যা অবশ্যই আছে; এবং এই সংকটত্রাণের উপায় হিসেবে প্রাজ্ঞ প্রযোজক স্বাভাবিক ভবেই বিদেশী প্রথম শ্রেণীর নাটকের পরিবর্তে স্বদেশী দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটকেই বেছে নেন প্রযোজনার উদ্দেশ্যে। তার মধ্যে অনেক অসার তত্ত্বকে বাদ দিয়ে সারতত্ত্বটুকু সংগ্রহ করেই তিনি তা প্রযোজনা করেন। কেননা একজন প্রাজ্ঞ প্রযোজক জানেন যে, নাট্য প্রযোজনার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নাট্যকার সৃষ্টি করাও তাঁর মহৎ দায়িত্বের অন্যতম।

প্রয়োগ-কলার ক্ষেত্রে নাট্য প্রযোজকের কর্মপদ্ধতির দ্বিতীয় পর্যায়ের সুরু হয়, নাট্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। প্রথমে তিনি নাটক নির্বাচন করলেন। তারপর সেই নির্বাচিত নাটককে কতকগুলি ভাগে ভাগ করে ফেললেন। যেমন চরিত্র, দৃশ্যপট, আলোক, সঙ্গীত, রূপসজ্জা, ইত্যাদি। এই পর্বটিকে আমরা প্রযোজনার পূর্বাহ্নের প্রস্তুতি পর্ব বলে অভিহিত করতে পারি। কোন production বা প্রযোজনার পূর্বে paper works বলতে যা বোঝায়, এ

হলো তাই। প্রযোজক নাটকের মধ্যে যে কটি চরিত্র আছে, তার আন্তর সত্তার স্বরূপটি বেশ ভাল করে বিশ্লেষণ করে নিয়ে, অভিনেতাদের মধ্যে সেটিকে বণ্টন করে দেন। যদি তিনি এই চরিত্র বিশ্লেষণের সময়ে দেখেন যে, কোন চরিত্র নাট্যকারের দুর্বলতা বশতঃ পূর্ণাঙ্গরূপ পায় নি, বা নাট্য ঘটনা কোন কোন ক্ষেত্রে দানাবেঁধে ওঠেনি,তাহলে সম্ভাব্যক্ষেত্রে নাট্যকারের সঙ্গে পরামর্শ করে, বা নিজেও তার ত্রুটিগুলি পরিমার্জিত করে নিতে পারেন। অভিনয়ের পূর্বে নাটককে কেটে ছেঁটে নেওয়ার রীতি বোধ হয় এই কারণেই প্রচলিত হয়েছিল, যদিও বর্তমানে এই উদ্দেশ্যেই নাটক কাটা হয় না। কিন্তু সে যাই হোক চরিত্র বিশ্লেষণ এবং বণ্টনের পর নাট্য শিক্ষার ব্যাপারটা প্রযোজক নিজেও গ্রহন করতে পারেন অথবা পরিচালক-এর হাতেও অর্পণ করতে পারেন। যদি নিজে গ্রহণ করেন তাহলে অভিনয় সম্বন্ধে শুধু রীতিমত ধ্যান-ধারণাই থাকা নয়, প্রযোজককে সু-অভিনেতাও হতে হবে। অন্ততঃ অভিনয় প্রতিভা তাঁর মধ্যে থাকা উচিত।

চরিত্র বণ্টনের পর আসে দৃশ্য সংস্থানের কথা। নাটকের ঘটনা প্রবাহ অঙ্কের পর অঙ্কে বহু দৃশ্যপটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নদী, জল, পাহাড়, অরণ্য, পথ, ঘর ইত্যাদি যে কোন স্থানেই নাট্য কাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। প্রযোজকের কাজ হলো নাটকের কাহিনী বর্ণনায় নাট্যকার ক'টি দৃশ্যের ব্যবহার করেছেন তা বেশ ভাল করে বেছে নেওয়া। তারপর দৃশ্যগুলি ঘটনার mood অনুযায়ী তিনি কিভাবে নির্মাণ করবেন তা স্থির করা। কেননা তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, দৃশ্যপট নাটকীয় ঘটনার বাইরে নয়। মঞ্চাভিনয়ে চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের দৃশ্যপট, আলোক-নিয়ন্ত্রণ, আবহসঙ্গীত ইত্যাদি সকলই মুখর হয়ে উঠে। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা আছে, আর সেই ভাষাতেই তারা অভিব্যঞ্জিত হয় ; সাহায্য করে নাটকের অন্তর্নিহিত রসবোধনের।

এইভাবে পর পর আলোক-সম্পাত, আবহ-সঙ্গীত, ইত্যাদির প্রকৃতি প্রযোজ্য নাটকটির রসবস্তু প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে কোন রীতির হবে, তা সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে, তারপর নাট্য প্রযোজনায় উদ্যোগী হন প্রযোজক।

এক কথায় প্রযোজকের দৃষ্টি থাকে, নাট্য প্রযোজনায়, নাটকের অঙ্গ এবং আঙ্গিকের সুসম সমন্বয় সাধন করে, এক অখণ্ড মালিকার সৃষ্টি করা, যার ছন্দময় রস ব্যঞ্জনায় দর্শক সাধারণ বিমোহিত হন। প্রযোজক হলেন মালাকার। নাটকের অঙ্গ এবং আঙ্গিকের সৌসাম্যের কথাটা স্মরণ রেখে দর্শক সাধারণের জন্য তিনি নাট্য প্রযোজনার উপকরণ-রূপী পুষ্পগুলি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে চয়ন করে এক ছন্দোবদ্ধ অখণ্ড মালিকার সৃষ্টি করেন।

সপ্তম অধ্যায়

এক

প্রযোজনার ইতিকথা

কিন্তু মালাকার বললেই প্রযোজক সম্পর্কে সব কথা বলা হয় না। আরো অনেক কথাই থেকে যায়। কেননা দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে নাটমঞ্চের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা যদি মেনে নেওয়া যায়, এবং যদি আমরা স্বীকার করি যে, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার উত্থান পতনের কম্বুরেখান্বিত লেখ-চিত্র, সমাজ মানসকে নিয়ন্ত্রিত করে; আর নাটমঞ্চের মাধ্যমেই তাবৎ সমাজ-মানসকে সমস্যা-সচেতন করে তোলা যায়, তাহলে মানতেই হয় যে, সমগ্র সমাজ-মানসকে সচেতন করে তুলে, সুস্থ, সুন্দর, বলিষ্ঠ জীবন-বোধের সন্ধান, নাট্য প্রযোজকই দিতে পারেন। আর সেইজন্যেই দর্শক এবং প্রযোজকের সম্পর্কটি সম্বন্ধে আমাদের আরো বেশী সচেতন হওয়া দরকার।

একদিন ছিল, যখন নাট্যাভিনয় কতিপয় ব্যক্তির আমোদ আহ্লাদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। আর এই কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন হয় রাজা মহারাজা, না হয় সমাজের উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রতিভূ। এঁদের জীবন পন্থা এবং তাবৎ প্রাকৃত-জনের দৈনন্দিন জীবন-ছন্দ এক রকমের ছিল না; রাজনীতির ক্ষেত্রে ইজমের কথা বাদ দিয়েও বলা যায় যে, শক্তিমান এবং দুর্বল,মানুষের শ্রেণীবিভাগ চিরন্তন কাল ধরেই সমাজে চলে এসেছে, আর যারা শক্তিমান তারা নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সুযোগ-সুবিধে, আদায় করে নিয়েছে এই দুর্বলদের মাধ্যমেই। পারস্পরিক যোগ সম্পর্কটা ছিল সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা-সূত্র ধরে, নৈলে সমভাবে. বা সমান মর্যাদায় প্রাকৃত জনের স্থান রাজসভার আনন্দ-ভোজে ছিল না।

কবি বা নাট্যকার ছিলেন রাজন্যবর্গ কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত, সুতরাং রাজন্যবর্গকে খুশী করাই ছিল তাঁদের কাজ। সংস্কৃত নাট্যকলায় তাবৎ মানুষের ব্যথা বেদনার কাহিনীর তুলনায় রাজা-মহারাজার খেয়াল খুশীর কথাই আমরা দেখতে পাই অনেক বেশী। বলাবাহুল্য এই সব অভিনয়ের সঙ্গে তাই জনসাধারণের প্রাণের যোগ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয় নি, আর হয়নি বলেই যখন রাজন্যবর্গ শক্তিহীন হয়ে পড়লেন, তখন সংস্কৃত নাট্যকলাও হতশ্রী হয়ে গেল স্বাভাবিক ভাবেই। জনসাধারণ তার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ-বোধ বা সহানুভূতি প্রদর্শন করে নি।

তখনকার নাটকে যেমন প্রাকৃত জনসাধারণ অবজ্ঞাতই ছিল, তেমনি সেগুলির অভিনয়ও ছিল ক্লাসিক পন্থী। অভিনেতারা তাবৎ জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে প্রযোজক কর্তৃক জীবনের মৌল ভাব ও ভাবনার শিক্ষায় শিক্ষিত হতেন, রাজা মহারাজা সেজে হর্ষ, অসূয়া, ক্রোধ, বাৎসল্য, প্রণয়, ইত্যাদি নবরসের প্রকাশ দেহ ভঙ্গীমায় ও স্বরক্ষেপণে সম্ভব করতে পারলেই তাঁদের কাজ শেষ হতো। কেননা ওর বেশী রাজা মহারাজারা আর কিছু চাইতেন না। এক কথায় শিল্প তখন নিয়ন্ত্রিত হতো এক বা একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির খেয়াল-খুশী অনুযায়ী, তাঁদের স্বার্থবোধের পরিপ্রেক্ষিতে। সেটা সুস্থ শিল্পের পক্ষে নিঃসন্দেহে মৃত্যুর কারণ, এবং আমাদের মনে হয়, সংস্কৃত নাট্যকলার ক্রমবিলুপ্তিই তার অন্যতম উদাহরণ।

এই ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারটা নাট্যকলার ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য দশক পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে বাঙ্‌লা নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও। আর তার ফলে নাট্য-সাহিত্যের যে কি পরিমাণ অধোগতি হয়েছিল, সে কথা ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রুচির খোরাক যোগাতে গিয়ে ভারতচন্দ্রের মত শক্তিশালী কবিকেও বিদ্যাসুন্দর রচনা করতে হয়েছিল, আর ঊনবিংশ শতাব্দীর বিত্তবানদের রুচি মেটাতে সমকালীন নাট্য প্রযোজকদের সেই বিদ্যাসুন্দরের নাট্যরূপ অভিনয় করতে হয়েছিল। এই সৌখীন সম্প্রদায়ের আওতার বাইরে এসে তাবৎ মানুষের শিল্প-চেতনার সঙ্গে যেদিন নাট্যকলা পরিচিত হলো,সেইদিন থেকেই সে নিজের

পায়ে দাঁড়াতে শিখল। নাটক জনজীবনের প্রাগ্রসরতার প্রতীক বলে স্বীকৃত হলো; বিদ্যাসুন্দর বা কামিনীকুমারের, নাট্যরূপের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলো মানুষ।

ব্যক্তিগত মালিকানা বা রুচির সঙ্গে নাট্যকলার কোন সম্পর্ক নেই, তা হলো তাবৎ গণমানসের সম্পত্তি, তাদের সুখদুঃখ ব্যথা বেদনার কথাই নাট্যকার বলবেন, আর প্রযোজক অভিনয় করবেন, সাদা বাঙ্‌লায় এই হলো আজকের নাটকের উদ্দেশ্য। আর আজকের প্রযোজকের দায়িত্ব হলো এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে নাট্যাভিনয়কে দর্শক সমক্ষে উপস্থাপিত করা।

চিন্তা যেই পাল্টাল সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাল রীতি; অর্থাৎ প্রয়োগকলার ভাষাও গেল বদলে। প্রযোজনার এই রীতি পরিবর্তন সম্পর্কে আমরা বর্তমানে কিছু আলোচনা করে নিতে চাই।

খুব প্রাচীনকালে না গিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর কথাই ধরা যাক। আমাদের বাঙ্‌লা নাটক অর্থাৎ থিয়েটারি নাটক উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল থেকেই পাদ-প্রদীপের সামনে এসেছে। অনুবাদ ভাবানুবাদ আরো কিছু আগে থেকে সুরু হলেও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের আগে মৌলিক বাঙ্‌লা নাটক রচিত হয়নি তা আমরা জানি।

কিন্তু নাট্য-সাহিত্য পাদ-প্রদীপের সামনে এলেও, নাট্য-অভিনয় ধনী গৃহস্থের বৈঠকখানাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর বলা বাহুল্য তাঁদের দুর্দাম আনন্দের খোরাক হয়েই নাট্য- সরস্বতী তখন উর্বশীর ভূমিকাভিনয়ে ব্যস্ত ছিলেন। নৈলে বিদ্যাসুন্দর নাটক লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে অভিনীত হতো না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তখনও নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন চালু না করলেও ব্যক্তিগত স্বার্থ বিরোধী নাটকের নিয়ন্ত্রণ তখন থেকেই চালু হয়ে গিয়েছিল অদৃশ্য ভাবে। নৈলে মাইকেল মধুসূদনের বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ, আর, একেই কি বলে সভ্যতার, মত সমাজ সচেতন বলিষ্ঠ প্রহসনের অভিনয় বন্ধ হতো না। অদৃশ্য নাট্যনিয়ন্ত্রণ নীতির প্রথম বলি মাইকেল মধুসূদন, কথাটা বোধকরি অত্যুক্তি নয়।

কিন্তু সে যাই হোক, তখন যে সব নাটক অভিনীত হতো তার রীতি নীতি

ছিল ক্লাসিক পর্যায়ের অনুকারী। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে দৃশ্যপট নির্মাণ এবং রাজা-মহারাজাদের সত্যিকারের দামী পোষাক পরিচ্ছদ পরে তখন অভিনেতারা অভিনয় করতেন। অভিনয়ের ঝোঁক ছিল সুষ্ঠু আবৃত্তি এবং সুর তাল সমন্বিত সঙ্গীতের ওপর। প্রযোজকরা ছিলেন ন্যাচারালিজমের পক্ষপাতী, রাজা-মহারাজার অর্থানুকূল্যে তাঁরা নাট্য বর্ণিত দৃশ্যগুলিকে যথাসম্ভব ন্যাচারল করে প্রযোজনা করারই চেষ্টা করতেন। মঞ্চ-প্রযোজনায় এই ন্যাচারলিজমের প্রবর্তন চেষ্টার চূড়ান্ত উদাহরণ বোধ করি বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয়। উক্ত নাটকে বিদ্যার ঘরে সুন্দরের উপস্থিত হবার দৃশ্যটি বর্ণনা অনুযায়ী হুবহু করে তোলার জন্য প্রযোজকরা এক ঘর থেকে পাশের ঘর পর্যন্ত সুড়ঙ্গ কেটেছিলেন এবং সুন্দর সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে পাশের ঘরে যাতায়াত করতো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদেরও সদলবলে একঘর থেকে আর এক ঘরে যাওয়া আসা করতে হতো।

স্বভাবতই এই যুগে নাটক কেমন ভাবে অভিনীত হতো সে বিষয়ে পাঠকের কৌতূহল জাগতে পারে। সেই কৌতুহলের নিরসনের জন্য আমরা শ্যাম-বাজারের নবীন বসুর বাড়ীর (এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রামডিপো) বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ, নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম। অভিনয়টি হয়েছিল ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। এ সম্পর্কে "হিন্দু পায়োনিয়র" লিখেছেন—

> "গত পূর্ণিমা দিবস সন্ধ্যায় আমাদের একটি নাট্যাভিনয় দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই অভিনয় দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা আমরা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। অভিনয় কালে এক হাজারের উপর হিন্দু, মুসলমান, কয়েকজন য়ুরোপীয় ও অন্যান্য নানা জাতীয় দর্শকের ভীড় হইয়াছিল। ইহাদের, সকলেই অভিনয় দেখিয়া সমভাবে আনন্দিত হইয়াছেন। রাত্রি বারোটার কিছু পূর্বে অভিনয় আরম্ভ হয়, এবং পরদিন ভোর সাড়ে ছ'টায় অভিনয় শেষ হয়। আমরা প্রথম হইতে এই অভিনয়ে উপস্থিত

ছিলাম এবং শেষ দুইটি দৃশ্য ভিন্ন প্রায় সমগ্র অভিনয়ই দেখিয়াছিলাম। অভিনয়ের বিষয় ছিল বিদ্যাসুন্দর।…সুমধুর ঐকতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হয়। সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ, প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্র হিন্দুরাই বাজাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সকলেই আবার ব্রাহ্মণ। এই বাদকদের মধ্যে বাবু ব্রজনাথ গোস্বামী অতিশয় দক্ষতার সহিত বেহালা বাজাইয়াছিলেন, এবং চারিদিকের শ্রোতাদের নিকট হইতে ঘন ঘন করতালি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী ভাল করিয়া তাঁহার বাদ্য শুনিতে পান নাই। যবনিকা উত্তোলনের পূর্বে হিন্দু প্রথামত পরমেশ্বরের স্তোত্রপাঠ করা হয়, এবং প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্ব্বে একটি ভূমিকা আবৃত্তি করিয়া অভিনয়ের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। দৃশ্যাঙ্কন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। চিত্রগুলির 'পারস্পেকিটভ' মেঘ, জল, প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এই গুলিতে সুরুচি ও চিত্রাঙ্কনের রীতিজ্ঞান, উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইল। কেবলমাত্র একটির উপর আর একটিকে বিন্যস্ত করা ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। দেশীয় কারিগরদের দ্বারা কৃত হইলেও একটু নিপুণ হাতে পড়িলে এগুলি আরও অনেক ভাল হইতে পারিত। ইহাদের মধ্যে রাজা বীরসিংহের প্রাসাদ ও তাঁহার কন্যার কক্ষ অঙ্কন একটু ভাল হইয়া ছিল। এই নাটকে সুন্দরের ভূমিকা বরানগরের শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি কিশোর যুবক কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। প্রশংসার্হ উদ্যম সত্ত্বেও সে এই ভূমিকার সমুচিত উৎকর্ষ দেখাইতে পারে নাই। এই চরিত্রের অভিনয়ে পর পর ও হঠাৎ ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিয়া অথবা নায়িকার পিতা যাহাতে প্রণয়ের খেলা না ধরিয়া ফেলিতে পারেন, এইরূপ কৌশল দেখাইয়া অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। যুবা শ্যামাচরণ মাঝে মাঝে ভঙ্গী পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছে সত্য, কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালন ও ভঙ্গী যেন ইচ্ছাকৃত ও আড়ষ্ট

বলিয়া বোধ হইল। রাজা এবং অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সন্তোষজনক হইয়াছিল।

এই নাটকে বিশেষ করিয়া স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় খুব চমৎকার হইয়াছিল। রাজা বীর সিংহের কন্যা ও সুন্দরের প্রণয়িণী বিদ্যার ভূমিকায় রাধামণি বা মণি নামে একটি বৎসর ষোল বয়সের বালিকা অভিনয় করিয়াছিল। সে আগাগোড়া খুব নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। তাহার সুললিত অঙ্গভঙ্গী, মধুর কণ্ঠস্বর, সুন্দরের প্রতি প্রণয়-সূচক হাব-ভাব দর্শক মণ্ডলীকে অভিনয়-মুগ্ধ করিয়াছিল। অভিনয় কালে সে একবারও নৈপুণ্যের অভাব দেখায় নাই। আনন্দে ও দুঃখে মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন, প্রণয়ীকে বাঁধিয়া পিতার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইয়াছে শুনিয়া তাহার করুণ উক্তি ও ভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী, তাহার নিজের এবং নাট্যশালার, উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। সুন্দরের বধের আদেশ হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিবার পর তাহার সখীরা তাহাকে প্রবোধ দিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু সে ভূমিতে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সখীদের যত্নে একবার জ্ঞানলাভ করিয়া আবার সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, এবং কিছুক্ষণের জন্য দর্শকমণ্ডলী সভয়ে নীরব হইয়া রহিল। রাধামণির মত অশিক্ষিত এবং মাতৃভাষার সূক্ষ্ম অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ একটি বালিকা যে এরূপ কঠিন একটি অংশ এরূপ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিতে পারিবে এবং সকলকে তৃপ্ত করিয়া ঘন ঘন করতালি লাভ করিতে পারিবে, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। অন্যান্য স্ত্রী চরিত্রের অভিনয়ও খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে রাণীর ও মালিনীর অভিনয়ের উল্লেখ না করা অন্যায় হইবে। জয়দুর্গা নামে একটি প্রৌঢ়া রমণী এই দুইটি ভূমিকাই গ্রহণ করিয়া উভয় অংশেই সমান কৃতিত্ব দেখাইয়া ছিল। সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে তাহার অভিনয় লক্ষ্য করিবার মত হইয়াছিল। সে সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। রাজকুমারী বা রাজু নামে আর একটি স্ত্রীলোকও

বিদ্যার সখীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া জয়দুর্গার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলেও সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।"

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলো, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে বাঙ্‌লা নাটকের প্রাথমিক পর্বের অভিনয় রীতির একটি সুন্দর চিত্র আমরা দেখতে পাই। মনোযোগের সঙ্গে উদ্ধৃতিটি পড়লে আমরা দেখতে পাবো যে, অভিনয় শিক্ষায় তখনকার প্রযোজক বিশেষ করে সংস্কৃত নাট্যশিক্ষা রীতির সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। মঞ্চ সজ্জায় পাশ্চাত্ত্য প্রথানুযায়ী ন্যাচারাল দৃশ্যপট সাজানরই চেষ্টা করেছিলেন, যদিও সমালোচকের ভাষায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এই ক্লাসিক রীতির অভিনয়ই ছিল তখনকার নব্য শিক্ষিত সমাজের মনঃপুত। নাট্য প্রযোজকও এই রীতি-নিয়মের বাইরে অতিরিক্ত কোন প্রতীক ব্যবহার করে বক্তব্য বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে তাই চাননি।

মঞ্চ সজ্জায় বাস্তবতার এই চূড়ান্ত পর্যায় যে কোথায় উঠেছিল, তার সন্ধান আমরা পাই জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের জীবন চরিতের মধ্যে। ঠাকুর বাড়ীতে রামনারায়ণ তর্করত্নের বহুবিবাহ বিষয়ক 'নব-নাটক' অভিনয়ের একটি সুন্দর বর্ণনায় তিনি বলেছেন—

......"এখন হইতে বড়র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দোতলার হলের ঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া সীন্ (scene) আঁকিতে আরম্ভ করিল। ড্রপসীনে রাজস্থানের ভীম সিংহের সরোবর তটস্থ 'জগমন্দির' প্রাসাদ অঙ্কিত হইল। নাট্যোল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়া হইল।

এইভাবে কে কোন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তার সুদীর্ঘ বর্ণনার পর অভিনয় সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন ;

"অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও ভদ্র লোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি (scene) অঙ্কিত হইয়াছিল। ষ্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য

সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নাই। বন দৃশ্যের সীন খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।"

নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে মঞ্চসজ্জাকে এইভাবে বাস্তবানুগ করে তোলার পরীক্ষা-নীরিক্ষা যুগ ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দেশ্যমূলক ছিল না। নাট্যবর্ণিত বিষয়কে যথাযথ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা, এবং অনেকক্ষেত্রে (সখের থিয়েটার বলে) অন্য পরিবারের কর্ত্তাদের সঙ্গে ঐশ্বর্যের পাল্লা দেবার সুপ্ত প্রয়াস এগুলোর মধ্যে বেশীর ভাগ সময়েই প্রকটিত থাকতো।

দুই

আদি পর্ব

এখানে অবশ্য একটি কথা আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে, নাট্যসাহিত্যের মাধ্যমে দেশের সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিবিম্বন সুরু হয়েছিল, রামনারায়ণ, মাইকেলের সময় থেকেই; তা যদি না হতো তাহলে বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা, অথবা রামনারায়ণের কুলীন কুল সর্বস্ব কি দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন নাটক রচিত হতো না। হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার পর যখন সারা দেশে স্বাদেশিকতার জোয়ার দেখা দিল তখন নাট্যসাহিত্যেও তার ঢেউ লেগেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী, পুরুবিক্রম, ইত্যাদি দেশাত্মবোধক নাটকই তার প্রমাণ। কিন্তু আমাদের কথা হলো এই যে, নাট্য-আঙ্গিকের ভাষায় তার কোন প্রভাব আসেনি, ঘটনা সংস্থানকে হুবহু করে প্রতিপন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা ছাড়া। নাট্য-আঙ্গিকেরও যে একটা আলাদা ভাষা আছে,

এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগে যে নাট্যকলা জনসমাজে আরো ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এই চিন্তা নিয়ে সচেতন ভাবে কোন গবেষণা তখনও সুরু হয়নি।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যখন ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়ে প্রথম পেশাদার মঞ্চ স্থাপিত হলো, তখনও কিন্তু প্রয়োগ কৌশল বা প্রয়োগ নৈপুণ্য কথাটার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না কেউ। যদিও গিরিশচন্দ্র দৃশ্যপটের এবং পোষাক পরিচ্ছদের অভাব, মঞ্চের দারিদ্র্য ইত্যাদির জন্য প্রথমটা ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণে আপত্তি তুলেছিলেন, তবু সেই আপত্তি দৃশ্যপটের দারিদ্র্যতার জন্য; দৃশ্য, সঙ্গীত, পোষাক, ইত্যাদি সব মিলিয়ে এক অখণ্ড সুরের মালা তখনও রচনা করা সম্ভব হয়নি, বরং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে বহু সখের অভিনয়ে নাট্যবস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দৃশ্য, পোষাক, সঙ্গীত ইত্যাদি সংযোজিত করে নাট্য প্রয়োগের সুচিন্তিত প্রয়াস ছিল একথা বলা যায়।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে মঞ্চপরিকল্পনায় প্রথম যাঁর নাম করা যায় তিনি হলেন ধর্মদাস সুর। ইংরেজী থিয়েটারের প্রভাবে এবং ইংরেজ শিল্পীদের দ্বারাই নাট্যাভিনয়ের প্রাথমিক কালে যে কাপড়ের ওপর দৃশ্যপট অঙ্কিত করা হতো একথা আমরা আগেই বলেছি। ধর্মদাস সুর সেই ধারাটিই আর একটু perfection-এ আনতে চেষ্টা করেছিলেন। দৃশ্যপটে রাজপ্রাসাদ, উদ্যান-বাটিকা, কুঞ্জবন, নদী, পাহাড়, ইত্যাদি প্রয়োজন অনুযায়ী চিত্র অঙ্কিত করে অভিনয়ের সময় মঞ্চের পেছনে সেগুলো ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। বলা বাহুল্য এগুলো ছবি হিসেবে সুন্দর হলেও সমগ্র নাট্যাভিনয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিসদৃশ্য ঠেকতো চোখে। সাজাহানের রাজপ্রাসাদের দৃশ্যে মঞ্চের পেছনে একটা কাপড়ে আঁকা দরবার, তাতে সিংহাসন ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আঁকা থাকলেও অভিনেতার সেদিকে যাবার উপায় নেই। রাজপুরীর বড় বড় তোরণ দেখা গেলেও, অভিনেতার প্রবেশ পথ সেই উইংসের ফাঁক দিয়েই, তার ওপর আবার আলোক ব্যবহারের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য পেছনের দৃশ্যে পড়তো বড় বড় ছায়া, সব মিলিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করা দূরে থাক,

অভিনয়ের মাধ্যমে যেটুকু পরিবেশের সৃষ্টি হতো, তাও যেতো টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে। ধর্মদাস সুর দৃশ্যপট অঙ্কনে সাহেব শিল্পীর সাহায্যে পূর্বাপেক্ষা কিছু কিঞ্চিৎ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও, এই সব বাধা-বিঘ্নগুলি দূর করতে পারেন নি।

দৃশ্য-পরিকল্পনার মত পোষাক পরিচ্ছদও ছিল অবাস্তব, এবং অনেক সময় নাটকের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে হতো অক্ষম। এ বিষয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায় যা লিখেছেন, আমরা তার থেকে কিছুটা নিচে উদ্ধৃত করে দিলাম। হেমেন্দ্রকুমার যে শিশির কুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে মঞ্চব্যাপারে দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন তা নয়—তিনি গিরিশচন্দ্র, দানীবাবু প্রভৃতি স্বনামধন্য অভিনেতার অভিনয় কলার প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন। সুতরাং তাঁর বিবরণ থেকে গিরিশ যুগের নাট্যাভিনয়ের দৃশ্য-পরিকল্পনা, সাজ-পোষাক, ও আবহ-সঙ্গীত রচনার পদ্ধতির একটি চিত্র আমরা দেখতে পাবো। গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রযোজনা সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন

> "আগেকার দিনে বাংলা রঙ্গালয়ে নাট্যাচার্য ছিলেন, অভিনয় শিক্ষক ছিলেন, মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন এবং ছিলেন আরো কোন কোন কর্তা, কিন্তু নিজেকে প্রয়োগকর্তা বলে কেউ কোনদিন দাবী করেন নি।………গিরিশ অর্দ্ধেন্দুর যুগের নাট্যাভিনয়েও প্রথম শ্রেণীর অপূর্ব অভিনয়ের সঙ্গে যেখানে সেখানে দেখা দিয়েছে প্রয়োগ দোষের পর প্রয়োগ দোষ।"

এই প্রয়োগ দোষের বর্ণনায় শ্রীরায় লিখেছেন ;

> "গিরিশচন্দ্র ছিলেন বাংলার প্রধান নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য। নট ও নাট্যকার রূপে আজও তিনি যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছেন, এ সত্য কেহই অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু বড়ই বিস্ময়কর বিষয় যে, প্রয়োগ-কর্তা রূপে তাঁর বিশেষ কোন দানের সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। তিনি নাটক রচনা করেছেন, অভিনয় শিক্ষা দান করেছেন, নিজেও অভিনয় করেছেন, কিন্তু সমগ্র পালাটি সর্বত্র ঠিক বাঁধাসুরের সঙ্গে ছন্দ ও সঙ্গতি রেখে মঞ্চস্থ

হ'ল কিনা, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করার অবসর তিনি পেতেন বলে মনে হয় না।........

গুরুগম্ভীর সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকেও থাকতো নিছক প্রহসনের উপযোগী নাচগান। দৃশ্যপট ও সাজপোষাকের সঙ্গে স্থান-কাল-পাত্রের যোগ থাকতো না প্রায়ই। পৌরাণিক পাত্র-পাত্রীরাও এমন সব ঘর বাড়ী ও আসবাব পত্তরের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতেন, যা দেখলে স্তম্ভিত হ'তে পারতো ব্যাস-বাল্মিকীর অতি উর্বর কল্পনাও। ঐতিহাসিক নাট্যাভিনয় সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। হিন্দুযুগের কথা নয় তুললুম না, কিন্তু মুসলমান যুগের স্থাপত্য, সাজপোষাক ও আসবাব পত্তরের অসংখ্য নিদর্শন উত্তর-পশ্চিম ভারতের সর্বত্রই সুলভ। তবু থিয়েটারী আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, ও ঔরঙ্গজীব প্রভৃতি বাদশাহরা যে সব পোষাক পরতেন, যে সব সিংহাসনে বসতেন, এবং যে সব জিনিস ব্যবহার করতেন, দুঃস্বপ্নেও তা সম্ভবপর হতোনা। আমি নুরজাহানকে বিলিতী জ্যাকেট পরেও দেখা দিতে দেখেছি।.........

বখতিয়ার খিলজির যুগে রাজা লক্ষণ সেনের হিন্দু ধর্মাধিকারী পশুপতির ভূমিকায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র পরতেন যে পোষাক, অষ্টাদশ শতাব্দীর নবাব সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় দানীবাবুও সেইরকম পোষাক পরলেও তখনকার প্রয়োগকর্ত্তার রসবোধ আহত হতো না। এবং অতিশয় অসহনীয় ছিল তখনকার ঐকতানের ভয়াবহ উপদ্রব। তা কেবল সুলভ ও নিম্নশ্রেণীর ফিরিঙ্গী সঙ্গীতকেই বলপূর্বক আমাদের শ্রবণ বিবরে নিক্ষেপ করতো না। সেই অসাময়িক ও বিজাতীয় উপসর্গের জন্যে প্রত্যেক অঙ্কের শেষে যবনিকা পড়লেই একেবারে জোলো হয়ে যেতো নাটকের সমস্ত ঘনীভূত রস। কারণ মূল নাটকের ক্রিয়ার সঙ্গে ছিলনা তার কোন রকম সম্পর্কই।"

হেমেন্দ্র কুমার রায়ের এই সুদীর্ঘ উক্তি থেকেই আমরা গিরিশ-যুগের প্রয়োগ

কৌশলের একটা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারি। নাট্য-প্রযোজনায় উল্লিখিত অসঙ্গতিগুলির মধ্যে যে একমাত্র প্রয়োগ কর্তাদের দৃষ্টি ভঙ্গীরই অভাব ছিল তা আমাদের মনে হয় না। ভুললে চলবে না যে, যাত্রাগান পিপাসু বাঙালী দর্শক থিয়েটারের আসরে জাঁকিয়ে বসেছিল নতুনত্বের মোহে। বঙ্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যাত্রার নাড়ীর সম্পর্ক হলেও থিয়েটারী অভিনয়ের সঙ্গে তখনও তাদের একাত্ম যোগসূত্র রচিত হয়নি। সংস্কৃত যুগে কি ছিল না ছিল সে আলোচনা নিস্ফল, কেননা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য দশকের বাঙ্‌লা ও বাঙালী (কতিপয় শিক্ষিত মানুষ ছাড়া) সে কথা বিস্মৃত হয়েছিল। সুতরাং দর্শক সমাগমের জন্য; এককথায় নাটমঞ্চকে 'popular' করবার জন্য জাঁকজমকের বাহ্যাড়ম্বর প্রয়োজন ছিল; কিন্তু নাট্যরসানুগ করে সেই জাঁকজমকের প্রবর্তনায় অর্থের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী; তাই পশুপতির পোষাক সিরাজদ্দৌলাকে পরতে হয়েছে। ঐকতানে ফিরিঙ্গী বাজনা নতুন হলেও, যাত্রার কন্‌সার্টেরই তা পরিপূরক। ঐটুকু রুচিমাফিক না চললে যে থিয়েটারই উঠে যাবার সম্ভাবনা। সেই জন্যেই কি প্রযোজনা, কি অভিনয়, কি নাট্যরচনা, নাট্যকলার সর্বক্ষেত্রেই সে যুগে নাট্যবস্তুর স্বাভাবিকত্ব অপেক্ষা জনরুচিকে সমর্থন করে চলারই একটা ঝোঁক আমরা দেখতে পেয়েছি। প্রয়োগ কৌশলের মর্যাদা এতে বজায় থাকেনি নিঃসন্দেহে। রসিক দর্শককে নাট্য প্রয়োগের অসঙ্গতি বার বার পীড়া দিয়েছে। একথাও মিথ্যে নয়, তবু নাটমঞ্চ popular হয়েছে, আর নাটমঞ্চ popular না হলে তাকে নিয়ে কোন পরীক্ষা নীরিক্ষাই সম্ভব হয় না।

তিন

মধ্যপর্ব

কিন্তু সে যাই হোক, প্রয়োগ নৈপুণ্যের বিচারে আমাদের বলতেই হবে যে, গিরিশ-যুগে নাট্যপ্রযোজনায় অসঙ্গতিজনিত রসহানি প্রায়ই ঘটত। গিরিশচন্দ্র দেহরক্ষা করেছেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। তার দু' এক বছর আগে

থাকতেই তিনি মঞ্চাভিনয় থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, আর শিশির কুমারের নাটমঞ্চে প্রথম আবির্ভাব ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। এই আট-দশ বছর রঙ্গমঞ্চে ছিল অবক্ষয়ের যুগ। অভিনয় ও প্রয়োগ কলায় পুরোণ রীতির গতানুগতিক চর্বিতচর্বনে রঙ্গমঞ্চ তখন ক্রমশই একঘেয়ে হয়ে উঠছিল। তবে এই যুগে অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে নাট্য-প্রয়োগকলায় গিরিশচন্দ্রের পর আর একজন নাট্যসাধকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। নাট্যপ্রয়োগে অমরেন্দ্রনাথ অনেক কিছু সচেতন পরিবর্তনের সূত্রপাত করেছিলেন। মঞ্চসজ্জা ও পোষাক পরিচ্ছদে গতানুগতিকতার রীতি কাটিয়ে প্রয়োগকলায় আর এক নতুনত্বের চমক এনেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ।

নাট্যপ্রযোজনায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন রিয়ালিজম বা বাস্তবতার পক্ষপাতী ; তাই প্রাচীন গতানুগতিকতা তিনি কোন কারণেই সহ্য করতে পারেন নি। নাট্য-প্রযোজনায় দৃশ্যপট, আসবাব পত্র ইত্যাদির ব্যবহার তিনি বাস্তবানুগ যথাযথ করার চেষ্টা করেছিলেন। এ সম্পর্কে ১৩৪৭ সনের আনন্দবাজার পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় শ্রী নরেন্দ্র দেব লিখেছিলেন ;

> "স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বহু অর্থব্যয় করে আমাদের নাট্যশালার দৃশ্য-পটে ও সাজ সজ্জায় নূতনত্ব আনবার জন্য যত্নবান হয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম সংস্কারক বলা চলে তাঁকেই। ক্লাসিক থিয়েটারের—আমল থেকেই ঠ্যালা-সীন, কাটা-সীন, বক্স-সীন, পরিবর্ত্তনীয় উইংস; ও প্রোসিনিয়ম, এবং যবনিকা হিসাবে প্রথম 'কার্টেন' ব্যবহার হয়। রঙীন আলো, স্পট লাইট প্রভৃতিরও প্রচলন হয়।"

ইতিপূর্বে মঞ্চে দৃশ্যসজ্জায় আঁকা সিনের-ই প্রাদুর্ভাব ছিল এবং সেগুলি যে কী পরিমাণে বাস্তব পরিবেশকে ব্যঙ্গ করতো, তা আমরা উল্লেখ করেছি। অমরেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত এই দৃশ্য-সজ্জার প্রবর্তন পূর্বের চেয়ে প্রযোজনার রূপরীতিকে যে আরো বাস্তব ও পরিবেশ সৃষ্টির অনুকূল করে তুলল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আসবাব পত্র বা stage requisites-এর ব্যাপারেও

অমরেন্দ্রনাথ লক্ষণীয় পরিবর্তন নিয়ে এলেন। এর আগে প্যাকিং বাক্স কেটে রঙীন কাপড়-চোপড় জুড়েই নকল আসবাব তৈরী করা হতো ; কিন্তু নাট্য-প্রযোজনা করতে গিয়ে সেই সব নকল আসবাব যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টিতে অপারক দেখে অমরেন্দ্রনাথ দৃশ্য-সজ্জার মত সেগুলিরও আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসেন। এ বিষয়ে নরেন্দ্র দেবের কথা পুনর্বার স্মরণীয়।

> "অমরেন্দ্রনাথই স্টেজে আসল সরঞ্জামের ব্যবহার প্রবর্তন করেন। খাট, আলমারী, টেবিল, চেয়ার, সোফা, আয়না, ছবি, ইত্যাদি স্টেজের ওপর সাজিয়ে এই সময় থেকেই রঙ্গমঞ্চকে এক বাস্তবরূপ দেবার চেষ্টা চলতে লাগল।"

প্রযোজনার ক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনাথ realism বা বাস্তবতার কতখানি পক্ষপাতী ছিলেন তা তাঁর নাট্য প্রযোজনার কয়েকটি উদাহরণ থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ধরা যাক, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসটির নাট্য-রূপের কথা ; উক্ত উপন্যাসে বারুণী পুকুরে রোহিণীর আত্মহত্যার ঘটনাটির কথা স্মরণ নেই, এমন ব্যক্তি বাঙ্‌লা দেশে নেই, একথা জো করেই বলা যায়।

কৃষ্ণকান্তের উইল নাটকে বারুণী পুষ্করিণীতে রোহিণীর ঝাঁপ দেওয়া এবং গোবিন্দলালের তাকে উদ্ধার করার দৃশ্যটি অমরেন্দ্রনাথ উপন্যাস অনুযায়ী মঞ্চে যথাযথ ভাবে প্রযোজনা করতেন। মঞ্চের পেছন দিকে বারুণী পুষ্করিণীর অঙ্কিত দৃশ্যপট ব্যবহার করলেও পুষ্করিণীর তীরে, দুপাশে কাঠের রক তৈরী করে একটা ঘাটের দৃশ্য রচনা করা হতো। আর সেই পুকুর আর ঘাটের মধ্যবর্ত্তী একটা গুপ্ত ফাঁকা অংশ থাকতো যা দিয়ে খুব সম্ভব মঞ্চের নীচে নেমে যাওয়া সম্ভব হতো অভিনেতাদের। রোহিণী আত্মহত্যা কল্লে যখন এই ফাঁকা জায়গাটি দিয়ে নেমে যেত, তখন গোবিন্দলাল, সিক্তবসনা, অচৈতন্য রোহিণীকে নিয়ে উঠে আসতেন মঞ্চে।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নাট্যরূপের প্রযোজনাতেও এই ধরনের বাস্তবতা আনার চেষ্টা করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। ভীমাপুষ্করিণীতে যখন শৈবলনী ঝাঁপ দিতো তখন জল ছিটিয়ে উঠতো মঞ্চে, প্রতাপ ও শৈবলনী সাঁতার কাটার পর ভিজে কাপড়ে উঠে আসতো মঞ্চে। এসব ছাড়াও জলপ্রপাত, ঝরণা,

সত্যিকারের ঘোড়ায় চড়ে "অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলালের" মঞ্চে উপস্থিতি, আকাশে উড়ে যাওয়া, মহাশূন্যে দেবতার আবির্ভাব, ঝড়বৃষ্টি, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, বিদ্যুৎ-চমক, ফোয়ারা থেকে সত্যিকারের 'জল ওঠা' ইত্যাদি তো অধিকন্তু ছিলই। এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্র দেব বলেছেন,

> ..."ট্রেণের শব্দ, রিভলবার ও পিস্তলের সশব্দে অগ্নি ও ধূম উদ্গীরণ, রঙ্গমঞ্চে কুকুর, বিড়াল, পাখী, পায়রা প্রভৃতি জীবজন্তু ও পশুপক্ষীর আবির্ভাব এই সময় থেকেই সুরু হয়েছিল।"

বলা বাহুল্য, এ সবই হলো মঞ্চে বাস্তবতা আনার প্রাণান্তকর প্রয়াস, এবং ইতিপূর্বে উল্লিখিত, অরণ্যে সত্যিকারের জোনাকী আটা দিয়ে এঁটে দেওয়া পন্থারই পরিপূরক। তবে একথাও সত্যি যে অমরেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত এই রীতির অনুকরণ আজও আমাদের পেশাদার রঙ্গমঞ্চে প্রচলিত। সাম্প্রতিক কালে স্টার থিয়েটারে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত নাটকের গঙ্গায় মাছধরা, বা "শেষাগ্নি" নাটকের চলমান ট্রেণের দৃশ্য, এই রীতিরই প্রভাব পরিপুষ্ট।

অমরেন্দ্রনাথের পর প্রযোজক হিসেবে উল্লেখ করতে হয় নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর কথা। এবং বোধ করি প্রয়োগনৈপুণ্য কথাটির সার্থক অর্থে প্রয়োগও এই সময় প্রথম। কেননা সাজ পোষাক, দৃশ্যপটের জাঁকজমক বা বাস্তবতাই প্রযোজনার মূল কথা নয়, তার মৌল উদ্দেশ্য হলো নাট্য-বস্তুর সঙ্গে সবকটির সুসম মিলন ঘটিয়ে একটি ছন্দোময় মালিকার সৃষ্টি করা।

অমরেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত রীতি পদ্ধতি সেই উদ্দেশ্যে পৌছাবার সোপান রচনা করলেও তা সার্থক লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারেনি। বরং পরবর্ত্তী কালে এগুলির আরো অতিরঞ্জিত ব্যবহারই আমরা দেখেছি। যেমন ম্যাডান থিয়েটারে। ম্যাডান থিয়েটার গণেশ-জন্মে শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডচ্ছেদ পর্যন্ত দেখিয়েছেন, কালীদহে পদ্মাসনা কমলে-কামিনী মূর্ত্তি, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, কোন কিছুই দেখাতে তাঁরা বাদ দেননি। তার ওপর ছিল হুরী পরীর নাচ। বাঙ্‌লা নাট্য প্রযোজনায় সবচেয়ে চক্ষুশূল ছিল এই সখী নাচ। বলা নেই কওয়া নেই কোথা থেকে একদল সখী মঞ্চের ওপর লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে নাচের মত অঙ্গভঙ্গী করে চলে গেল, অনেক সময়ই সুর-তাল-ছন্দ, সবটাই

হতো কদর্য এবং শ্রুতিকটু। তবু জনরুচির সমর্থনে প্রযোজকরা এই সখীদের অবহেলা করতে পারেন নি—করেনও নি ইচ্ছে করে। এমন কি আধুনিক কালে প্রয়োগাচার্যদের যিনি গুরু, অর্থাৎ বাঙ্‌লা নাট্য প্রযোজনায় যিনি 'প্রয়োগ কৌশল' শব্দটি সর্বপ্রথম সার্থক অর্থে পরিস্ফুটিত করলেন, সেই সর্বজন বন্দিত নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীও এই সখীদের প্রভাব থেকে রেহাই পাননি। তাঁর মত সার্থক প্রযোজকের রুচির ফাঁক দিয়েও এই সখীরা মঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে. মাইকেল মধুসূদনের মত বলিষ্ঠ জীবনী নাট্যেও সাঁওতালী বালিকা হয়ে নেচে গেছে তারা। স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্‌ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা।

চার

আধুনিক পর্ব

কিন্তু সে যাই হোক এবার আমাদের দেশের নাট্য প্রযোজনা পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে আসা যাক। এই অধ্যায়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র শিশিরকুমার ভাদুড়ী। বাঙ্‌লা নাটকের প্রথম সার্থক প্রয়োগকর্তা।

নাট্যবস্তুর mood বা ভাবানুযায়ী যথাযথ পরিবেশ রচনায়, শিশিরকুমারই সর্ব প্রথম মনোনিয়োগ করেন। ইতিপূর্বে যে সব রীতি প্রচলিত ছিল সেগুলি (বিশেষ করে অমরেন্দ্রনাথের কালে) নাট্যবস্তুর mood সৃষ্টিতে সক্ষম হলেও, সমগ্র প্রযোজনাকে এক সুরে বেঁধে রাখতে পারতেন না। প্রথমে লাইট বা আলোকের কথাই ধরা যাক। পাদ-প্রদীপের সামনে ফুটলাইট ব্যবহার ছিল শিশির-পূর্ব যুগের নাট্য প্রযোজনার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই ফুটলাইটের উজ্জ্বল বর্ণ সমারোহ অভিনেতার ভাব ব্যঞ্জনাকে দর্শক সমক্ষে পরিস্ফুটিত করতে সক্ষম হলেও, নাটকীয় দৃশ্যের মধ্যে চরম অবাস্তবতার সৃষ্টিই করতো। নীচে থেকে আলো যাওয়ার ফলে, অভিনেতাদের বিরাট ছায়া পেছনের দৃশ্যে হতো প্রতিবিম্বিত। মনে করা যাক, কোন অভিনয়ের ঘটনাস্থল নগাধিরাজ হিমালয়ের পটভূমিকায়। মঞ্চে দৃশ্যনির্মাতা বহু পরিশ্রমে

কাঞ্চনকিরীট শোভিত হিমালয়ের এক জমকাল পট এঁকে ঝুলিয়ে দিলেন। কিন্তু তার সামনে যখন অভিনেতা এসে দাঁড়ালেন, তখন ফুট-লাইটের কল্যাণে তাঁর ছায়া গিয়ে পড়লো সেই অভ্রভেদী তুষার কিরীটি হিমালয়ের শৃঙ্গকেও ছাড়িয়ে। এই ভাবে দৃশ্যপটে অঙ্কিত তিনতলা বাড়ীর ছাদের ওপরে, কিম্বা মহাকাশের নীলিমায় অভিনেতার ছায়াশরীরে'র ছিল অবাধ গতিবিধি। দর্শকরা এটা সহ্য করতেন, আর প্রযোজকরাও এদিকে দৃষ্টি দিতে অবকাশ পাননি। শিশিরকুমারই প্রথম এই ফুট-লাইটের দৌরাত্ম্যের হাত থেকে মঞ্চকে বাঁচালেন। সীতা নাটক প্রযোজনার সময় আলোক-সম্পাতের ব্যবস্থা হলো মঞ্চের ওপর এবং আশপাশ দিয়ে, ফুট-লাইট পাঠিয়ে দেওয়া হলো নেপথ্যের নির্জনে। বেশভূষার অসাম্যকেও তিনি ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা যথাসাধ্য কালানুগ করার চেষ্টা করেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের পাত্র-পাত্রী যে পোষাকে সজ্জিত হতেন, সিরাজদ্দৌলা নাটকে সেই পোযাকে কথনই সজ্জিত হতেন না। মৌর্য-যুগের ইতিহাস থেকে সে যুগের লোকজনের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণার পর, চন্দ্রগুপ্ত নাটকের পাত্রপাত্রীদের অঙ্গরচনা করা হয়েছিল। দৃশ্যপট নির্মাণও সুরু হলো ঐ একই রীতিতে। যুগ অনুযায়ী স্থাপত্য নিদর্শনের ইতিহাস পাঠে, বা সম্ভাব্য স্থলে ভ্রমণ করে স্বচক্ষে সেই সব স্থাপত্য-শিল্প দর্শন করে তবেই নাটকের দৃশ্যপট রচনা করা হতো। এবং কাপড়ে আঁকা সীনের বদলে কাঠের সেটীংস ব্যবহার করে দৃশ্যপটে ডাইমেনসনের effect আনার চেষ্টা করা হয়। বিখ্যাত মঞ্চস্থপতি গর্ডন ক্রেগ বলেন, মঞ্চের দৃশ্যে এমন কোন দরজা জানালা ইত্যাদি থাকা উচিত নয়, যা নাটকের অভিনেতারা ব্যবহার করতে পারবেন না। কিন্তু আমাদের মঞ্চের দৃশপটে যে আঁকা দরজা জানালার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল তা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই অবাস্তবতাকে নাট্যচার্যই সর্বপ্রথম দূর করেন তাঁর 'সীতা' নাটক প্রযোজনার সময়।

'আবহসঙ্গীতেও পরিবর্তন সাধিত হয়। দৃশ্যশেষে কেবলমাত্র কন্‌সার্ট বাজানর জন্য যে আবহসঙ্গীত নয়, সেও যে নাট্যবিষয়ের mood সৃষ্টিতে সক্ষম, একথা প্রথম জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা হয় সীতা প্রযোজনায়। জাতীয় সঙ্গীতের

রাগরূপের মাধ্যমে রামায়ণ-কাহিনীর রসব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা হয়েছিল সীতা নাটকের আবহ-সঙ্গীতের পরিচালনায়। ফলকথা মঞ্চ-প্রযোজনার সবকটি আঙ্গিকের মধ্যে একটা রুচিকর সুসম ছন্দোবদ্ধতা আমরা শিশিরকুমারের প্রযোজনাতেই সর্বপ্রথম দেখতে পাই। তাঁর সময়েই মঞ্চ ও আলোক-শিল্পীর যথেচ্ছাচারের অবসান ঘটে। সকলের সচেতন এবং গবেষণাত্মক সহযোগিতায় নাট্যকলা যে যৌথশিল্পের প্রেরণাজাত, সে কথাটি জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবশ্য, পরিবর্তন আনলেও এবং নাট্যবস্তুর পরিপূর্ণ বিকাশে দৃশ্য, আলোক, রূপসজ্জা, সঙ্গীত ইত্যাদির সুসম নিয়ন্ত্রণ যে কতখানি আবশ্যিক, একনিষ্ঠ সাধনা ও ঐকান্তিকতার দ্বারা সেই সত্য পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করলেও গতানুগতিক রীতিকে নাট্যাচার্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন নি। বক্স-সেটীংসের সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ে আঁকা দৃশ্যপটও তাঁর প্রযোজনায় ছিল। ইদানীং কালে শ্রীরঙ্গম নাটমঞ্চে সাজাহান নাটকের প্রযোজনায় কাপড়ে আঁকা তাজমহল, বা আলমগীর নাটকে 'শিবিরের' পট আমরা দেখেছি। সখীদের কথা তো আগেই বলেছি ; ফুটলাইট অবশ্য ছিল না।

পরিবর্তন এসেছে আরো পরে। যখন গতানুগতিক নাট্যধারা আগষ্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে হলো বিপর্যস্ত। দুভিক্ষ আর মহামারীর কবলে পর্যুদস্ত সমাজ যখন বাঁচার জন্য সূচ্যগ্র ভূমিও খুঁজে পেলনা ; সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অভাব, অনটন,যখন নৈতিক অবনতি আর ব্যভিচারের পঙ্কিল স্রোতে জীবন-পথকে কর্দমাক্ত করে তুলল, সেই সময় গতানুগতিক জীবনবোধের নব-মূল্যায়নের পর্বে এসে ট্রাডিশনাল থিয়েটার থমকে দাঁড়াল অকস্মাৎ। শ্রীরঙ্গম নাটমঞ্চে 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় দেখে স্তম্ভিত নাট্যাচার্য, নতুন যুগের নট-নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যকে অভিনন্দন জানালেন। যে 'বিসর্জন' নাটকের শেষ জয়সিংহের মৃত্যুর পরেই হওয়া উচিত ছিল বলে তিনি মনে করতেন, এবং তারপরের দৃশ্যগুলি অভিনয় অপেক্ষা পঠনের মধ্য দিয়েই রসচর্বনার পক্ষে সার্থক হবে বলে ছিল তাঁর বিশ্বাস, নতুন চিন্তাধারায় নব আঙ্গিক সৌষ্ঠবে সজ্জিত হয়ে ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় যখন তা দীর্ঘদিন পর শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ হলো, তখন নাট্যাচার্য সেই অভিনয় দেখে পূর্বেকার মতামত পরিবর্তন

করেছিলেন বলে শোনা যায়। নাট্য-প্রযোজনার ইতিহাসে এ হলো আর এক নতুন পর্ব। অতি-আধুনিক পর্ব বলেই বর্তমানে সে যুগটিকে আমরা চিহ্নিত করবো।

পাঁচ

অতি-আধুনিক পর্ব

আমাদের নাট্যধারায় অতি-আধুনিক পর্ব সুরু হয়েছে ১৯৪২-এর পর থেকে। নাট্য-সাহিত্যের ভাব ও ভাবনা এবং তার প্রয়োগরীতির অঙ্গ রচনায় যে নতুন চিন্তার প্রতিচ্ছায়া দেখা গেল, সেই নবত্ব-টুকুই আমাদের বর্তমান নাট্য-সাহিত্যের এবং নাট্য-আন্দোলনের পূর্বে 'নব' বিশেষণটি জুড়ে দিয়েছে। আজকের নাটক বা নাট্য-আন্দোলনকে আমরা তাই বলি নবনাট্য-আন্দোলন। কথাটায় অনেকে রাগ করেন। নব-নাট্য কথাটা শেষ হোক, এমন মন্তব্যও দেখতে বা শুনতে পাই মাঝে মাঝে। কিন্তু রাগের কারণটা বুঝি না। নতুনত্ব ব্যাপারটা চিরকালই যুগ-নির্ভর। এক যুগের ভাবনা চিন্তা যখন আর একটা যুগের কালসীমায় এসে পৌছায় তখন স্বাভাবিক ভাবেই তার কিছু পরিবর্তন-পরিবর্জনের দরকার হয়। কেন না যুগ ও জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনবোধের ব্যাপারটাও বদলায়। আর এই বদলানটুকুই তো নবত্ব। গিরিশচন্দ্রের পূর্ববর্তী যুগে যে নাট্যধারা ছিল, তার তুলনায় গিরিশচন্দ্র একটু নতুনত্ব এনেছিলেন নিশ্চয়, আর সেই বিশেষত্বটুকুও তখনকার নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে নতুনই ছিল।

আসল কথা, আধুনিক নাট্য-ধারায় এবং তার প্রয়োগ-কৌশলে যে দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তন এসেছে, অর্থাৎ নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন, বিশ্লেষণে, এবং সেই বিষয়বস্তুকে মঞ্চে রূপায়িত করতে যে নবতর আঙ্গিকের নিয়োজন শুরু হয়েছে, বিগতকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তাকে পুরাতন বা গতানুগতিক ধারার উন্নত সংস্করণ বলা যায় না। সেইজন্যই আজকের

নাটককে নবনাট্য বলতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। নবনাট্য আন্দোলন নামের শেষ হোক, একথা মাঝে মাঝে শোনা গেলেও এখনই যে তার পরিণতি আসার সময় হয়নি তা আমাদের বলতেই হয়, কেননা এখনও নাটকের মধ্য দিয়ে সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে অতিক্রম করে নবতর কোন পথের সন্ধান বা ইশারা আমরা দেখতে পাইনি ; বরং গতানুগতিক নাট্যধারার অনুকরণও এখন যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ আজও শেষ হয় নি। যেদিন হবে, সেদিন নাট্যকাররা আরো নতুন কোন বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবনবোধের প্রতিষ্ঠা করবেন নাটকে, যেদিন প্রয়োগ-কর্তা আধুনিক রীতির প্রয়োগ-পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে আরো ব্যাপকতর কোন পদ্ধতির আবিষ্কার করবেন, আধুনিক নব-নাট্যের কালান্তর পর্ব সুরু হবে সেইদিন, আর সেটা আপনা থেকেই, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই দেখা দেবে।

নবনাট্য নিয়ে এই বিতর্কের আসরে অনেক কথাই উঠে পড়েছে। অনেকের মতে 'নীলদর্পণ' বা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' থেকেই নব-নাট্যের উৎস-মুখের অনুসন্ধান করা যায়। আমাদের মনে হয় কথাটা আংশিক সত্য। 'নীলদর্পণের' অথবা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র' বক্তব্যটাই নব-নাটক জোর করে প্রতিষ্ঠিত করে নি! তার নতুনত্ব বা নবত্ব অন্য জায়গায়। এ প্রসঙ্গে সেই নতুনত্বের আলোচনা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কেননা সেই নতুনত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রয়োগকলা সম্পর্কে নবতর ধ্যান-ধারনা, যেটা নাকি ট্রাডিশনাল মঞ্চের প্রয়োগরীতিকে অস্বীকার করে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে বলে আজকের বিশ্বাস।

নব-নাট্যের কথায় আমরা নাটকের বিষয়বস্তুর নির্বাচন এবং বিশ্লেষণের নতুনত্বের একটা কথা ওপরে উল্লেখ করেছি ; এখন সেই নতুনত্বটুকুর পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

মাইকেল মধুসূদন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামে যে প্রহসন রচনা করেছিলেন, তার মৌল উদ্দেশ্য ছিল ভোগ-লালসাসিক্ত বিত্তশালী জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার। হানিফ গাজী আর ফতিমার যে চরিত্র তিনি এঁকেছেন, তারা চাষী, চাষীসুলভ সংস্কার-বিশ্বাস, রুক্ষতা-কর্কশতা সবই তাদের মধ্যে

প্রতিফলিত। কিন্তু সেই চাষী তখনও মধ্যবিত্ত বা বিত্তশালী জমিদারের প্রতি আস্থাবান, তাদের করুণার ভিখারী। হানিফ গাজীর বিবি ফতেমার ওপর নজর দিয়ে যে অপরাধ ভক্তপ্রসাদবাবু করেছিলেন তার পরিণামে তাঁর যে প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নি ; কেননা জমিদারের যথেচ্ছারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে তখনও সাধারণ মানুষে শেখেনি। আর শেখেনি বলেই ভক্তপ্রসাদ কেবলমাত্র অনুতপ্ত হয়ে, এবং কৃতকর্মের ফলস্বরূপ হানিফকে দু'শো টাকা দিয়ে রেহাই পেলেন।

"ভক্ত॥ দু-শো-টাকা! ও বাবা আমি যে ধনে প্রাণে গেলেম বাচপৎ দাদা, কিছু কমসম্ কি হয় না?

বাচ॥ আজ্ঞে না, এর কমে কোন মতেই হবে না।

ভক্ত॥ (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখলেম যে, এই কর্মের দক্ষিণান্ত এইরূপেই হওয়াই উচিত। যা হোক ভাই, তোমাদের হতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার করবো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করি যে, এমন দুর্মতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।"

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এ চিন্তা সংস্কারমূলক। ভক্তপ্রসাদ যে অপরাধ করেছিলেন, তা ফতিমা না হয়ে, অন্য যে কোন শ্রেণীর মেয়েদের প্রসঙ্গেও তাই করতে পারতেন, এবং পরিণামে নাজেহাল হয়ে অপরাধ স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত করতে তাঁর আটকাতো না। কিন্তু হানিফের কি হলো? তার মনুষ্যত্ব কি কেবলমাত্র দুশো টাকার বিনিময়ে সাব্যস্ত হয়? ফতিমার ওপর লুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে তাকে ঘরের বার করার চেষ্টা করে ভক্তপ্রসাদ তার সংস্কার, তার ধর্মবোধের ওপর যে লজ্জা এবং আপমানের বোঝা চাপিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে হানিফের কোন প্রতিবাদ নেই, দুশো টাকা পেয়েই সে শান্ত। টাকা ছাড়া তাদের মর্যাদার আর কোন প্রশ্নই সেখানে ওঠেনি।

মধুসূদনের প্রহসন ব্যঙ্গাত্মক! মানবতার দিক থেকে ভক্তপ্রসাদ যাতে অমন কাজ না করেন, পাপচিন্তা দূর করে ভালো হন, এই ত ছিল তাঁর বক্তব্য! এ বক্তব্য সংস্কারপন্থীর। আধুনিক নবনাট্যকারের দৃষ্টি কখনই এই আপোষের মধ্যে যেতো না। অত্যাচারিত ভক্তপ্রসাদ দুশো টাকা দিয়ে রেহাই পেতেন না তার কাছে। আজকের "বুড়ো শালিক" নাটকের locous ভক্তপ্রসাদে নয়, হানিফের ওপর সীমাবদ্ধ থাকতো, চেষ্টা হতো হানিফ এবং তার তাবৎ সমাজকে নতুন মূল্যে বিচার করবার।

'অত্যাচারী জমিদার অথবা বিত্তসম্পন্ন অভিজাত শ্রেণীর যথেচ্ছাচার, বা কামনা-কলুষ ভোগবাসনার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বাঙ্‌লা সাহিত্যে নতুন নয়। গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন উৎসবে প্রকাশ্যে এই সব কেচ্ছা-কাহিনী নিয়ে গান-বেঁধে কবিরা ভাব প্রকাশ করেছেন। মালদহের গম্ভীরা, বা এদেশের শিবের গাজন উপলক্ষ্যে এ ধরনের বিদ্রুপাত্মক গান জনসমাজে প্রচলিত ছিল। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ!' সেগুলোরই শিল্পসম্মত সাহিত্যিক রূপ।

নীলদর্পণের প্রসঙ্গতেও এই একই কথা বলতে হয়, যদিও নীলদর্পণ মাইকেলের প্রহসনের চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ রচনা।

কিন্তু সে রচনাও মধ্যবিত্ত জীবনের ট্রাজিডীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তোরাপ এবং তার চাষী সম্প্রদায় নাটকে এলেও, মূলত নাট্য-ঘটনা সীমাবদ্ধ নবীনমাধবদের পরিবারের মধ্যেই। আর নীলকরদের বিরুদ্ধে নবীন-মাধবের অভিযান অনুনয়-বিনয়ের মধ্য দিয়ে।

তোরাপের এবং তার সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যাচারীদের প্রতি যে অবরুদ্ধ আক্রোশ তা সর্বাত্মকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেনি নবীনমাধবের অবেগাত্মক মনোভাবের জন্যে। তাই সরল চাষী-সম্প্রদায়ের সেই অবরুদ্ধ ক্রোধ সাহেবের নাক কাটার মধ্যে প্রকাশ করেছে নিজেকে, আর মধ্যবিত্ত মানস সেই ছিন্ন-নাসাকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে 'justify' করেছে।

নীলদর্পণ ইত্যাদি নাটকের এই দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ একটু অনুসন্ধান করলে সেদিনের সমাজ চেতনার মধ্যেই তা পাওয়া যাবে। শিক্ষিত মানসে সেদিন রাজনৈতিক সচেতনতা সীমাবদ্ধ ছিল সমাজ সংস্কারের বিশ্বাসের মধ্যেই।

ব্রিটিশ রাজতন্ত্রকে সমূলে উচ্ছেদ করার চেয়ে শাসনতন্ত্রে বাঙালীর অধিকার বজায় করাই ছিল বড় কথা। গান্ধীজি তখনও আসেন নি। জনতাকে সঙ্ঘবদ্ধ করে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সচেতন-সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবার ভার তখনও নেননি সমাজ-নেতারা। তাই নবীনমাধবের নেতৃত্বে তোরাপ এবং তার সম্প্রদায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল না। সমগ্র নাটকটাই অত্যাচারের একটা যথাযথ দর্পণ রূপে চিত্রিত হলো।

এলেন গান্ধিজী। অনুনয়-বিনয় নয়, সার্বিকভাবে ব্রিটিশরাজ-তন্ত্রের বিরোধিতা করে তিনি শোনালেন স্বাধীনতার মন্ত্র। সঙ্ঘবদ্ধ করলেন জনতাকে। 'Do or die' এর বাণী ঝঙ্কৃত হলো মহাত্মাজীর বলিষ্ঠ কণ্ঠে। তোরাপের দলও সঙ্ঘবদ্ধ হলো দাদাঠাকুর আর ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে। অচলায়তন, মুক্তধারা নাটকের মধ্য দিয়ে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পথে আমাদের নাট্য-সাহিত্য আর এক ধাপ অগ্রসর হলো। নবীনমাধব তোরাপকে পরিচালিত করতে পারেন নি, হানিফের ক্রোধের হাত থেকে ভক্তপ্রসাদ দুশো টাকা দিয়েই রেহাই পেয়েছিলেন, কিন্তু দাদাঠাকুর আর অত্যাচারিত জনতাকে সে ভুল করতে দেননি। তাই তাঁর নেতৃত্বে অচলায়তনের প্রাচীর তারা ধুলিসাৎ করে দিয়েছিল; শিবতরাই-এ জলের জন্য জানিয়েছিল, দুর্জয় প্রতিবাদ।

নবনাট্য-ধারার যে বীজ 'নীলদর্পণ' অথবা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে সবে মাত্র বপন করা হয়েছিল, তারই অঙ্কুরোদ্গম আমরা লক্ষ্য করি অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী ইত্যাদি নাটকে। আর তারও পরবর্তী কালে, অর্থাৎ ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের পর, সেই অঙ্কুর মহীরুহে পরিণত হলো জবানবন্দী, নবান্ন, মোকাবিলা, তরঙ্গ, ছেঁড়াতার, দুঃখীর ইমান ইত্যাদি নাটকের মধ্য দিয়ে। সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গণ-সংগঠনের দিকে ঝোঁক গেল আমাদের সমাজ-নেতাদের, যখন তাঁরা দেখলেন যে, অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র গঠনের পথ, যখন তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ জনতার শক্তিতে আস্থা স্থাপন করে অত্যাচারী সরকারকে বজ্রনির্ঘোষিত কণ্ঠে আদেশ করলেন "ভারত ছাড়।" আর এই

সঙ্গে শুধুমাত্র ইংরেজ রাজ-সরকারের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানালোনা মানুষ, তাদের আশ্রিত দেশীয় সুবিধাবাদী ভূস্বামীদের বিরুদ্ধেও সুরু হলো বিক্ষোভ।

রুশিয়ায় জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে লেনিনের নেতৃত্বে যে গণবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এবং আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় রুশিয়ায় Traditional Theatre-এর পথ ছেড়ে Peoples'Theatre-এর জন্ম হয়েছিল। আমাদের দেশেও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ইংরেজ রাজ-সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ দেখা দিলো, তারই পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম নিল গণ-নাট্যের চিন্তা। কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, হানিফকে দুশো টাকা আক্কেল সেলামী দিয়ে ভক্তপ্রসাদ আর রেহাই পেলেন না, সাহেবের নাক কাটার পর রাতের অন্ধকারে তোরাপকে আর পালিয়ে বেড়াতে হলো না, বরং তার দলবল সমেত সে স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলো নাটমঞ্চে। নীলদর্পণের সমাপ্তি বিন্দুমাধবের নারীসুলভ হতাশ ক্রন্দনে, কিন্তু সব কিছু দুঃখকষ্টের পর 'নবান্নের' শেষ হলো যৌথখামার প্রতিষ্ঠার আনন্দ উৎসবের মধ্যদিয়ে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই নবত্বই আজকের নাটককে নবনাট্য-আন্দোলন নাম দিয়েছে। যেদিন এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তনের পথ ধরে আর এক পরিণতির সম্মুখীন হবো আমরা, সেদিন আপনা থেকেই এ নাম ঘুচে যাবে।

নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং তার বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই নাটকের উপস্থাপনা-রীতির অর্থাৎ প্রয়োগ-কৌশলের পরিবর্তন এলো স্বাভাবিক ভাবেই। আর এই পরিবর্তন নাট্য-প্রয়োগের অভিনয়, প্রযোজনা এবং পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগেই সুরু হয়েছে।

একদিন ছিল যখন নাটক সীমাবদ্ধ থাকতো পৌরাণিক, ঐতিহাসিক অথবা নাগরিক জীবনের সীমারতির মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ। বিত্তবান বা মধ্যবিত্তের আসরে তখন অভিনেতাদের চরিত্ররূপায়ণ পদ্ধতির মধ্যে সুষ্ঠু আবৃত্তি, গলার জোর, স্বেদ কম্প ইত্যাদি মোটামুটি কতকগুলো ভাবের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে চরিত্রকে পরিবেশন যোগ্য করে তুললেই চলতো। আর এই অভিনয়-ক্রীড়ায় চরিত্রটি উপভোগ্য করে তুলতে ব্যক্তিগত প্যাঁচ-পয়জার দেখাতেও অভিনেতারা দ্বিধাবোধ করতেন না। এই ব্যক্তিগত প্যাঁচ-পয়জারের অনেক সরস কাহিনী, বিশেষ করে

bination night উপলক্ষ্যে আমরা শুনেছি। আবার মদ্যপান করে বে-সামালও হয়ে গেছেন কোন কোন অভিনেতা এবং যার জন্য বহুরাত্রি মাঝপথেই অভিনয় থামিয়ে দিতে হয়েছে এমন কাহিনীও জনসমাজে অপ্রচলিত নেই। বলা বাহুল্য নাট্য-কলা ব্যক্তিগত প্রতিভা-প্রদর্শনের ক্ষেত্র এবং পরিশুদ্ধ চিত্তরঞ্জনকারী বলে মনে করার জন্যই এইসব ঘটনা ঘটেছিল। নবযুগের নাট্য-প্রযোজনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই চিন্তার পরিবর্তন সাধন। বিখ্যাত রাশিয়ান প্রযোজক মায়ারহোল্ড বড় গলায় ঘোষণা করলেন, শিল্প রাজনীতি-বিবর্জিত নয়; নাট্য-প্রযোজনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সচেতনতা আনাই হল গণনাট্যের ধর্ম।

> "Art cannot be non-political. Art is class art and the theatre is the tribune of agitat ion."

শিল্পকে রাজনীতির বাহন বলে মেনে নিতে আমরা রাজী নই, তবু নবনাট্যের প্রাথমিক যুগে মায়ারহোল্ডের এই বাণী আকৃষ্ট করেছিল প্রযোজকদের। তাই গতানুগতিক ধ্যান-ধারণা যে শুধু নাটক থেকে নির্বাসিত হলো তাই নয়, নাট্য-প্রযোজনাও শহরের অভিজাত মঞ্চসীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখার তাঁরা বিরোধী হয়ে উঠলেন। হাটে-মাঠে, গ্রামে-গ্রামান্তরে বেরিয়ে পড়লেন নাটক অভিনয় করে দেশের তাবৎ মানুষকে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস, তাদের আচার-আচরণ, তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমাজ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলবার জন্য। তারকা-পদ্ধতির প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি লুপ্ত হলো, সকল চরিত্র-শিল্পীর যৌথ প্রেরণার সুসম ছন্দস্পন্দনের মধ্য দিয়ে নাটকের বিষয়-বস্তুকে বিকশিত করে তুললেন তাঁরা। Group-acting বা যৌথ অভিনয়-চেতনার সূত্রপাত হলো।

চাষী মজুর ইত্যাদি চরিত্রে রূপদানের জন্য আপন মনের ভাব-কল্পনার খোলস ছেড়ে অভিনেতারা বেরিয়ে পড়লেন পথে। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হলো তাঁদের অভিজ্ঞতার ঝুলি। গতানুগতিক নবরসের ব্যঞ্জনা কৌশল ভুলে, তাঁরা জীবনকে যেমন দেখেছেন, তেমন ভাবে ফুটিয়ে

তুলতে চাইলেন। রোমান্টিসিজমের থেকে অভিনয় ধারা রিয়ালিজমের পথে অগ্রসর হলো।

নাট্য প্রযোজনায় আঙ্গিকের ব্যবহারও গেল বদলে। কাপড়ের ওপর সুন্দর সুন্দর দৃশ্যপট না এঁকে, বা শতবর্ণী আলোক মালার যাদুতে সেগুলিকে চিত্ত-চমৎকারী করে তুলতে প্রয়াসী না হয়ে প্রযোজকেরা বাস্তব মানুষের বাস্তব পরিবেশটি ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন নাট্য-প্রয়োগের মাধ্যমে। কাপড়ে আঁকা জমকালো দৃশ্যপট অদৃশ্য হলো নেপথ্যের অন্ধকারে। সাহেব শিল্পী দিয়ে আঁকা দৃশ্যপট নয়, ছেঁড়া চটের পর্দা হলো অঙ্গের ভূষণ ; টেবিল-চেয়ারের কাজ করল কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্স ; সুসজ্জিত উদ্যান বাটিকার জায়গায় সাধারণ আশমানি রঙের পর্দা এসে জুড়ে বসল।

নবান্ন নাটকের প্রযোজনার সময় নট-নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছেঁড়া চট ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছিলেন। জীয়নকন্যার নাট্যকার পরিচালক বিজন ভট্টাচার্য চটে রঙকরা পোষাকই পরিয়েছিলেন শিল্পীদের। অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটা কালো পর্দা ঝুলিয়ে, কোন রকম দৃশ্যপটের ব্যবহার না করেও অভিনীত হয়েছে অনেক নাটক।

একথা অবশ্য খুবই সত্য যে, নবনাট্যের প্রাথমিক কালে, প্রযোজক গোষ্ঠী চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন ; নাট্য-প্রযোজনার উপযুক্ত সাজ সরঞ্জামের যথেষ্ট অভাব ছিল তখন। তবু নাট্য-প্রযোজনায় চটের অথবা নীলপর্দার ব্যবহার কেবলমাত্র যে, দারিদ্র্যের জন্যই সম্ভব হয়েছিল একথা ভাবা ভুল হবে। এর পেছনে ছিল একটা আদর্শ-গত বিশ্বাস। দারিদ্র্য যদি ফুটেই ওঠে তবে সে দারিদ্র্য দেশের তাবৎ জনসাধারণের। কতিপয় অনুগৃহীত ব্যক্তি বা পৃষ্ঠপোষক বৃন্দের নয়। নবনাট্যের উদ্দেশ্য ছিল নাট্য প্রযোজনাকে তাবৎ জনসাধারণের হৃদয়-সংবেদ্য করে তোলা এবং সেই জন্য নাটক, দর্শক এবং প্রকৃতিকে তাঁরা যখন যেভাবে পেরেছেন, সমসূত্রে বিধৃত করার চেষ্টা করেছেন।

এবার আমরা আধুনিক কালের কয়েকটি নাট্য-প্রযোজনার কথা উল্লেখ করবো। প্রথমে বিজন ভট্টাচার্যের কথাই ধরা যাক। বিজন ভট্টাচার্য রচিত

ও পরিচালিত গোত্রান্তর নাটকটির কথা অনেকেই জানেন। এই নাটকটির কাহিনী-অংশ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু একজন মধ্যবিত্ত স্কুল মাষ্টারের ব্যথা করুণ জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু কলোনীতে, তার পর শহরে ভাইয়ের ভাড়া-করা বাড়ীতে এবং সেখান থেকেও উৎখাত হয়ে ছিন্নমূল এই পরিবারটি অবশেষে এক শ্রামক বস্তীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ছাত্র পড়ান ছেড়ে রুজী-রোজগারের জন্য মাষ্টারকে পথে পথে পুতুল ফিরি করে বেড়াতে হয়েছে। কাবুলীর কাছে দেনা করে অপমানিত হতে হয়েছে। বড়লোকের নিষ্কর্মা ছেলের কামবাসনার আহুতি হতে হয়েছে মাষ্টারের মেয়ের। প্রতি পদে পদে জীবনের এই ব্যর্থতা কিন্তু হরেন মাষ্টারকে বিপর্যস্ত করে দেয়নি। নতুন সমাজের নতুন মানুষকে শিক্ষা দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ করার আদর্শ ধ্রুবতারার মত উজ্জল থেকেছে তাঁর চোখে। আর সেই আদর্শের প্রেরণাতেই সে বস্তীর ছেলেদের নিয়ে স্কুল করেছে, শিখিয়েছে —গ' তে গান্ধীরাজা।

কিন্তু এ কাহিনীতেই আধুনিক কালের নাটক শেষ হতে পারেনি। গোত্রান্তরের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আর এক নিদরুণ সত্য, তাহলো মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়। একমাত্র সংস্কার ছাড়া, জীবন-সংগ্রামের আর কোন ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে উঠছে না মধ্যবিত্ত মানুষ। তাই জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক সে ধীরে ধীরে নিজেদের মিশিয়ে দিচ্ছে খেটে-খাওয়া মানুষের সঙ্গে। রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক সমস্যার চাপে পড়ে তার গোত্রান্তর সুরু হয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত হরেন মাষ্টারের মেয়ে গৌরী তাই হৃদয় দান করল শ্রমিক ছেলে কানাইকে। আর একথা জানার পর বলিষ্ঠ চিত্তে হরেন মাষ্টার মিলিয়ে দিলেন তাদের দুজনকে। মধ্যবিত্ত জীবনের ট্রাজিডীর এই ইশারার মধ্যদিয়েই গোত্রান্তরের সমাপ্তি।

এই নাটকটি প্রযোজনা কালে এক অদ্ভুত আঙ্গিকের ব্যবহার করতেন বিজনবাবু। মঞ্চে বস্তীর সেট যখন সাজান হতো তখন প্রয়োজনীয় ডাইমেনসন ব্যবহার না করে, খোলার চালাগুলোকে পুতুলের ঘরের মত করা হতো, হঠাৎ দেখলে যেন বস্তী নয়, বস্তীর মিনিয়েচার বলে ভ্রম হয় দর্শকের।

অভিনেতারা এই ঘরগুলোতে স্বাভাবিক ভাবে ঢুকতে পারতেন না, অনেক কষ্টে মাথা নিচু করে এগুলোর মধ্যে প্রবেশ করতে হতো। যাঁরা রিয়ালিজমের পক্ষপাতী, তাঁরা বলবেন বস্তীর সেটটা ঠিক বস্তীর মত হয়নি, খেলাঘরের মত হয়েছে। Impressionistদেরও এই সেট ভালো লাগবার কথা নয়। কেননা সেখানে বস্তীর impression-এর চেয়ে একটা real বস্তীর আকার আনবার চেষ্টাই সমধিক লক্ষিত। কেন এমন হলো? প্রযোজক কি পয়সার অভাবে আসল বস্তী না করতে পেরে খেলাঘর করলেন, নাকি, আসল বস্তী তিনি দেখেন নি বলে অমন real এবং unreal-এর জগাখিচুড়ী পাকিয়ে ফেললেন? আমাদের মনে হয় এসব সন্দেহ অমূলক। প্যালেস আর ম্যানসনের যুগেও যখন বেশীর ভাগ মানুষকে জন্তুর মত বস্তীর অন্ধকূপে জীবন কাটাতে হয়, তখন সেই জীবনের জান্তব রূপটাই প্রকাশিত করতে চেয়েছিলেন প্রযোজক। আসল বস্তীর মত তার প্রবেশ ও নির্গমনের দরজাগুলি একটু বড় করে, কি বস্তীর চালগুলোকে একটু উঁচু করে সেই জান্তব জীবনে কোন মহত্ত্ব আরোপের চেষ্টা করা হয়নি। বরং সেগুলোকে ছোটকরে জন্তুর বাস করার গর্তের মতই করা হয়েছিল। জীবনের এই অপমান তাই মূর্ত হয়েছিল এই ছোট ছোট অন্ধকূপ-গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে। দৃশ্যকে কেবল মাত্র বাস্তব করাই, বাস্তবধর্মী প্রযোজকের কাজ নয়, নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাকে যুক্ত করে, নাটকের বর্ণনীয় বিষয়ের অনেকখানি তার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই হলো নবনাট্য-ধারার এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই ধরণের আর একটি প্রযোজনার কথা মনে পড়ছে। বহুদিন আগে Railway Institute-এ "নীলদর্পণ" নাটকের প্রযোজনায় বিজনবাবু মঞ্চের পেছনদিকের পর্দা খুলে দিয়ে Background-এর সত্যিকারের বাড়ী, রাস্তা রেলওয়ে ইয়ার্ড, ইত্যাদিকে মঞ্চের দৃশ্যের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। নায়িকা শোভা সেন বহুদূরের সেই রাস্তা দিয়ে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মঞ্চে প্রবেশ করতেন। তার ফলে যে effect সৃষ্টি হতো দর্শকের মনে, তা মঞ্চে আবদ্ধ দৃশ্যের দ্বারা কখনই সম্ভব হতো না। দৃশ্যবস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী

তাকে ব্যাপক করে দিয়ে দর্শককে সেই দৃশ্যের অঙ্গীভূত করে নেওয়ার এ হলো এক বিশিষ্ট রীতি।

মতভেদ হয়ত আছে। আর তা আছে বলেই বর্ণনীয় বিষয়ের প্রকাশ-মাধ্যম নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত হয়েছে। রোমান্টিসিজম্ ছেড়ে রিয়ালিজম্, রিয়ালিজম্ ছেড়ে ইমপ্রেসনিজম্ ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থার আবিষ্কার ও পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চলেছে আজকের নাট্য প্রযোজনায়।

প্রযোজক হিসেবে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর বিভিন্ন নাটকে এই রিয়ালিজমের সঙ্গে ইম্প্রেসনিজমের মিলন ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। মরাচাঁদ নাটকে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী চাষী পবনের বাস্তুভিটা একটা কঞ্চির ফ্রেমের ওপর সবুজ কাগজ দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। কুঁড়ে ঘরের কোন ডাইমেনসন ছিল না। কদম্ব বৃক্ষ তৈরী করা হয়েছিল কাগজের পাতা কেটে। পরে অবশ্য New Empire-এ প্রযোজনার সময় দৃশ্যসজ্জার এই প্রতীকধর্মীত্ব বাদ দেওয়া হয়।

রিয়ালিজম এবং ইম্প্রেসনিজমের সবচেয়ে ভালো মিলন দেখা গিয়েছিল বিজনবাবুর 'ছায়াপথ' নাটকে। এই নাটকের প্রারম্ভে জীবনের কম্বু-রেখায়িত গতিপথের প্রতীক হিসেবে এক চক্রাকারে বিঘূর্ণীত ছায়ামানুষের মিছিল দেখান হতো। আবার তার পরই রাস্তার ফুটপাথে পার্কের গায়ে পরিদৃশ্যমান হতো ভিখারিদের থাকবার ঘরের realistic সেট। মাঝখানে চাষীর মৃতুর সঙ্গে সঙ্গে কাকতাড়ুয়ার চীৎকার এবং শেষ দৃশ্যে আবার চাষী বৌয়ের ছেলে মরে যাবার পর যখন সে প্রায় উন্মাদ হয়ে চলমান মিছিলের সঙ্গে যোগ দিত তখন তার লাঞ্ছিত মাতৃত্ব যেন আপনা থেকেই গৌরব মণ্ডিত হয়ে এক অপূর্ব-শ্রী ধারণ করতো। আর সেই গৌরবোজ্জ্বল মাতৃত্বকে সুপরিস্ফুট করার জন্য বিজনবাবু এক অদ্ভুত আঙ্গিকের ব্যবহার করতেন। উন্মাদিনী চাষী বৌয়ের চলার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট কালো কাপড়ের ফালি আঁচলের মত লম্বা হয়ে পড়ে যেত মঞ্চে, তার শেষ দুটি কোণ তারই মৃত ছেলে গোপাল দুহাতে তুলে নিয়ে (ঠিক যেমন রাণী চলবার সময় তাঁর attendantরা তাঁর আঁচলের train দুহাতে তুলে নিয়ে যায়) মায়ের পেছন পেছন ছায়ার মত অনুসরণ করতো। অদূরে দেখা যেত চক্রাকারে বিঘূর্ণীত জীবনের ছায়াপথ।

বলাবাহুল্য এগুলো পরীক্ষাই। এর দ্বারা জীবনের ভাষা প্রকাশের যে কোন নির্দিষ্ট নিরীখ পাওয়া গিয়েছে তা নয়। কিন্তু শিল্প মানেই তো তাই। ভাব প্রকাশের নিরীখ অনুসন্ধানের পথেই তার চমৎকারিত্ব। সুনির্দিষ্ট কোন নিরীখের আবিষ্কার তো কোন দিনই তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

শম্ভু মিত্র আধুনিক নাট্যকলার আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী। জবানবন্দী, নবান্নর কাল থেকেই সক্রিয় ভাবে তিনি যে নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাই নয়, এঁরাই এদেশে নাট্যধারার ক্ষেত্রে অতি-আধুনিক পর্বের সৃষ্টি করেছেন। সকলেই জানেন 'নবান্ন' নাটকে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যুক্তভাবে পরিচালক হিসেবে ইনিও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরবর্তী কালে যখন ইণ্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেল, তখন বিজনবাবুর মত ইনিও সেই সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, স্বাধীন ভাবে নিজস্ব নাট্য সংস্থা 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠা করলেন। আধুনিক নাট্য-প্রযোজনার ইতিহাসে এই 'বহুরূপীর' অবদান অনস্বীকার্য।

প্রযোজক হিসেবে শ্রীমিত্র নির্বিচারে বিদেশী অনুকরণের ঘোর বিরোধী। কিছুদিন আগে থিয়েটার সেণ্টারে অনামিকা আয়োজিত নাট্য-সম্পর্কিত বক্তৃতামালার উপসংহারে আজকের প্রযোজকদের 'ইতিকর্তব্য' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি প্রযোজকদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবার কথাটা বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন।

তাঁর কথা হলো বিলিতী রঙ্, বিলিতী সঙ্গীত, বিলিতী অভিনয়রীতি, আলোক-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, আজকের যুগে নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রগতির প্রতীক বলে গণ্য হলেও তার নির্বিচার অনুকরণ, হনুকরণেরই নামান্তর। তাতে করে নাট্যকলার মাধ্যমে ভারতীয় আত্মার বৈশিষ্ট্যটি তো ফুটবেই না, উল্টে যেটা দাঁড়াবে, সেটাও হবে ন দেবায় ন ধর্মায়, একটা ত্রিশঙ্কু জাতের শিল্প। কিন্তু তাই বলে যা কিছু বিলিতী অর্থাৎ স্বদেশী নয়, শ্রীমিত্র তারই নির্বিচার বর্জনের পক্ষপাতী এমন কথা ভাবাটাও অন্যায় হবে। তাঁর কথা হলো ;

"...গোঁড়ামী করবো না। পৃথিবীর জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে যেখানে যা কিছু প্রয়োজনীয় পাবো শিশিক্ষু ছাত্রের মত তা আহরণ

করবো, কিন্তু পিতৃদত্ত পরিচয়টা না ভুলে। আমার মেরুদণ্ডে, আমার ধমনীতে যে পরিচয় বর্তমান, সেটাই আমার ভিত্তি।"

শ্রীশম্ভু মিত্রের প্রত্যেকটি প্রযোজনায় ভারতীয় আত্মার রূপটি তাই পরিস্ফুট দেখতে পাই, গোঁড়ামী বশতঃ নাট্য-প্রয়োগের আঙ্গিকে বিদেশীয়তা তিনি বর্জন করেন নি, অথবা অবিমিশ্র ভারতীয় বলে 'যাত্রা'কে অগ্রাধিকার দেন নি। প্রযোজনার ক্ষেত্রে শ্রীমিত্রের কথা হলো স্বল্প কিন্তু গভীর রেখায়, জীবনের ধারণাটি ফুটিয়ে দিতে হবে, আর এই পরিস্ফুটনই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রযোজকের 'ইতিকর্তব্যে'র আলোচনায় যা বলেছেন, তা আমরা পুনরায় স্মরণ করতে পারি। কী পথে ভারতীয় নাট্যাভিনয়ের রূপটি খুঁজে পাওয়া যাবে, এই প্রশ্নের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন,

> "...জীবনের ওপরের স্তরের তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি উত্তরণ ক'রে আমরা যেন চলিষ্ণু বর্তমানের রূপটি প্রকাশ করতে পারি। খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে, স্বল্প কিন্তু গভীর রেখায়।"

নাট্য-প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয় তথা প্রাচ্যশিল্পের এই মূল তত্ত্বটিকে শ্রীমিত্র সদাসর্বদাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

এইবারে আমরা বহুরূপী কর্তৃক কয়েকটি নাট্য প্রযোজনার আলোচনার চেষ্টা করবো। আমরা আগেই বলেছি যে অর্থাভাব বাঙলার অপেশাদার নাট্য-আন্দোলনকে বার বার সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাই বলে সৎনাট্য প্রচেষ্টাকে সে কখনই অবদমিত করতে পারেনি। নাট্য-প্রযোজনার প্রথমদিকে অন্যান্য অনেক সংস্থার মতই 'বহুরূপী'কেও আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে চলতে হলেও সেই অনটনের পরিপ্রেক্ষিতে সুকৌশল প্রয়োগ-মাধ্যমের পথটিও আবিষ্কার করে নিতে তার দেরী হয়নি।

ধরা যাক 'পথিক' এবং 'উলুখাগড়া' প্রযোজনার কথা। দুটো নাটকের ঘটনা-সংস্থান একটি স্থানেই সীমাবদ্ধ, সুতরাং দৃশ্যপট পরিবর্তনের ঝামেলা নেই। আর সুষ্ঠু দৃশ্যপট অঙ্কনের তখন সামর্থ্যও ছিলো না। তাই প্রযোজক অবান্তর দৃশ্যপটের আকর্ষণ থেকে দর্শক মনকে টেনে এনে অভিনয়ের ক্ষেত্রে

সীমাবদ্ধ করার জন্য দৃশ্যপটের পরিবর্তে Stage requisite অর্থাৎ টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি আসবাবপত্রের আমদানী করলেন বেশী। 'পথিক' নাটকে মঞ্চের তিনদিক মুড়ে দেওয়া হয়েছিল চটের পর্দায়। আর সেগুলোকেই কেটে কেটে জানালা-দরজা ইত্যাদি বানান হয়েছিলো। উলুখাগড়া নাটকে দরজা-জানালাগুলোকেই প্রয়োজন অনুসারে মঞ্চে খাড়া করে দিয়েছিলেন প্রযোজক। কোন দেওয়ালের বালাই ছিল না। অভিনেতারা যদিও দেওয়ালের অস্তিত্বের কথা স্মরণ রেখে, সেই কাটা দরজা-জানালার মধ্য দিয়েই যাতায়াত করেছিলেন, তবু ফাঁকা দেওয়ালের অবাস্তবতা দর্শক মনকে বাধা দেয়নি। দরজা-জানালার গভীর রেখায়, দেওয়ালের তুচ্ছতা ভরাট হয়ে গিয়েছিল। দর্শকের কল্পনার দুর্বারতাই দেওয়াল দেখে নিতে পেরেছিল দরজা-জানালার পাশে। তাই দুটো কাটা দরজা আর জানালার সঙ্গে ঘরের কল্পনা মিশিয়ে একটা সার্বিক ঘরের ছবিই প্রতীয়মান হয়েছিল উলুখাগড়ার মঞ্চ-পরিকল্পনায়। খুঁটিনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবহার নয়, কয়েকটি রেখায় সমস্ত ভাবটি ফুটিয়ে খুঁটিনাটি সম্পর্কে দর্শককে ওয়াকিবহাল করে তোলাই প্রতিভাধর প্রযোজকের কাজ। পথিক অথবা উলুখাগড়া নাটকে সেই দুরূহ কর্তব্য যথারীতি পালনে নাট্য-প্রযোজক শ্রীশম্ভু মিত্র সক্ষম হয়েছিলেন।

বহুরূপীর আধুনিক প্রযোজনায় প্রাথমিক কালের আর্থিক অনটন না থাকায় চটের পর্দার impression অবশ্য থাকেনা, কিন্তু ছিমছাম দৃশ্যপটের মাধ্যমে নাটকের মূল ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার রীতিটিকে তাঁরা আজও পরিত্যাগ করেন নি। বরং এটাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। সহজ কথা, সহজ করে বলা যে সহজ নয়, কথার ব্যাপারী যাঁরা তাঁদের এটা বেশ ভালো করেই জানা আছে, সুতরাং ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। আমাদের কথা হলো নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে বহুরূপী সংস্থা এই সহজ কথা সহজ করে বলার পদ্ধতিটি সুষ্ঠুভাবেই আয়ত্ত করেছেন। তাঁদের ইদানীংকালের রক্তকরবী, পুতুলখেলা, বিসর্জন ইত্যাদি নাটকের প্রয়োগ-কলা-নৈপুণ্যের মাধ্যমে এই কথাটাই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'রক্তকরবী' নাটকে রাজার ঘরের জালঢাকা দেওয়ালের ডানদিকে,

কতকগুলি কাঠের বিভিন্ন স্তরের তক্তা সাজিয়ে একটি উঁচু রাস্তার প্রতীক ব্যবহার করা হয়। অভিনেতারা এই রাস্তার কোণ থেকেই আসেন এবং অভিনয় করেন। দৃশ্যসজ্জায় এই যে বিভিন্ন স্তরের অন্বয়, এটা রক্তকরবী নাটকের মূল ছন্দটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এখানে যে রাজার ঘর, ফাগুলালের দাওয়া ইত্যাদি পৃথক করা যেত না তা নয়, কিন্তু তাতে বিলেতীয়ানাই প্রকাশ পেতো আর কিছু নয়। রক্তকরবীর দৃশ্য সংখ্যা একটি। রাজার বাড়ীর সামনেই তার সব ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর মধ্যে বস্তীর দাওয়া, অধ্যাপকের ঘর ইত্যাদি ব্যবহার করার অবকাশ আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি। করেন নি কেননা তিনি সমগ্র বিষয়-বস্তুতে একটা সঠিক চেতনার আরোপ করতে চেয়েছিলেন, রক্তকরবীতে তাঁর বক্তব্য কোন বিশেষ শ্রেণীর বা সমাজের মানুষকে কেন্দ্র করে নয়, তাবৎ শোষক ও শোষিত সমাজের সঠিক রূপটিই তার মধ্যে প্রতিফলিত। তাই দৃশ্যপটের টুকরো টুকরো ব্যবহার এই ছন্দসৌষম্যটিকে ভেঙ্গে দিতে পারে ভেবেই তা সচেতন ভাবে ব্যবহার করা হয়নি। বহুরূপীও নাটকটি প্রযোজনার সময় তা করে নি। এই প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র বলেছেন।

> "অবশ্য এমন ভাবে দৃশ্য সাজান যেত যাতে রাজার দরজা, ফাগুলালের বস্তীর দাওয়া, সর্দার ও চিকিৎসকের মন্ত্রণাকক্ষ, বিশু ও নন্দিনীর কথোপকথনের জন্য নিরালা কোণ, সমস্তই টুকরো টুকরো করে একই মঞ্চের উপর একসঙ্গে দাঁড় করান থাকতো। কিন্তু সেটা বিলেতিয়ানা হতো, তাতে সমগ্র দৃশ্যের ছন্দের বদলে বৈষম্যটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখান হতো। তাই বহুরূপী সে কাজ করেনি, কারণ রবীন্দ্রনাথ একটা সমগ্র সমাজের চেহারা দিতে চেয়েছেন, এবং হাজার ঝগড়া বিবাদ সত্ত্বেও সমস্তটা মিলে কিন্তু একটাই সমাজ।"

শম্ভু মিত্রের পর আধুনিক কালের আর একজন প্রতিভাধর প্রযোজকের কথা উল্লেখ করতেই হয় তিনি হলেন উৎপল দত্ত। নবনাট্য সংস্থার পক্ষ থেকে প্রথম পেশাদার রঙ্গমঞ্চ অধিকার করে, নবনাট্যের আদর্শানুযায়ী নাট্য

প্রযোজনায় পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাবার গৌরবের অধিকারী হলেন উৎপল বাবু। তাঁর সর্বাধুনিক নাটক "তিতাস একটি নদীর নাম"-এর মঞ্চ পরিকল্পনা অতি আধুনিক নাট্যপর্বের প্রয়োগ-কলার ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাট্য-প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজকের যে কটি বিষয় সম্পর্কে সর্বপ্রথম অবহিত হওয়া দরকার, তা হলো এই যে, নাট্যবস্তুর mood যেন মঞ্চস্থাপত্যের বাড়াবাড়িতে ক্ষুণ্ণ না হয়, নাটকের গতি বার বার কেটে গিয়ে যেন ছন্দপতন না ঘটায় এবং দর্শক কেবলমাত্র দ্রষ্টা না হয়ে, দ্রষ্টব্য বিষয়ের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ স্থাপন করতে পারে। তিতাস নাটকের প্রযোজনায় এই কয়টি বিষয়ের পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সমগ্র নাটকটি দুর্বার গতিতে অভিনীত হয়। আর এই দুর্বারতা রক্ষার জন্য প্রযোজক অভিনয় ক্ষেত্রকে কেবলমাত্র মঞ্চের মধ্যেই সীমিত রাখেন নি, তাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে। হাউসের মাঝখানে একটা কাঠের পাটাতন বসিয়ে তাকেই গ্রামের পথ বলে মেনে নিয়ে দর্শকদের মধ্য দিয়ে নট-নটীরা যাতায়াত করেন। ব্যাকগ্রাউণ্ডে কোন দৃশ্যপট থাকে না, তার পরিবর্তে মিনার্ভার ভারী পর্দাই ঝুলতে থাকে এবং প্রয়োজন বোধে অভিনেতারা সেই পর্দা ঠেলেও যাতায়াত করে থাকেন। পথের impression কিন্তু দর্শকের কল্পনাকে ক্ষুণ্ণ করেনা কোথাও, বরং তাকে আরও অগ্রসর করে। উৎপলবাবু কর্তৃক অভিনয় আঙ্গিকের এই ব্যবহার, আর একবার প্রমাণ করলো যে, নাট্যাভিনয়ে মঞ্চসজ্জার চমৎকারীত্ব বা আলোক-সম্পাতের ইন্দ্রজালই বড় কথা নয়, রসবোদ্ধা সামাজিকের রসচর্ব্বনা তাঁদের মানস কল্পনার দ্বারাই সার্থক হতে পারে।

অবশ্য impression ছাড়াও realism-এর ছোঁয়াও তিতাসে আছে। বাইরের পথ হিসেবে যেমন আছে কাঠের পাটাতন, তেমনি মঞ্চের অভ্যন্তর দৃশ্যে আছে তিতাস নদীর রূপ, নৌকা, রামধনু, ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেগুলো নাটকের mood সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে বলেই realism এবং impressionism-এর এই সহ-অবস্থান চক্ষুপীড়াদায়ক হয়ে ওঠেনি।

অভিনেতাদের প্রেক্ষাগৃহে চালান করে, অভিনয় ক্ষেত্রকে সমবেত দর্শক সাধারণের চতুর্দিকে সম্প্রসারিত করে মঞ্চ ও দর্শকের বিভেদক সেতুটিকে বিলোপ

করে দেওয়ার চেষ্টা অবশ্য এই প্রথম নয়। আমাদের রঙ্গমঞ্চে বোধহয় এই ধরনের চেষ্টা করেছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী রীতিমত নাটক এবং শেষরক্ষা প্রযোজনার সময়। তারপর বিজন ভট্টাচার্য Railway Institute-এ নীলদর্পণ নাটকের প্রযোজনার সময় এই রীতির ব্যবহার করেছিলেন। শোভা সেন তখন ছিলেন নায়িকা। তিনি মঞ্চের পিছনের খোলা পথ ধরে কোন এক বিশেষ দৃশ্যে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে মঞ্চে প্রবেশ করতেন। তবে একথা অবশ্যই সত্য যে, মঞ্চ ও দর্শকের বিভেদক সেতুটি ভেঙে তাদের একাত্ম করে নেবার এই রীতি আমাদের রঙ্গমঞ্চে উৎপলবাবুই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করলেন।

পাশ্চাত্য দেশে এই ধরনের রীতি-নীতির পরীক্ষা বহুদিন ধরেই চলছে। মায়ারহোল্ড থিয়েটার, তারপর বিশেষ করে ব্রেখ্‌ট-এর থিয়েটারের অভিনয় রীতির মূল কথাই হলো মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের illusion ভেঙে দিয়ে দর্শক মণ্ডলীকে এক করে নাও মঞ্চের সঙ্গে।

নাটকের প্রয়োগ-কলার আঙ্গিকের পরীক্ষা নিরীক্ষা ওদেশের মত আমাদের দেশেও সুরু হয়েছে। আজ আমাদের দেশের অনেক নাট্য-সংস্থাই মঞ্চ আঙ্গিকে realism, impressionism ইত্যাদির পরীক্ষায় ব্যস্ত। নিতান্ত তরুণ বয়সের সংস্থাগুলিরও এ বিষয়ে উদ্যম অসাধারণ। এঁদের মধ্যে পরেশ ধর প্রযোজিত ও দশরূপক নাট্য-সংস্থা কর্তৃক অভিনীত কয়েকটি নাটকের মধ্যে কালপুরী ও মন্মথ রায় বিরচিত উর্বশী নিরুদ্দেশ নাটকের প্রতীক ধর্মী মঞ্চ সজ্জার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালপুরী নাটকের মঞ্চটি সম্পূর্ণ impressionistic বা আভাসবাদী। "ডানাভাঙা পাখীর" মঞ্চসজ্জা ছিল ত্রিস্তরে বিশ্লিষ্ট।

রূপান্তরী প্রযোজিত জোছন দস্তিদারের 'স্বর্ণগ্রন্থী' নাটকের মঞ্চস্থাপত্যও সুন্দর। প্রযোজক হিসেবে জোছন দস্তিদার Realism-এরই পক্ষপাতী, তাই তাঁর দৃশ্য পরিকল্পনায় প্রতীকের চেয়ে বাস্তবতার ব্যবহারই বেশী। স্বর্ণগ্রন্থী নাটকের দর্জীর কারখানার দৃশ্যটি সেই Realistic দৃশ্য নির্মাণের একটি সুন্দর উদাহরণ।

গন্ধর্ব নামে আর একটি নাট্যগোষ্ঠীও নাট্য-প্রযোজনায় কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষায় উদ্যোগী হয়েছেন। অজিত গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত 'সূর্যের মত সমুদ্র' নাটকে নাট্যবস্তুর mood বা ভাব পরিস্ফুটনের প্রয়োজনে দৃশ্য-সজ্জা ও আলোক-প্রক্ষেপণ রীতির অভিনব ব্যবহার সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য।

স্বনামখ্যাত 'শৌভনিক' নাট্যগোষ্ঠীও তাঁদের ম্যাক্সিম গোর্কী রচিত 'মাদার' নাটকের পরিমণ্ডলটিকে একটি দৃশ্যপটের মাধ্যমে সুন্দর করে পরিস্ফুটিত করেছিলেন।

সাম্প্রতিক কালে নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে নাট্যকার কিরণ মৈত্রের অভ্যুদয় নাট্যসংস্থাটিও বিশেষত্ব অর্জন করেছে। এঁদের অনেকানেক সার্থক নাট্যপ্রযোজনার মধ্যে "বারো ঘণ্টা" নাটকটির প্রযোজনার উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি সেটে, ছিমছাম পরিবেশ রচনার মধ্যে এঁরা মধ্যবিত্ত পরিবারের রিক্ততার রূপটি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

নাট্যকার রমেন লাহিড়ীর বিদ্যাসাগর নাট্যগোষ্ঠির কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। সম্প্রতি বিশ্বরূপা মঞ্চে এঁরা রমেন লাহিড়ী রচিত "তমসার তীরে" রূপক নাটকটির প্রযোজনায় যে প্রয়োগ-কৌশল দেখিয়েছেন নানা দিক দিয়ে তা নতুনত্বের দাবী রাখে। মঞ্চ-সজ্জায় নাটকের আবহাওয়া সুষ্ঠু ভাবে বজায় রাখার জন্য এঁরা কোন জমকাল দৃশ্য-পট ব্যবহার করেন নি। একটি শাদা পর্দা, আর একটি কাঠের প্লাটফর্ম সাজিয়ে সমগ্র পরিবেশটি ফুটিয়ে তুলেছেন। রূপসজ্জায় মুখোশ-নৃত্যের ধারাটিকেই অনুসরণ করা হয়েছিল। সাজ-পোষাকে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশের অনুসরণ লক্ষ্য করা গেছে।

নবান্ন কালের সুবিখ্যাত অভিনেতা চারুপ্রকাশ ঘোষ এবং মমতাজ আহমদের পরিচালনায় অনুশীলন নাট্য-গোষ্ঠী শহরের শ্রেষ্ঠ অপেশাদার গোষ্ঠীর অন্যতম। উমানাথ ভট্টাচার্য অনূদিত শেষ-সংবাদ নাটকের অভিনয় এবং প্রযোজনায় এই গোষ্ঠী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

এই প্রসঙ্গে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এবং নাট্যকার বীরু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রান্তিক নাট্য-সংস্থা, সবিতাব্রত দত্ত'র পরিচালনায় রূপকার নাট্য-গোষ্ঠী, বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আধুনিক-কালে নাটক প্রযোজনা,

পরিচালনা এবং অভিনয়ে এঁরা যে স্থনাম অর্জন করেছেন, তা সর্বজনস্বীকৃত। প্রান্তিক সংস্থার 'বিশে জুন' এবং রূপকার নাট্যগোষ্ঠীর 'কালের যাত্রা', 'চলচিত্ত চঞ্চরী' নাট্যপ্রযোজনা হিসেবে স্থনাম অর্জন করেছে। গিরিশঙ্কর-এর লোকমঞ্চের কথাও উল্লেখ্য। বিশেষ করে একাঙ্ক নাট্যাঅনুশীলনই এঁদের আদর্শ। কাব্যনাট্য হিসেবে, সাইরেন নাটকের অভিনয় জমেছিল খুব ভালো। জীবনের আন্তর বৃত্তিগুলির মধ্যে অবগাহন এঁদের আদর্শ।

এগুলি ছাড়াও পিন্টু নিয়োগীর ক্যালকাটা মেরীমেকার্স ক্লাবের, পাহাড়ী ফুল, প্রেমাংশু মুখোপাধ্যায়ের শ্রীমঞ্চ সংস্থার য্যায়সা কা ত্যায়সা, স্থনীত মুখোপাধ্যায়ের লোকতীর্থ-নাট্যসংস্থার আবিষ্কার, নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অপেশাদার নাট্যসংস্থার ধারাবাহিক বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধের প্রসঙ্গে অবান্তর বলে আমরা এ বিষয়ে নিরস্ত হলাম।

ছয়

আঙ্গিক নির্ণয় ও জাতীয় ঐতিহ্য

সব শেষে আর একটি কথা বলে আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহারে আসতে চাই তাহলো নাট্য-প্রযোজনা রীতির আঙ্গিক নির্ণয়ে দেশীয় ঐতিহ্যের স্থান। অভিনয়, দৃশ্য-সজ্জা, আলোক-নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি নাট্য-প্রযোজনার বিভিন্ন শাখায় আজ বিভিন্ন ধারায় পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। পাশ্চাত্ত্য দেশেও Peoples theatre-এর জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের নানা রীতি নীতির আবিষ্কার হয়েছে, এবং সেগুলোকে উপলক্ষ্য করে নানা মতবাদেরও জন্ম হয়েছে দেখতে পাই।

নাট্যবস্তুর ভাব প্রকাশে সেখানকার প্রযোজকরা প্রয়োগ-রীতির বিভিন্ন ধারায় ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার প্রতি আস্থাশীল। একটি দৃশ্যকে যথাযথ করার জন্য তাঁরা যেমন Realism-এর চূড়ান্ত ব্যবহার করে থাকেন তেমনি আবার প্রতীকের ব্যবহারও দেখা যায়। শুনেছি মস্কো আর্ট থিয়েটারে কোন একটি

নাটকে সমুদ্রের দৃশ্য এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল যে বাস্তব সমুদ্র থেকে তার প্রভেদ সহজে বোঝা সম্ভব হতো না। আবার মায়ারহোল্ড প্রমুখ প্রযোজকেরা আর্টের ক্ষেত্রে প্রতীক ব্যবহারের চূড়ান্ত গবেষণাও করেছেন। যেমন ধরা যাক কোন কারণে একটি লোকের অত্যন্ত আনন্দ হয়েছে, অভিনয়ে সেই আনন্দের প্রকাশ করার জন্য প্রযোজক ল্যাডার অর্থাৎ মইয়ের ব্যবহার করলেন। আনন্দের মূহূর্তে লোকটি হঠাৎ একবার মই বেয়ে খানিকটা উঠে আবার নেমে পড়ল। অথবা প্রণয় ব্যাপারের আবেগময় রসোচ্ছলতা প্রকাশের ক্ষেত্রে দেখা গেলো অভিনেতা, অভিনেত্রী দুজনে ট্রপিজে উঠে দোল খেতে খেতে কথা কইছে, হাসছে ইত্যাদি। এ ছাড়াও কাগজ কেটে তাই দিয়ে পোষাক-পরিচ্ছদ, দৃশ্যপট ইত্যাদি রচনা করার ব্যাপার তো আছেই।

বিশেষ কোন ism বা মতবাদের কথা বাদ দিয়ে আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি যে, জীবনে উপলব্ধ সত্যকে মানুষ প্রতি নিয়তই নানাভাবে প্রকাশ করতে ব্যাকুল, এবং সেই ব্যাকুলতাই তাকে ভাব প্রকাশের নানা রীতি-নীতির প্রয়োগে উৎসাহী করে তুলছে। এই বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক সে নিয়ে তর্ক করতে যাওয়া বৃথা, কেননা জীবন এক অখণ্ড ধারা স্রোতের অংশীভূত হলেও, ব্যক্তি বিশেষে মানুষের বোধ ও মননের প্রকার ভেদ আছে, তাই একজনের কাছে যেটা সত্যি, অন্যজনের কাছে সেটা মিথ্যা বা অলীক বলে মনে হতে খুব বেশী সময় লাগে না। সুতরাং মঞ্চসজ্জায় realism, impressionism অথবা Sur-realism ইত্যাদির কোনটা ভাল বা মন্দ সে তর্ক আমরা করবো না, আমরা বলবো নাটকের মৌল উদ্দেশ্যকে পরিস্ফুট করে তুলতে এককভাবে অথবা বিমিশ্রভাবে যে আঙ্গিক রীতির ব্যবহার প্রযোজক উপযুক্ত বলে মনে করবেন, সেই রীতিকেই তাঁর নির্বিচারে গ্রহণ করা উচিত তাতে করে যদি সুর-রিয়ালিজম আর রিয়ালিজম্ মিলে মিশে এক হয়ে যায়, তাতেও কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। কেননা ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ism-টা বড় কথা নয়, প্রধান কথাটা হলো সাধারণ্যে সহজ বোধ্য করে নাট্য বস্তুকে উপস্থাপিত করা।

তবে একটা কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, প্রয়োগ-রীতিতে প্রযোজক যে আঙ্গিকই ব্যবহার করুন না কেন, সেটা যেন দেশীয় ঐতিহ্যবিমুখী না হয়। ভারতীয় জনসংস্কৃতির পারম্পর্য ধরে, তার আত্মার সন্ধানটি যদি নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রযোজক দিতে না পারেন, তাহলে তাঁর সমগ্র কলাকৌশলই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অনুকরণ নয় স্বীকরণই হলো মূল কথা।

কোন বিদেশী প্রযোজক প্রেমের অভিব্যক্তিতে 'ট্রপিজ' কিম্বা আনন্দের অভিব্যক্তিতে 'ল্যাডারে'র প্রতীক ব্যবহার করেছেন বলেই যে, আমাদের তাই করতে হবে, এমন ভাবনা অর্থহীন। বরং তা করতে গেলে হাস্যকর হয়ে যাবারই সম্ভাবনা ; কেননা একটা হলো জীবনবোধের কষ্টি পাথরে যাচাই করে পাওয়া সত্য, আর একটা হলো অনুকরণ।

দেশীয় ঐতিহ্য ধরে কিভাবে প্রতীক ব্যবহার করা যায়, তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হলো বিজন ভট্টাচার্যের 'ছায়াপথ' নাটকের প্রযোজনা। আমরা আগেই বলেছি সমগ্র নাটকের দৃশ্য পরিকল্পনায় realism এবং impressionism-এর সমন্বয় করা হয়েছিল। ঐ নাটকে এক উদ্বাস্তু চাষীর চরিত্র আছে। এই চাষীটি যখন শহরের ফুটপাথে মারা যায়, তখন অকস্মাৎ অন্ধকারের মধ্য থেকে একটা কাকতাড়ুয়ার ডানার ঝটপটানি ও চীৎকার শোনা যেত। হাঁড়ীর ওপর ভুসো দিয়ে আঁকা একটা কাকতাড়ুয়া অকস্মাৎ প্রাণবন্ত হয়ে চীৎকার করছে, রিয়ালিস্টদের চোখে ব্যাপারটা যারপর নাই unreal মনে হবারই কথা। কিন্তু এই প্রতীকটি ছাড়া উদ্বাস্তু চাষীর করুণ মৃত্যুটি কখনই ফোটান যেত না, তা সে চাষী যতই আবেগভরে অভিনয় করুক না কেন। আলোচ্য দৃশ্যে তাই চাষীর মৃত্যুর সময় তাকে দেখান হতো না। তার কাতর গোঙানী শুধু থেমে যেত ওই কাকতাড়ুয়ার অব্যক্ত চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে।

এখন কথা হচ্ছে যে, এই চাষীর মৃত্যুতে কাকতাড়ুয়ার প্রতীক ব্যবহার করা হলো কেন? গ্রাম জীবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন যে, কাক পক্ষীতে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে বলে, চাষীরা হাঁড়ীতে ভুসো মাখিয়ে

এক কিম্ভুতকিমাকার মুখ তৈরী করে, তারপর সেটা একটা ক্রুশের মত লাঠির ডগায় ঝুলিয়ে দেয়, আর ক্রুশের দু'ধারে, একটা ছেঁড়া সার্ট বা ওইধরণের কিছু একটা পরিয়ে দেয়। সবটা মিলে তখন দেখায় একটা ভুতুড়ে মূর্ত্তির মত। চাষীরা সেই মূর্ত্তিটি ক্ষেত্র প্রহরী হিসেবে জমির সীমায় পুঁতে রাখে। যাতে পশু পক্ষীরা সেটা দেখে ভয় পায়। এই কাকতাড়ুয়ার সঙ্গে চাষীর নাড়ীর যোগ, সুতরাং সে যখন ভূমিহীন অবস্থায় মরে, তখন তার দুঃখে কাকতাড়ুয়াই ডানা ঝাপটিয়ে ককিয়ে ওঠে। নাগরিকের অনভ্যস্ত দৃষ্টি হয়তো এই প্রতীকটি সহজে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না, কিন্তু গ্রামীন মানুষ এই কাকতাড়ুয়ার কান্নাকে ভুল বুঝবে না কখনই।

ঠিক এই রকম, প্রেমের উচ্ছলতার অথবা গভীরতার প্রকাশে কোন নতুন প্রযোজক শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রার আঙ্গিকের কথা ভাবলেও ভাবতে পারেন। কিন্তু ট্রপিজের কথা ভাবা বোধ্‌করি ঠিক হবে না।

ফলকথা প্রকাশরীতি বেরুবে চলমান জীবনছন্দের বর্ণবিচ্ছুরণের মধ্য থেকে কোন ইজমকে অনুসরণ করে নয়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ, তথা তাবৎ জীব ও উদ্ভিদ জগত নানা ভাবে নিজের আন্তর প্রবণতাগুলিকে অভিব্যক্ত করে চলেছে; বিচিত্র এই প্রকাশরীতি দ্রষ্টা শিল্পীর পক্ষেই দেখা সম্ভব। সতত সজাগ প্রহরায় এই অভিব্যক্ত রূপটিকে যে প্রযোজক দেখতে এবং ধরে রাখতে পারেন আপন শিল্প রচনার মাধ্যমে, তিনিই সার্থক। যেমনটি দেখলাম, তেমনটি অঙ্কিত করলাম এটাকে real বলে মনে করলেও শিল্পের ক্ষেত্রে সত্য নয়। সত্য হলো সেই বিশেষ বস্তু বা ঘটনা বা দৃশ্যকে একজন শিল্পী কিভাবে দেখেছেন, এবং সেই দেখাটা তাবৎ জন-সংস্কৃতির সঙ্গে জারিয়ে গিয়ে একটা মহত্তর কোন আদর্শ অথবা লক্ষ্যের সন্ধান দিচ্ছে কিনা। তা যদি না দেয়, তাহলে দৃশ্যপট অথবা রূপসজ্জা অথবা অভিনয় রীতি যতই হুবহু হোক না তার কোন মূল্যই থাকবে না। ফটো তোলা আর ছবি আঁকার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, আর্টের ক্ষেত্রে real আর realism এর পার্থক্য হলো সেটাই। নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রতিভাধর প্রযোজক যিনি, তিনি এই কথাটি স্মরণ রেখেই দৃশ্যসজ্জা বা আলোক-নিয়ন্ত্রণের রূপরীতির কথা চিন্তা করে থাকেন।

দৈনন্দিন জীবন থেকে এই আঙ্গিক গ্রহণ করে শিল্পী তাকে কেমন করে শিল্পের তূরীয় লোকে উত্তরিত করেন, সে সম্পর্কে আর একটি কাহিনীর অবতারণা করেই আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করবো। 'নবান্ন' নাটকের কথা আধুনিক কালের নট্যরসিক ব্যক্তিমাত্রই বিদিত আছেন। এই নাটকের প্রথম উন্মোচন অংশের দৃশ্যপট সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে, তার এক জায়গায় নাট্যকার লিখেছেন ;—

> ······"মঞ্চ প্রায়ান্ধকার। সুদূরের পটভূমি রক্তিম। অস্পষ্ট আলোকে কচ্ছপের পিঠের খোলার আকৃতি একটা মালভূমির ওপর ছায়া মূর্তির মত দু'চার জন লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।······"

এখানে "কচ্ছপের পিঠের খোলার আকৃতি" কথাটি লক্ষ্যণীয়। যখন কোন প্রযোজক 'নবান্ন' প্রযোজনা করবেন তখন এই বর্ণনাটির মত করে একটা গোলাকৃতি ভূমি রচনা করেই কি তিনি ক্ষান্ত হবেন? নাট্যকারের উদ্দেশ্য নিশ্চই এটা নয়। তা থাকলে তিনি ডিম্বাকৃতি বা ঐ ধরণের যাহোক একটা কিছু কথা ব্যবহার করতে পারতেন। কৌতুহলী হয়ে আমি নাট্যকারকে উক্ত শব্দটি ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তরে তিনি বলেন যে, সর্বংসহা ধরিত্রীকে তিনি কূর্ম অবতারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিশেষ করে কূর্ম অবতার কেন, এই প্রশ্নের ব্যাখ্যায় তিনি জানান যে, প্রত্যেকদিনই মাছের বাজারে গিয়ে দেখতাম বড় বড় কচ্ছপ সব কাটা হচ্ছে, কিন্তু কচ্ছপের এমনই স্বভাব যে হাজার কষ্ট হলেও সে কোন আর্তনাদ করে না, প্রতিবাদও জানায় না। শাণিত ছুরির আঘাতে সে খালি নিজের খোলসের মধ্যে গুটিয়ে যেতে চায়। কচ্ছপের এই স্বভাব দেখতে দেখতে মনে হতো, যে বিয়াল্লিশের পটভূমিতে আমাদের পৃথিবীরও যেন এই স্বভাবটাই প্রকটিত হয়ে উঠেছে। অত্যাচারের নিদারুণ বহ্নিস্রোতে যখন সারা সমাজ জীবন বিপর্যস্ত তখন সে যেন ঐ কচ্ছপের মত আগুনের তাপ থেকে নিজেকে বাঁচানর জন্য খোলার মধ্যে নিজেকে সংকুচিত করতে চাইছে, প্রতিবাদ নেই, আছে শুধু মূক মৌন আর্তনাদ। এই বোধ থেকেই 'নবান্নের'

ধরিত্রীর পটভূমি কচ্ছপের খোলার মত বলে কল্পনা করা হয়েছে। কূর্মাবতারের কথা সকলেই জানেন, কূর্মবেশে শত্রু নিধনের জন্যই ভগবান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, প্রকৃতির এই কূর্ম লক্ষণের মধ্য দিয়ে সেই ঐতিহ্যময় কূর্মাবতারের ইশারাই এখানে পরিস্ফুট। এ আঙ্গিক কোন নীতি নিয়ম ধরে, বা মায়ার হোল্ড প্রমুখ মনীষীদের কার্য ধারার পর্যালোচনা অথবা অনুকরণ করে আসেনি, দৈনন্দিন জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু করেই এই আঙ্গিকের জন্ম। এইরকম প্রতিনিয়তই ঘটছে, স্রষ্টা শিল্পী সেগুলিকেই পরম আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করেন এবং প্রকাশ করেন তাঁর শিল্পের মাধ্যমে।

কোন ইজম বা মতবাদের বাঁধা ধরা সড়ক নয়, তাবৎ মানুষের জীবন, তাদের ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কার, আচার, আচরণ এবং তার প্রকাশ রীতির খুঁটি নাটি অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই মিলতে পারে আঙ্গিকের পন্থা। আর ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধরে আসা সেই আঙ্গিক-প্রকরণ কোন বিশেষ ism-এর চেয়ে নিঃসন্দেহ ভাবে অনেক বলিষ্ঠ, অনেক সৌন্দর্য মণ্ডিত, এবং প্রাণবন্ত হবে।

তাই বিদেশের অন্ধ অনুকরণ নয়, জাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়ে, জাতীয় জীবনে সর্বাত্মক উন্নতির কামনায় আজকের দর্শকের সামনে নাট্যবস্তুকে বিকশিত করে তুলতে হবে। অন্ধতা অথবা লোলুপতা কোনদিন সার্থক শিল্প সৃষ্টি করতে পারে না। যা কিছু নতুন, তাই সত্য নয়; জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির কষ্টি পাথরে যাচিত হয়ে যে নতুন, তাবৎ জনগণের মানস-লোকে নবতর ভাবচেতনার দ্বন্দ্বসংঘাত পরিস্ফুট করতে পারে, নির্দেশ দিতে পারে কল্যাণময় ভবিষ্যতের তাকেই নতুন বা নব্যধারা বলে মেনে নেওয়া যায়। আজকের প্রযোজকের এই কথাটিই সর্বাগ্রে স্মরণ রাখা উচিত।

পরিচালনা

অষ্টম অধ্যায়

এক

পরিচালক বনাম প্রযোজক

নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে পরিচালক এবং প্রযোজক শব্দ দুটি নিয়ে একটু বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। প্রচলিত অর্থে সমস্ত নাট্য-ব্যাপারটা, অর্থাৎ তার অভিনয়-শিক্ষা, দৃশ্য-পরিকল্পনা, আলোক-নিয়ন্ত্রণ, রূপসজ্জা, ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ-রচনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে যিনি একটি নাটককে সাধরণে পরিবেশন করার উপযুক্ত করে তোলেন, তাঁকেই আমরা বলি নাটকের পরিচালক, আর প্রযোজক বঁলি তাঁকেই যিনি সমগ্র নাট্য-ব্যাপারটা সংঘটনের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়, তা বিনিয়োগ করেন। আমাদের দেশে নাট্যাভিনয়ে প্রয়োগাচার্য শব্দের ব্যবহারটা শ্রীরঙ্গম কর্তৃক প্রচারিত পোস্টারে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের নামের আগেই কয়েকবার দেখেছি। আর সব জায়গাতেই পরিচালক শব্দটিই লিখিত হয়।

অথচ ইতিপূর্বে আমরা নাট্য-প্রযোজনার বিভিন্ন অংশের দায়দায়িত্ব প্রযোজকের স্কন্ধেই আরোপ করেছি। আমরা বলেছি যে, নাটকের প্রযোজক অথবা প্রয়োগাচার্য হলেন তিনিই, যিনি নাটকের বিষয়বস্তুর মূলসুরটি, প্রয়োগ কৌশলের বিভিন্ন এবং বিচিত্র আঙ্গিকের মাধ্যমে সাধারণ্যে পরিস্ফুট করেন। বলাবাহুল্য প্রযোজক এবং প্রয়োগাচার্যের সত্যিকারের কাজই হলো তাই। তিনি financer হলে হতে পারেন, কিন্তু প্রযোজক কেবলমাত্র financer বা অর্থ-বিনিয়োগকারী নন।

আমরা সাধারণতঃ পরিচালক শব্দটিকেই এই অর্থে ব্যবহার করি। তাই ইতিপূর্বে প্রযোজকের দায়ভাগের যে সব কথা আমরা বলেছি, সেগুলি একজন পরিচালকের পক্ষেও প্রযোজ্য। শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয়ে বিতর্কের অবতারণা করার প্রয়োজন নেই। সাধারণ অর্থে পরিচালককেই প্রযোজক বলে মেনে

নিলে পরিচালকের দায়দায়িত্বের পুনরালোচনা না করে, পরিচালকের সঙ্গে অভিনেতার এবং নাটকের রিহার্সাল বা মহলার কি সম্পর্ক সে কথাই আলোচনা করা যাক।

ধরা যাক প্রযোজক এবং পরিচালক একই ব্যক্তি। তাহলে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে আমরা যে paper-works-এর কথা ইতিপূর্বে বলেছি, অর্থাৎ চরিত্র বিশ্লেষণ, অভিনয়-পদ্ধতি, কম্পোজিশন বা টিমওয়ার্ক, দৃশ্যসজ্জার রীতি, আলোক-নিয়ন্ত্রণ প্রণালী, রূপসজ্জা এবং আবহ-সঙ্গীতের প্রকৃতি ইত্যাদি এগুলির রূপরীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হলে, পরিচালক নাটকটিকে মহলায় ফেলেন। নাটক মহলায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে paper-works বা Theory-র পর্যায় অতিক্রম করে তা Practical বা বস্তুভিত্তিক হয়ে ওঠে। নিজের মনে মনে একটি নাটকের প্রয়োগ-কৌশলের রীতি নীতি সম্পর্কে পরিচালক এতদিন যা ভেবেছেন, এইবার তাকে বাস্তব করে তুলতে উদ্যোগী হন।

মহলার পূর্বে নাট্য-প্রযোজনার এই paper works-এর পর্যায় পরিচালকের কর্মপদ্ধতি মোটামুটি ভাবে দুটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। অনেক সময় পরিচালক কি করতে চান, অর্থাৎ প্রয়োগ-কৌশলে কোন রীতি অবলম্বন করবেন, তা বারম্বার পর্যালোচনা করে মনে মনেই ভেবে রাখেন, আবার কোন কোন সময় সেগুলি কাগজে কলমে এঁকেও রাখেন। ছায়াচিত্রের ক্ষেত্রে গল্পটির ব্যবহারিক প্রয়োগ-রীতির ছবিগুলো, বিখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় আগে ভাগে এঁকে রাখেন এ আমরা জানি। মঞ্চের ব্যাপারে আমাদের দেশের কোন প্রযোজক তা করেন কিনা জানিনা, তবে দৃশ্যপট, অনেক সময় এঁকে রাখা হয়।

ওদেশে বিখ্যাত প্রযোজক স্টানিস্লাভস্কি তাঁর নাট্য-প্রযোজনা অর্থাৎ দৃশ্য পট, তার মধ্যে অভিনেতার অবস্থিতি, তাদের পোষাক, রূপসজ্জা ইত্যাদি সব কিছুই এঁকে রাখতেন।

আমাদের দেশে অপেশাদার নাট্যসংস্থা অর্থাৎ যারা নাকি নাট্য ব্যাপারে সাহিত্য-গত এবং প্রযোজনা-গত সর্ব বিষয়েই পরীক্ষা নিরীক্ষায় অগ্রনী,

তাঁদের এই সুসম্বদ্ধ রীতিটি মেনে চলাই উচিত। এতে করে নাট্য-প্রয়োগ আরো সু-নির্দ্দিষ্ট হয়ে উঠতে পারে, অন্ততঃপক্ষে কাজের সুবিধা হতে পারে।

কিন্তু সে যাই হোক, এইবার paper-work বা theory'র কথা ছেড়ে নাট্য প্রযোজনার practical অর্থাৎ বস্তু ভিত্তিক দিকটি সম্পর্কেই আলোচনা করা যাক।

দুই

পরিচালক ও অভিনেতা

পরিচালকের সঙ্গে অভিনেতার সম্পর্ক হলো সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। কেননা নাটকের প্রাণবস্তু হলো অভিনয়, সুতরাং দৃশ্যসজ্জা-কর, অথবা আলোক-শিল্পীর সঙ্গে আঙ্গিকের রূপরীতি ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা-চক্রে বসার আগে পরিচালক অভিনেতাদের সঙ্গে বসে, নাটকটির চরিত্রগুলির বণ্টন করেন, এবং তারপর সেই চরিত্রগুলি অভিনয়ের দ্বারা প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য সচেষ্ট হন।

অভিনেতাদের সঙ্গে পরিচালকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও অনেক সময় কিন্তু আবার মতবাদের তারতম্য;হেতু এই দুজনের সম্পর্ক ধারা বিপরীত হয়ে ওঠে। অনেক সময় দেখা যায় পরিচালকরা হয়ত সরাসরি অভিনেতাদের বিরোধিতা করছেন, অথবা নাট্যাভিনয়ে তাঁদের অবস্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে তেমন মনোযোগ দিচ্ছেন না। বলা বাহুল্য নাট্য-প্রযোজনার আঙ্গিক-গত চিন্তার বিভিন্নতাই পরিচালকের এই সব ধারণাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। অভিনেতার সঙ্গে পরিচালকের সম্পর্কের এই বিভিন্নতা নির্ধারিত হয়, নাট্য-প্রযোজনা সম্পর্কে পরিচালকের মতামত থেকে। পরিচালক যদি নাট্যকার হন, তাহলে অভিনেতার সঙ্গে তাঁর যে রকম সম্পর্ক হবে, বলা বাহুল্য তিনি যদি স্বয়ং অভিনেতা হন, তাহলে সে রকম থাকবে না।

নাট্যকার-পরিচালক কোন কারণেই নাটককে ক্ষুন্ন করে, বা কেটে ছেঁটে, সংলাপের বদল করে, অভিনেতাকে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষপাতী হবেন না। অভিনেতার মধ্য দিয়ে তাঁর নাটকের বক্তব্যটিকেই তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করবেন, আর তার জন্য যদি অভিনেতার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করতেও হয় তাতেও কুণ্ঠাবোধ করবেন না। আবার পরিচালক-অভিনেতার উদ্দেশ্য হবে ঠিক এর বিপরীত, তিনি চাইবেন নাটকের ওপর অভিনেতার সার্বিক প্রাধান্য, এবং তার জন্য প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নাটককে কেটে ছেঁটে, অথবা নিজের সুবিধামত সংলাপ বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করবেন না।

ঠিক তেমনি পরিচালক যদি মঞ্চসজ্জাকারী হন, তাহলে অভিনেতা অথবা নাট্যকার অপেক্ষা দৃশ্যসজ্জার দিকেই তাঁর নজর থাকবে বেশী, এবং তার জন্য প্রয়োজন হলে তিনি উভয়কেই বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী হয়ে উঠতে পারেন। যদিও আমাদের দেশে এই ধরনের বিচিত্র মতবাদ নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে গড়ে ওঠেনি এখনও, তবু পাশ্চাত্য দেশে পরিচালক ও অভিনেতা সম্পর্কে এই ধরনের অনেক মতবাদের পরিচয় আমরা পাই। যেমন ধরা যাক 'সোলোগভের' কথা। সোলোগভের ধারণা ছিল রঙ্গমঞ্চ হলো নাট্যকারের নিজস্ব সম্পত্তি। এখানে অভিনেতা বা অন্যান্যদের কিছু করণীয় নেই। আর এই ব্যাপারে সোলোগভ এতদূর বিশ্বাসী ছিলেন যে নাটকের মধ্য থেকে অভিনেতাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেবার চেষ্টা করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। তাঁর মতে নাটকের ক্ষেত্রে অভিনেতারা হলো অবাঞ্ছিত ব্যক্তি, সুতরাং নাট্য-প্রযোজনা থেকে তাদের সর্বাংশে বর্জন করাই হলো পরিচালকের প্রধান কর্তব্য।

সোলোগভের ধারণা ·নাটকে অভিনেতার স্থান যত বড় মনে করা হবে, তত বেশী নাটক কমজোরী হয়ে পড়বে, কেননা অভিনেতারা চরিত্র নিয়ে যথেচ্ছাচার সুরু করবেন প্রাণ খুলে।

সোলোগভের এই ধারণাটা যে খুব মিথ্যে তা নয়; আমাদের দেশের ট্রাডিশনাল অভিনয়ের কথা স্মরণ করলেই তা বোঝা যাবে। চিরকালই দেখা গেছে যে বড় বড় অভিনেতারা তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী চরিত্রে রূপ দিয়েছেন,

অভিনয় করেছেন, ব্যক্তিগত কায়দা কানুন দেখানর ঝোঁকে, অনেক সময় যে পার্শ্বচরিত্র গুলো শুধু বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে তা নয়,সমগ্র নাটকটাই হয়ত মরমে মরে গেছে। কিন্তু তবু সেটাকে ক্ষতি বলে স্বীকার করা হয়নি, কেননা বড় বড় অভিনেতার মঞ্চে উপস্থিতিটাই ছিল দর্শকদের কাছে একটা বড় ব্যাপার। তাঁরা অভিনেতার ব্যক্তিগত কলাকৌশল দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, মনে মনে মুখস্থ করেছেন তাঁদের হাঁটা-চলা, কথাবার্তার ভাবভঙ্গী, তাঁদের ভুলত্রুটিও চিত্ত-চমৎকারী হয়ে দেখা দিয়েছে দর্শকের কাছে ; তাই শুধু অভিনয় দেখার সময় নয়, প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এসেও সাগ্রহ আনন্দে সেই সব ভুলত্রুটির কথা অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছেন বন্ধুদের কাছে। এইভাবে অভিনয়ে মারাত্মক ভুলচুকও বড় অভিনেতার পক্ষে কমপ্লিমেণ্ট হয়ে গেছে।

বন্ধুমহলে অমুক অভিনেতা কি চমৎকার ভুল করলেন, আবার তা মানিয়ে নিলেন, অথবা একটা প্যাঁচ দিয়ে পাশের অভিনেতাকে কি ভাবে দাবিয়ে দিলেন, এসব সরস কাহিনী বর্ণনা করে আনন্দলাভ করেছেন এমন ব্যক্তি যে নেই একথা বলা যায় না। আমাদের মঞ্চের অনেক বড় বড় অভিনেতা সম্পর্কে এই ধরনের অনেক গল্প, প্রবাদ-কাহিনীর মতই সাধারণ্যে প্রচলিত আছে। দর্শকদের এই অহেতুক অভিনেতা প্রীতিই জন্ম দিয়েছে তারকা পদ্ধতির। রাতারাতি এদেশের বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী star হয়ে বসেছেন ; আর একবার সেই বহু ঈপ্সীত তারকাত্ব লাভ করতে পারলে, তাঁরা মঞ্চে উঠে অভিনয় করুন অথবা পাঠ ভুল করুন, হাঁটুন, চলুন, কিম্বা ডিগবাজী খান, কিছুতেই কিছু যায় আসেনা। কেননা এই star-এরা যেখানে থাকেন দর্শকদের ভীড় সেইখানেই।

বলাবাহুল্য এই জনপ্রিয়তা অনেক অভিনেতা যথাযথ ভাবেই নিজেদের কাজে লাগিয়েছেন। তাঁদের অহংবোধ এর ফলে এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে, তাঁরা নাট্যকার বা পরিচালককে তুচ্ছজ্ঞান করতেন! প্রযোজকের কথা বাদই দিলাম, কেননা তিনি তো অর্থবিনিয়োগকারী ব্যক্তিমাত্র। স্টারেরা অভিনয়ই করুন আর জিমন্যাস্টিকই করুন, তাতে তাঁদের কিছু যায় আসেনা। দর্শক এলেই হলো, box office ভর্তি থাকলেই হলো।

নাট্যকারদের রচিত নাটক মনঃপুত না হলে অভিনেতারা অভিনয় করতেন না। আর শুধু যে করতেন না, তাই নয়, নিজের মনোমত চরিত্র সৃষ্টি করতে বাধ্য করতেন, আর পরিচালকের তো কথাই নেই। নাটকের পরিচালক থাকাটা convention বলেই তাঁর নামটা থাকতো, নইলে অভিনয় বারায় তাঁর মাথা ঘামান'র বিশেষ কিছু ছিল না। ট্রাডিশনাল যুগে অভিনেতাদের এই একনায়কত্ব মেনে নিয়েছিলেন সকলেই, তাই ব্যক্তিগতভাবে কারুর কোন ক্ষোভ ছিলনা। আজও আমরা দেখি combination night হলে ভীড় হয়। আজও আমরা অভিনয় দেখতে যাবার আগে খোঁজ করি কে কে অভিনয় করছেন। কে পরিচালনা করছেন তাঁর নাম আমাদের মনেও আসেনা। নাটক পরিচিত হয়েছে ব্যক্তিগত অভিনেতার নামে; নাটক রচিত হয়েছে ব্যক্তিগত অভিনেতার হাভভাব, চলন বলন, লক্ষ্য করে, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

কিন্তু অভিনেতার একনায়কত্বের প্রচণ্ড দাপট থাকা সত্ত্বেও মনে মনে এই স্বৈরাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ভাবনা চিন্তা সুরু হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে অভিনেতার এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে নাট্যকার হিসেবে প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের নাটক বেলগাছিয়া রঙ্গশালায় অভিনীত হতো। সেখানকার প্রধান অভিনেতা ছিলেন কেশব গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি অভিনয়ের সুবিধার জন্য প্রায়ই মধুসূদনের নাটকে কাঁচি চালাতেন। তাই একবার মধুসূদন চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, যদি তিনি অর্থাৎ কেশব গঙ্গোপাধ্যায় বার বার এইরকম করেন, তাহলে মধুসূদন যে অভিনয়ের জন্য শুধু নাটক দেবেন না তাই নয়, নাটক লেখাই তিনি ছেড়ে দেবেন। বলা বাহুল্য মধুসূদনের এই প্রতিবাদে কোন ফল হয়নি। অভিনেতার একছত্র আধিপত্য এই সেদিনও আমাদের রঙ্গমঞ্চ ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল।

শুধু যে আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চেই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে তা নয়, পৃথিবীর সব দেশের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসেই এই ঘটনার পুনরাবর্তন নজরে পড়ে। তাই নবযুগের চিন্তানায়কেরা অভিনেতার একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সুরু করলেন। পূর্বে উল্লিখিত সোলোগভে'র উক্তি এই

প্রতিবাদেরই চরম প্রকাশ। নাট্য অভিনয়ের ক্ষেত্র থেকে তিনি একেবারে অভিনেতাকে বাদ দিতে চাইলেন, তাঁর মতে অভিনয়ের ক্ষেত্রে তারা nuisence ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নাটক থেকে অভিনেতাকে বাদ দিলে অভিনয় হবে কেমন করে। সোলোগভ সেই প্রশ্নের জন্যও প্রস্তুত ছিলেন, তাই নিজেই প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে একটা খসড়া করেছেন। সোলোগভের সেই পদ্ধতিটি কি, তাই এবার দেখা যাক। তিনি বলেন, দর্শকের সামনে নাট্যকার মঞ্চে নাটকটি পাঠ করবেন। দৃশ্যসজ্জা থাকবে যথাযথ, আর অভিনেতা অনেকটা ম্যারিওনেটের কাজ করবেন।

সোলোগভের এই রীতি নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে চরম পরীক্ষার ফল বলে মনে হলেও, তা সহজে মনে নেওয়া যায় না। নাট্য পাঠের মধ্য দিয়ে তার সাহিত্য-মূল্য বিচার করা সম্ভব হলেও তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। তার জন্য প্রয়োজন নাটকটির অভিনীত হওয়া। বলা বাহুল্য এই অভিনয় করবেন অভিনেতারাই, স্থতরাং নাট্য-প্রযোজনার আসর থেকে তাঁদের বাদ দিয়ে বা কেবলমাত্র পুতুলে পর্যবসিত করে, ভাল নাট্য-প্রযোজনা আশা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো নাট্যাভিনয়, পুতুল নাচ নয়। পুতুলের মাধ্যমে যে কোন নাটকই অভিনয় করা যায়, যেমন করা যায় "মিকি মাউসের" মাধ্যমে সিনেমা। সেখানে নাট্যকার, প্রযোজক, বা পরিচালকের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি মিটিয়ে নেবার, বা প্রয়োগ-রীতি সম্পর্কে নিজস্ব কোন বিশিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার অবাধ অবকাশ আছে। কিন্তু নাটককে পুতুল অথবা মিকিমাউসের দ্বারা অভিনয় করান যায় কিনা, এ তথ্যের অবতারণা না করে, অভিনেতাদের দিয়েই তা অভিনয় হয়, এবং সেই অভিনয় একটা যৌথ-শিল্প চেতনার ফলশ্রুতি বলেই আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, স্থতরাং সে ক্ষেত্রে অভিনেতাদের বাদ দিয়ে বা পুতুলে রূপান্তরিত করে অভিনয় করার ঔচিত্য অথবা অনৌচিত্য সম্পর্কিত মতবাদের আলোচনা করা নিরর্থক। আমাদের আলোচনা নাট্যাভিনয়ে অভিনেতা আছে, এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা ও দায় দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে।

সোলোগভের মত, বিখ্যাত মঞ্চশিল্পী গর্ডনক্রেগও ছিলেন অভিনেতাদের ওপর খড়্গহস্ত। নাট্যকারদের প্রতিও তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল। নাট্য প্রযোজনায় গর্ডনক্রেগ ছিলেন নাট্যকার এবং অভিনেতা উভয়কেই বাদ দেওয়ার প্রয়াসী। কেননা তাঁর মতে নাট্য শিল্পে নাট্যকার বা অভিনেতার কোন প্রয়োজন নেই। নাট্যকারের বিরুদ্ধে তাঁর এই জেহাদের কারণ হলো যে, তাঁরা অহেতুক ভাবে থিয়েটার কে literalize করার চেষ্টা করেন আর অভিনেতাদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা হলো এই যে, নাট্যাভিনয় জীবন্ত মানুষের বদলে পুতুল দিয়েও সম্ভব, সুতরাং তাদের প্রয়োজন নেই। সোভিয়েত রাশিয়ায় মস্কো আর্ট থিয়েটারের পক্ষ থেকে গর্ডন ক্রেগ যখন "হ্যামলেট" নাটকের প্রযোজনা করছিলেন, সেই সময় তিনি এই কথা বলেছিলেন বলে Zakhava উল্লেখ করেছেন।

বলা বাহুল্য ক্রেগের এই বিশ্বাস Zakhava সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে ব্যক্তিগত বোধ বুদ্ধিকে মঞ্চে রূপায়িত করার তীব্র আকাঙ্খাই এই ধরণের মতবাদ সৃষ্টি করে। সোলোগভ বা গর্ডন ক্রেগের কথার মধ্যে সমষ্টিকে অস্বীকার করে, নাট্য-প্রযোজনায় একনায়কত্বের জয়গানের ইশারাই আমরা পাই। এই ধরনের মতবাদ নিঃসন্দেহে যৌথ-শিল্প-চেতনা বিরোধী।

নাটকে অভিনেতার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। আর সেই অভিনেতা এবং পরিচালকের সম্পর্ক শত্রুতার নয়, বরং বন্ধুত্বের। আজকের মানস, প্রযোজনার যৌথ-দায়িত্বের প্রতি আস্থাবান, ব্যক্তিগত প্রতিভা প্রদর্শনের অবকাশ থাকলেও নাট্যাভিনয়ে আজ যৌথ অভিনয় চেতনার প্রতিই জোর দেওয়া হয়ে থাকে বেশী। Group acting বা team work ইত্যাদি শব্দগুলি সেই যৌথ-শিল্প চেতনার প্রতিই আস্থা-স্থাপনের অভিজ্ঞান। অভিনেতাকে বাদ দিয়ে অন্ততঃ আমাদের দেশে, কোন নাট্য-প্রযোজনার কথা এখনও ভাবা হয়নি, এবং সে ধরনের কোন পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। সুতরাং নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে অভিনেতার অস্তিত্ব এবং সর্বাধিক প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়েই আমরা পরিচালক এবং অভিনেতার সম্পর্ক-সূত্রটির পরিচয় গ্রহণ করবার চেষ্টা করবো।

প্রযোজক বা পরিচালকের কর্ম পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বার

বার বলেছি যে, একটি নাট্যপ্রয়োগের রীতি নীতি সম্পর্কে প্রযোজক অথবা পরিচালক যা ভাবেন, অভিনেতা এবং দৃশ্যসজ্জাকর, আলোক-সম্পাতকারী ইত্যাদি নাট্য-প্রয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সহায়তায় সেই ভাবনাকেই বিমূর্ত করে তোলেন। সুতরাং এক হিসেবে নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রযোজকের অথবা পরিচালকের ভাধনাকে প্রমূর্ত করে তুলতে এঁরা উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হন, একথা বলা যায়। কথাটা মিথ্যে বা অতিরঞ্জিত নয়। তবু ঐ 'উপাদান' শব্দটি সম্পর্কে একটা অর্থগত খটকা আমাদের মনে থেকেই যায়। যদি প্রযোজক বা পরিচালক নিজের ধ্যান-ধারণা মূর্ত করে তোলার উদ্দেশ্যেই নাট্য-প্রযোজনা করেন, তাহলে একক ব্যক্তিত্ব বা Zakhava যাকে বলেছেন "single will" তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় কেমন করে? অভিনেতা বা অন্যান্য বিশেষজ্ঞ শিল্পীরা যদি উপাদান-ই হন, তাহলে একক ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী যে কোন পরিচালকই তো তাদের নিজের ইচ্ছামত কাজে লাগাতে পারেন, বা প্রয়োজন বোধে বাদ দিতেও পারেন। এবং তাহলে নাট্য প্রযোজনা যে যৌথ-শিল্প-চেতনার ফল এটাও একটা কথার কথা মাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

প্রসঙ্গটা জটিল, সুতরাং সতর্কভাবে এর মীমাংসার প্রয়োজন। কেন না এই মীমাংসার মধ্য দিয়েই পরিচালকের সঙ্গে অভিনেতা এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ শিল্পীদের সম্পর্ক-সূত্রটির আসল স্বরূপ আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

প্রথম কথা হচ্ছে নাট্যশিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে। নাটশিল্পের উদ্দেশ্য হলো তাবৎ জনসাধারণের সুখদুঃখ, আচার ব্যবহার, তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে, তাদের যথাযথ স্থান নির্দেশ করে, দেশের স্বার্থে তাদের জীবনধারাকে সুস্থ পরিণতির দিকে প্রাগ্রসর করা। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা কোন মত বা আদর্শ বিশেষের কেবলমাত্র জয়গান করা নয়। এই উদ্দেশ্য স্বীকার করে নিলে, মানতেই হবে যে, নাট্য-শিল্পের উৎকর্ষতার জন্যে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁরা সকলেই একটি মাত্র আদর্শেই বিশ্বাসী। মতভেদ থাকতে পারে সেই আদর্শকে রূপায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে। এখন একই আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তি-সমষ্টির মধ্যে যখন আঙ্গিকগত মতভেদের প্রশ্ন

উত্থিত হয়, তখন তাঁরা পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়েই তার নিরসনের চেষ্টা করেন, কেননা ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের বোধ এবং বোধির প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধাশীল।

তাই যখন পরিচালক কোন নাটক মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তখন অভিনেতা এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ শিল্পীদের সঙ্গে সমবেত হয়ে, তাঁর কর্ম পদ্ধতির ব্যাখ্যা সুরু করেন। এবং যতক্ষণ সমবেত আলোচনা, সমালোচনার মধ্যদিয়ে একটা সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যসীমার সন্ধান না পাওয়া যায় ততক্ষণ এই সম্মিলিত বৈঠকের সমাপ্তি হয় না। এই আলোচনার ফলে অনেক পন্থা বর্জ্জিত হয়, আবার অনেক নতুন পন্থাও সংযোজিত হয়, তারপর সকলের সমবেত সাহায্যে যখন সেই পদ্ধতি একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে, তখনই পরিচালক সেই নাটকটিকে মঞ্চস্থ করার নির্দ্ধিষ্ট সংকল্প গ্রহণ করেন। সুরু হয়, দৃশ্য-সজ্জা, আবহ-সঙ্গীত,আলোক-সম্পাত,মহলা, ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ। এইভাবে সমবেত আলোচনার ফলে সকল শিল্পীই নিজস্ব মতামত প্রদান এবং তা যাচাই করবার অবকাশ পান, এবং নিজেদের অন্তরের রসচেতনা, কাজের মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তোলার অবকাশও লাভ করেন। বলা বাহুল্য প্রযোজক বা পরিচালক যদি একক ব্যক্তিত্ব বা single-will-এ বিশ্বাসী হন, তাহলে এই ধরনের আলোচনা-চক্রের কোন প্রশ্নই ওঠে না। নাটকের যৌথ-শিল্পত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসী হলে প্রযোজনা সংক্রান্ত বিষয়ে অন্যান্য শিল্পীদের মতামতের প্রতিও পরিচালক শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা নাট্য-প্রযোজনার উপাদান হলেও তাঁদের জড়বুদ্ধি সম্পন্ন অচেতন পদার্থ, বা নিজের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করার যন্ত্র স্বরূপ বলে মনে করেন না।

সুতরাং পরিচালক এবং অভিনেতার সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি যে, যদিও অভিনেতার মাধ্যমে নাট্য-চরিত্র সম্পর্কে ধ্যান ধারণা, পরিচালক ফুটিয়ে তোলেন, তবু তা অভিনেতার ব্যক্তিত্ব এবং শিল্পবোধকে অস্বীকার করে নয়। তাই পরিচালক এবং অভিনেতার সম্পর্ক হল মরমী বন্ধুত্বের, তাঁরা উভয়েই নাট্যশিল্পের দরদী শিল্পী, উভয় উভয়ের বন্ধু, এবং সহমর্মী।

আমাদের দেশের নাট্যাভিনয়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী পরিচালক হিসেবে অভিনেতার এক-নায়কত্বের পরিবর্ত্তে একান্নবর্তী অভিনয় রীতির প্রবর্তনের দিকেই তাই উৎসাহী ছিলেন। ব্যক্তিগত প্রতিভার ফলে তাঁরা সকলকে ছাপিয়ে উঠলেও সমবেত অভিনয় অর্থাৎ gaoup acting-এর ধারাটিই সার্থকভাবে প্রবর্তন করেছিলেন।

তিন

পরিচালকের কর্ত্তব্য

অভিনেতা এবং পরিচালক হলেন পরস্পরের সখা, সচীব, পরিচালকের কাছে অভিনয়ের পাঠশিক্ষা গুরুগৃহে বিদ্যালাভ করারই সামিল। তাই পরিচালকের কাছ থেকে অভিনেতার প্রাপ্য স্নেহ এবং সৌহার্দ্য। পরস্পরের এই মরমী সহযোগীতা না থাকলে কোন পাঠই সম্পূর্ণ হয় না; শিল্প শিক্ষা তো নয়ই। কেননা তা নির্ভর করে মনের গভীরতম প্রদেশে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবানুভূতি এবং আবেগ ও কল্পনার বিকাশ থেকে। শিল্পীকে লালন করতে চেষ্টা করা তাই পরিচালকের প্রথম কর্ত্তব্য। বন্ধুর মত যে শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে পারেন না, উপরন্তু কেবল বেত উঁচিয়ে সম্মান শ্রদ্ধা আদায়ের চেষ্টা করেন, তিনি নিঃসন্দেহে পথ-ভ্রান্ত। তাঁর অবলম্বিত পন্থায় সন্মান শ্রদ্ধাতো পাওয়া যায়ই না, উপরন্তু শিক্ষকতার যেটা আসল উদ্দেশ্য, আর্থাৎ ছাত্রদের কোমল হৃদয়-বৃত্তিগুলিকে বিকচোন্মুখ পুস্পের মতই শতদলে প্রকাশ করার সাধনা, তাও সুদূর-পরাহত হয়ে ওঠে।

পরিচালকের প্রাথমিক কাজ তাই শিল্পীকে লালন করতে শেখা। এ কথা একশোবার সত্য যে, সাধারণ যে কোন মানুষের চেয়ে শিল্পী মানস একটু বেশী স্পর্শ-কাতর, একটু ভালবাসার উত্তাপে যেমন তার মানস পুষ্পের পাপড়ী-গুলি শতদলে বিকশিত হয়, ঠিক তেমনি সামান্যতম অবহেলা বা অশ্রদ্ধাতে তা চিরকালের জন্য সংকুচিত হতেও দ্বিধা বোধ করে না। আশা নিরাশার দোদুল দোলায় স্পর্শ কাতর শিল্পীমানস সদাই দোদুল্যমান। যিনি এই স্পর্শ-কাতর

শিল্পীমানসটিকে যথোচিত শ্রদ্ধা, স্নেহ, বাৎসল্য ইত্যাদির দ্বারা লালন করে তাকে বিকশিত করতে পারেন, তিনিই সার্থক পরিচালক।

দ্বিতীয়ত পরিচালককে হতে হবে অসীম ধৈর্যশীল এবং আশাবাদী। ছাত্ররা ভুল করে, ভুল করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ; কিন্তু সেই ভুল-ভ্রান্তিকে অশ্রদ্ধা করলে চলবেনা, বরং অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ছাত্রকে বার বার সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে ভুল-ভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। শিশু যখন প্রথম হাঁটতে শেখে তখন সন্তানগর্বে গরবিনী জননী তাকে হাত ধরে হাঁটতে শেখান, আর শিশু যখন টলমল করে হাঁটতে সুরু করে তখন গর্বে, স্নেহে, করুণায় বিগলিত মাতৃ-হৃদয় তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার অসাবধানতায় রাগ করে না, বা তাকে হাঁটার চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করে না কোন কারণেই।

প্রথম অভিনয় শিক্ষার উৎসাহে ভুল-ভ্রান্তিও যেমন ঘটতে পারে, তেমনি নানা স্পর্দ্ধার কথাও বলতে পারে ছাত্র। অমুক ভঙ্গীটা হচ্ছে না, কি ওটা হয় না, এটা বদলে দিন, কিম্বা অমুক জায়গাটা ভাল লাগছেনা ইত্যাদি নানান মতামত তারা দিতে পারে। ছাত্রদের এই মতামতগুলি অগ্রাহ্য করা, বা সেগুলিকে মর্যাদা না দিয়ে জোর করে দাবিয়ে রাখা উচিত নয়। কেননা এগুলি হলো মনোরাজ্যের স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণের পর্যায়। গোড়াতেই বাধা দিলে বা অগ্রাহ্য করলে ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তার শক্তি অবলুপ্ত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায় এবং তার ফলে প্রতিভার স্ফূরণের পরিবর্তে একটি শিল্পীর অকাল-মৃত্যুই ঘনিয়ে আসে। আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে অসীম ধৈর্য এবং তিতিক্ষা সহকারে,পরিচালক অভিনয় শিশিক্ষু ছাত্রদের শিক্ষাদিয়ে থাকেন। আত্মম্ভরীতা বা অহংবোধ শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য কেননা তা নিজের এবং অপরের এককথায় উভয় পক্ষের ক্ষেত্রেই সমান পীড়াদায়ক।

এই সব দায়দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখেই একজন পরিচালক আচার্যের আসন গ্রহণ করেন। সুতরাং আচার্যের আসন গ্রহণ করার পূর্বে নিজের মনের দিকে, এবং কর্ম শক্তির দিকে, পরিচালকের একবার ফিরে তাকানর দরকার। অর্থাৎ আত্মসমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষা দিতে যাবার পূর্বে,

নিজেদের শিক্ষক হবার উপযুক্ততা আছে কি না একথা আমরা যাচাই করে দেখিনা বলেই এ সংসারে যত বিপত্তির সৃষ্টি। যে কোন কাজে নামার ক্ষেত্রেই তাই নিরপেক্ষ আত্মসমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

চার

পরিচালকের শ্রেণীবিভাগ

পরিচালকের মূল কাজ হলো অভিনেতাকে নিয়ে একথা সর্ববাদীসম্মত। নাট্য-পরিচালক অভিনেতাকে নাটকের চরিত্রগুলি যথাযথ আয়ত্ব করতে সাহায্য করেন। এই কাজে সকলের শিক্ষাদান প্রণালী স্বাভাবিক ভাবেই এক রকমের হয় না। বিভিন্ন পরিচালক বিশেষ গবেষণা এবং চিন্তার ফলে নিজস্ব শিক্ষা-দান পদ্ধতির যে নিরীখটি আবিষ্কার করেন, বলাবাহুল্য অভিনয় শিক্ষা দান কালে সেই নিরীখই তাঁরা প্রয়োগ করেন। এই পন্থাগুলির কোনটা ভাল এবং কোনটা মন্দ, তা বিচার করে বলা সহজ নয়। সময়ের কষ্ঠি-পাথরে, অর্থাৎ নাট্য-প্রযোজনার পর, যখন সমবেত দর্শকমণ্ডলী অভিনয় কলা দর্শন করবেন, তখনই তার বিচার হয়ে যাবে। তবু মোটামুটি ভাবে এই সম্পর্কে একটা আলোচনা করা যেতে পারে। সোভিয়েত শিল্পী চেরকাসভ শিল্পী অভিনেতার সঙ্গে পরিচালকের সম্পর্ক-সূত্রটির স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে, শিক্ষা-দানের পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালককে সাধারণ ভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

ক। বাক সর্বস্ব পরিচালক (Gas bag Directors)

খ। স্বৈরাচারী পরিচালক (Dictatorial Directors)

গ। উদাসীন পরিচালক (Passive Directors)

সাধারণতঃ থিয়েটারে অভিনয়ের মহলার সময় দেখা যায় যে, অভিনেতাকে নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণে সাহায্য না করে, পরিচালক রাজনৈতিক,

সমাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ইত্যাদি নানা বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। অভিনেতাকে চরিত্র এবং তার পরিবেশ বোঝানর জন্য যে বক্তৃতা করার প্রয়োজন হয় না, তা নয়, কিন্তু সেই বক্তৃতা চরিত্রকে ছাড়িয়ে কেবলমাত্র শিক্ষকতায় পর্যবসিত যদি হয়,তাহলে নিশ্চয় তা মূল্যহীন। অভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় করানটাই হলো পরিচালকের আসল কর্তব্য, সুতরাং কেমনভাবে তাকে উৎসাহিত করে, তার মনের সুপ্ত বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে, ভাবাভিব্যক্তিতে তাকে সাহায্য করা যায়, তার প্রতিই একজন পরিচালকের সতর্ক দৃষ্টি থাকা উচিত। তা না করে অনেকেই কেবলমাত্র কতকগুলি সাংস্কৃতিক বক্তৃতা দিয়ে অভিনেতাকে ক্লান্ত করে দেন। তাতে করে দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে অভিনেতার কিছু কিঞ্চিৎ জ্ঞানকাণ্ডের উদয় হলেও, চরিত্রায়ণ সম্ভব হয় না। এই ধরনের বক্তৃতায় যে সব পরিচালক বিশ্বাসী, চেরকাশভ তাঁদের বাকসর্বস্ব অর্থাৎ Gas bag Directors বলে পরিচিত করতে চেয়েছেন এবং এইসব পরিচালকদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হলো,

> "...Long talks on historical, philological and philosophical themes, thickly interspersed with quotations from lirerary works, only tend to tire the actor when he rehearses. They only hamper him in his search for characterization,"

অপর দল আবার বিশুদ্ধ বক্তৃতায় বিশ্বাসী না হলেও, অভিনেতার স্বাধীন কল্পনার শক্তিতেও পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেন না। তাঁরা নিজেদের ভাবভঙ্গীটিই অভিনেতাকে দিয়ে যথাযথ অনুকরণ করিয়ে নেবার প্রয়াসী। ধরা যাক কোন একটি নাটক, মহলায় ফেলা হলো; সেই নাটকের চরিত্র-গুলি পরিচালক যেভাবে বুঝেছেন ঠিক সেইভাবে অভিনয় করে অভিনেতৃ গোষ্ঠীকে দেখিয়ে দিলেন, এবং বলে দিলেন সেই অভিব্যক্তিগুলি (তিনি নিজে যেমন ভাবে করে দেখালেন) ঠিক ঠিক অনুকরণ করতে। চেরকাশভের মতে স্বৈরাচারী অর্থাৎ Dictatorial Directors যাঁরা, তাঁরাই কেবলমাত্র এই পন্থায় বিশ্বাসী। এতে করে অভিনয় কিছু পরিমাণে ভাল হলেও, তা

সর্বাংশে সার্থক হতে পারে না। কেননা অভিনেতা যন্ত্র নন, তিনি রক্তমাংসের মানুষ, তাঁরও প্রাণ আছে, মন আছে, এবং সে প্রাণ অনুভব করে, সে মন আবেগ অনুরাগে উদ্বেলিত হয়। হুবহু অনুকরণ করে চলো, একথা একমাত্র যন্ত্রকেই বলা সাজে, রক্তমাংসের সজীব সতেজ মানুষের ওপর যদি এই যন্ত্রসুলভ আচরণ প্রত্যাশা করা যায় বা করার দাবী কেউ করেন, তাহলে তা যে প্রাণহীন যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হবে, তা বলাই বাহুল্য। অথচ অভিনয় যান্ত্রিক নয়। প্রাণের সহজ সাবলীল লীলাবিলাসই আমরা মঞ্চের ওপর প্রত্যক্ষ করি।

আর উদাসীন অর্থাৎ Passive Directors-দের সম্পর্কে চেরকাশভের মন্তব্য হলো,

> "(They are) very calm and collected, they never bother themselves or worry the actor, never take too great an interest in his work at the rehearsals."

কিন্তু এই ধরনের উদাসীন পরিচালকও ঈপ্সীত কর্ম সমাধানে সাফল্য লাভ করেন না। অভিনেতার কাজে হস্তক্ষেপ না করার ফলে, পরিচালকের ওপর অভিনেতারা সন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু তাতে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সন্তোষ ছাড়া যথার্থ শিল্পসৃষ্টির আনন্দ লাভ করা যায় না।

পরিচালককে হতে হবে সতত উদ্যমশীল, সহৃদয়। তিনি যেমন বক্তৃতা দিয়ে নাটকের চরিত্র এবং পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে অভিনেতাকে সমাজে তার স্থান সম্পর্কে সজাগ এবং শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলবেন, তেমনি আবার অভিনেতার যেখানে ভুলচুক হচ্ছে, বা বারবার চেষ্টা করেও যখন সঠিক ভাবের অভিব্যক্তিতে অভিনেয় চরিত্রটিকে অভিব্যঞ্জিত করতে বিফলকাম হচ্ছেন অভিনেতা, তখন তাঁকে হাতে ধরে শিখিয়ে দেবেন। তবে কোন ক্ষেত্রেই অভিনেতার ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা বা কল্পনার অবাধ প্রসারতাকে অস্বীকার অথবা অশ্রদ্ধা করে নয়।

ফুল কখনে ফোটান যায় না একথা সত্যি। তবে বিকচোন্মুখ পুষ্প স্তবককে সার্থক করে তুলতে অনেক ধৈর্য ও তিতিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচর্যার

প্রশ্ন আছে। অভিনেতাও সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু স্বাভাবিক অভিনয় প্রতিভা বা অভিনয় করার যার সম্ভাব্যতা (nack) আছে, তাকে পরিচর্যা করে তার মানসমণিকুট্টিমে সযত্নে সঞ্চিত শিল্পচেতনাটিকে ধীরে ধীরে বিকশিত হবার পথ করে দিতে হয়। এ যিনি পারেন, তিনিই হলেন সার্থক পরিচালক।

পরিচালকের কাজ হলো শিল্পীকে, তার শিল্পচেতনার বিকাশ বা প্রকাশ করতে সাহায্য করা, শিল্পী সৃষ্টি করা নয়। কেননা, শিল্পবোধ এবং সেই বোধকে প্রকাশ করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা যার নেই, পৃথিবীর অবিসংবাদীত শ্রেষ্ঠ কোন পরিচালকের শিক্ষাধীনে আজীবন থাকলেও সে অভিনেতা হিসেবে কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।

পাঁচ

আমাদের পরিচালক

বাঙলাদেশে পাশ্চাত্য থিয়েটারের অনুসরণে নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত প্রায় শত বর্ষের সীমারেখা অতিক্রম করে গেছে। উন্মেষ যুগের অভিনয় শিক্ষার কলাকৌশল সম্পর্কে অনুমানের ওপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায়ে কিছু বলা প্রায় অসম্ভব।

আমরা এটুকু জানি যে, প্রাথমিক যুগে এদেশে মঞ্চাভিনয় কোলকাতার ইংরেজী থিয়েটারকে অনুকরণ করেই সুরু হয়েছিল। এবং এই অনুকরণ কেবলমাত্র বহিরাগতই ছিল, কেননা, নতুন অভিনেতাদের নাট্যাভিনয় শিক্ষা দেবার জন্য উৎসাহী প্রযোজকরা য়ুরোপীয় নাট্যশিক্ষকেরই শরণাপন্ন হতেন। স্কুল কলেজেও ছাত্রদের যে সব অভিনয়-শিক্ষার পাঠ দেওয়া হতো, তাও পাশ্চাত্য অধ্যক্ষদেরই সহযোগিতায়। এইসব পরিচালকদের নাম প্রাচীন বাঙলা নাটকের ইতিহাসে পাওয়া যায় এবং ইতিপূর্বে আমরা তাঁদের নাম উল্লেখও করেছি।

পাশ্চাত্য এইসব শিক্ষকগণ কিভাবে অভিনয় শিক্ষা দিতেন, তা যথাযথভাবে জানা না গেলেও অনুমান করা যেতে পারে যে, তাঁরা মোটামুটি-ভাবে স্যার হেনরী আরভিং অথবা ডেভিড গেরীক, ইত্যাদি বিখ্যাত অভিনেতা এবং পরিচালকদেরই আদর্শ অনুসরণ করতেন। কারণ প্রথমতঃ তখন ইংলণ্ডে উক্ত নট-পরিচালকরাই ছিলেন সর্ববাদীসম্মত শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পী। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের অনেক শিষ্য এবং ছাত্র তখন কোলকাতায় এসেছিলেন পাশ্চাত্য সখের থিয়েটারগুলির ডাকে। এঁরা কোলকাতায় লণ্ডনের থিয়েটারগুলির আদর্শে স্টেজ তৈরী করে য়ুরোপীয় অভিনেতাদের অভিনয় শিখিয়ে, তাদের নাট্যরস-পিপাসা চরিতার্থ করতে সাহায্য করতেন।

এইসব শিল্পীদের অভিনয় এবং অভিনয়-শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণেই কোলকাতায় সখের থিয়েটারের সূত্রপাত হয়েছিল। একদিকে পাশ্চাত্য নাট্যাভিনয় রীতি অন্যদিকে দেশী যাত্রাভিনয়ের রীতির সমন্বয়ে, হয়ত তখনকার নাট্যাভিনয় রীতি এক বিমিশ্র রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু নাটকের স্বগত সংলাপ, পার্শ্ব উক্তি (aside) এবং পদ্যছন্দে সুদীর্ঘ সংলাপ রচনারীতি ইত্যাদি ছিল ইংরেজী নাট্য ধারার দান। এগুলো থেকেই এই অভিনয় ধারা কতকটা অনুমান্ করে নেওয়া যেতে পারে।

প্রত্যক্ষভাবে য়ুরোপীয় নাট্য-শিক্ষকদের অভিনয়-শিক্ষা দেবার পরবর্তীকালে আমরা পাই কয়েকজন বাঙালী পরিচালকের নাম, তাঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এবং বৈষ্ণবচরণ আঢ্য হলেন অন্যতম। কেশবচন্দ্রের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তাঁর মত বৈষ্ণবচরণ আঢ্যও ছিলেন পাশ্চাত্য নাট্য শিক্ষা-গুরুর সুযোগ্য শিষ্য। সমকালীন য়ুরোপীয় থিয়েটারের সঙ্গে বৈষ্ণবচরণ বেশ কিছুকাল সংযুক্তও ছিলেন। তাঁর অভিনীত 'ওথেলো' চরিত্র ছিল তখন শহরের এক প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু এই কেশবচন্দ্র এবং বৈষ্ণবচরণও যেহেতু ছিলেন পাশ্চাত্য নাট্য-গুরুর শিষ্য সেই হেতু, তাঁদের অভিনয়-শিক্ষাদান-পদ্ধতির মধ্যেও আরভিং বা গ্যারিক প্রমুখ নাট্য-পরিচালকদের প্রভাবই হয়ত দেখতে পাওয়া সম্ভব ছিল।

কিন্তু সে যাই হোক ধারাবাহিক ভাবে স্বদেশীয় নাট্য-পরিচালকদের

শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের সময় থেকেই পেতে পারি।

অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী ছিলেন বাস্তব ধারায় অভিনয় করার পক্ষপাতী। তিনি নিজে যেমন বাস্তব অভিনয় করতেন তেমনি তাঁর ছাত্রদেরও সেই ধারায় অভিনয় করতে উৎসাহিত করতেন। অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা প্রণালী ছিল অনুকরণের ওপর জোর দিয়ে। নাটকের চরিত্রগুলি তিনি নিজে অভিব্যক্তি সহযোগে অভিনয় করে অভিনেতাদের দেখিয়ে দিতেন, তারপর সেই অভিব্যক্তিগুলি তিনি অনুকরণ করতে বলতেন তাদের।

অপর পক্ষে তাঁরই সমসাময়িক এবং সহকর্মী নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলি পড়ে আমাদের মনে হয়, যে তিনি অভিনেতার স্বাধীন চিত্ত-বৃত্তি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। অভিনয়ের মহলা সুরু করবার আগে এক আলোচনা-চক্রে গিরিশচন্দ্র অভিনেতাদের সামনে নাটকের চরিত্রগুলি পাঠ করতেন এবং সেগুলির অভিব্যক্তি যেমন হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন, তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতেন। প্রয়োজন বোধে নিজেও যে করে দেখাতেন না তা নয়, কিন্তু নিজের ভাব ভঙ্গীর অনুকরণ করার ওপরেই তিনি জোর দিতেন না। এ ছাড়াও দেশ বিদেশের অভিনয়ের এবং অভিনেতার কাহিনী বর্ণনা করে, নাট্য-সাহিত্য পাঠ ও তার চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করে, অভিনেতাদের হৃদয়ে নাট্যবোধ জাগিয়ে তুলতে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। এ সম্পর্কে তৎকালীন যুগের অন্যতমা অভিনেত্রী বিনোদিনী তাঁর জীবন কথায় যা লিখেছেন, তা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বিনোদিনী বলেন,

> "গিরিশবাবু আমাকে পাট অভিনয়ের জন্য অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন।...তাহার পর অবসর মত আমাদের বাড়ীতে বসিয়া অমৃত মিত্র, অমৃত বোস, আরও অন্যান্য লোক মিলিয়া নানাবিধ বিলাতী কবি, সেক্সপীয়র, মিল্টন, বায়রণ, পোপ প্রভৃতির লেখা গল্পচ্ছলে শুনাইয়া দিতেন।"

এইভাবে দেশ বিদেশের সাহিত্য শিল্প এবং নাট্যকলার প্রতি সহকর্মী নট-নটিদের আগ্রহী করে শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীন কল্পনার অবাধ প্রসারে সাহায্য করতেন গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্রের পর আমাদের নাট্য পর্বের এক যুগের সমাপ্তি এবং নবপর্বের সূত্রপাত ঘটে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী হলেন, এই নবযুগের উদ্গাতা। নাট্য-প্রযোজনায় একক অভিনয়ের দুর্বারতাকে স্বীকার করলেও নাট্যাচার্য সাজ্ঘটিক অভিনয় রীতিকে অবহেলা করেন নি। 'সীতা' নাটকে যে প্রজাবৃন্দের (Crowd) দৃশ্য ছিল তাও সকলের ব্যক্তিগত অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল বলেই সমালোচকদের অভিমত। নট-পরিচালক অহীন্দ্র চৌধুরীও ভোলা মাষ্টার, সংগ্রাম ও শান্তি ইত্যাদি বহু বিভিন্ন নাট্য-প্রযোজনা ও পরিচালনার মাঝে একক ব্যক্তিত্বের সীমারেখা অতিক্রম করে সাজ্ঘটিক অভিনয়ের দিকে জোর দিয়েছিলেন। ইতি পূর্বে আমরা সে কথা উল্লেখ করেছি।

অতি আধুনিক পর্ব হলো নানা ভঙ্গীর পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগ। অভিনয় ধারায় এবং প্রযোজনার অঙ্গিকে আজ নানারকম পরীক্ষা সুরু হয়েছে, তাই সঠিক কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতির সন্ধান আজকের নাট্য-পরিচালনা-পদ্ধতি থেকে খুঁজে পাওয়া বোধ করি সম্ভব নয়।

তবে পরিচালনার যেটা মূলকথা, অর্থাৎ অভিনেতার স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত হতে না দিয়ে, তাঁদের শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব, তা আজকের পরিচালকরা স্বীকার করেন, এবং সেই মহৎ দায়িত্ব সামনে রেখেই তাঁরা নাট্য-পরিচালনা এবং প্রযোজনায় ব্রতী হয়েছেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

যদিও অনেক অপেশাদার সংস্থা আজও অভিনয় শিক্ষার ব্যাপারে নাম করা কোন কোন বড় বড় অভিনেতার অনুকরণ করাকেই চরম মুক্তির পথ বলে মনে করেন। এমন অনেক পরিচালক (?) আছেন যাঁরা এক ক্লাব থেকে আর এক ক্লাবে দৈনিক দুতিনটে করে বইয়ের পরিচালনা (?) করে ঘুরে বেড়ান। পরিচালনা বা অভিনয় শিক্ষা বলতে তাঁরা যে কী বোঝেন তা আমরা সঠিক ভাবে বলতে পারবো না, তবে চরিত্রের ভাব প্রকাশের ব্যাপারে যে তাঁরা

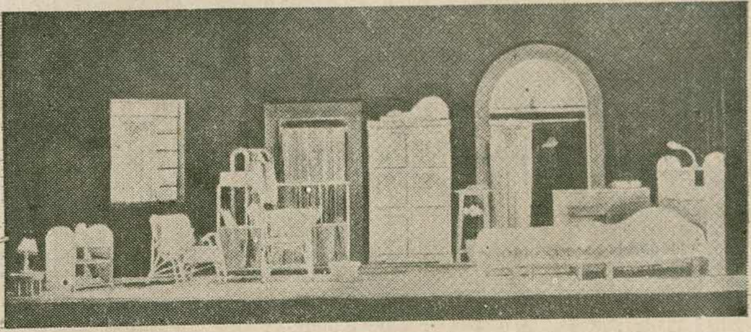
কতকগুলি সহজায়ত্ব বাঁধাধরা এবং গতানুগতিক ছক আবিষ্কার করে নিয়েছেন, তা কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি। যেমন 'এ্যারিষ্টোক্রাট' সাজতে গেলে অমুক অভিনেতার মত বাঁ কাঁধ হেলিয়ে একটু থেমে থেমে দম নিয়ে নিয়ে কথা বলতে হবে, কিম্বা সাহেব সাজতে হলে ত কে'ট্' আর'ট' কে'ঠ' বলে উচ্চারণ করতে হবে, চোর ডাকাত গুণ্ডা সাজতে গেলে পাৎলুন পাঞ্জাবীর ওপর গলায় বুটিদার রুমাল বেঁধে "স" কারান্ত কথা বলতে হবে ইত্যাদি। এই ধরনের অভিনয় শিক্ষারীতি সম্পর্কে এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী বলি। বহুদিন আগে কোন এক সখের দলের 'সাজাহান' নাটকের মহলায় উপস্থিত ছিলাম। সেই নাটকটি পরিচালনা করছিলেন কোন এক বিখ্যাত ভ্রাম্যমান পরিচালক। যাঁরা অভিনয় করছিলেন তাঁদের চলন বলন, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি দেখে মনে হচ্ছিল যেন পেশাদার মঞ্চ থেকে অহীন্দ্র চৌধুরী, সরযুবালা, শিশির কুমার ভাদুড়ী অকস্মাৎ সেই রিহার্সাল রুমে অবতীর্ণ হয়েছেন।

মহলা তো চলছে, এবং পরিচালক অক্লান্ত পরিশ্রমে জাহানারাকে সরযুবালা হতে শিক্ষাদান করছেন। এমন সময় এলো সাজাহানের পালা। পরিচালক মশাই গুরু গম্ভীর-স্বরে সাজাহানকে বললেন পার্ট বলার কথা। 'সাজাহান' বেচারা অনেক ভেবেচিন্তে পার্টটি নিজের মতো করে এনেছিল ; মহা-উৎসাহে সে মহলা দিতে স্বরু করলো। মনে মনে ধারণা, গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হয়ে, তার এই নতুন কিছু-করার চেষ্টায় হয়ত পরিচালক মশাই আনন্দিত হবেন। কিন্তু তাকিয়ে দেখা গেল যে পরিচালকের গুরু-গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেছে, তিনি চুপ করে বসে আছেন, তার দিকে তাকিয়ে। অবশেষে যখন সাজাহানের সেই বিখ্যাত সংলাপ "তবে আয় মা ইত্যাদি" এলো এবং ছেলেটি, পরিচালক মশাইয়ের নীরবতা, তার অভিনয় প্রচেষ্টার প্রতি নীরব সমর্থন মনে করে মহা-উৎসাহে সংলাপ বলা স্বরু করলো, তখন আর তিনি অবরুদ্ধ ক্রোধকে চেপে রাখতে পারলেন না, বারুদের মত ফেটে পড়ে বললেন, বলি কি হচ্ছে কি? সমস্ত mood-টাই মাটি। 'তবে আয় মা' বলে এই ভাবে লাফিয়ে ওঠো, তার



বিনোদিনী

বহুরূপীর 'পুতুলখেলা'
নাটকের মঞ্চ সজ্জা





অশনিচক্র অভিনীত 'তরঙ্গ' নাটকের একটি দৃশ্য



'বিশে জুন' নাটকে শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়



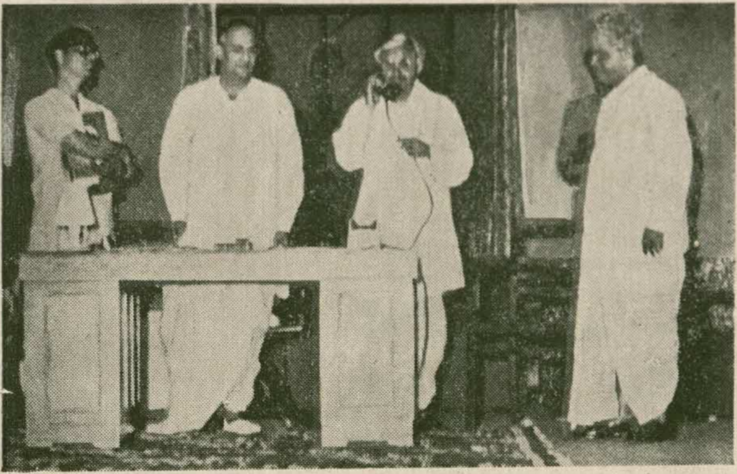
রূপকার প্রযোজিত 'ছেঁড়াতার' নাটকে কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী, নির্মল চ্যাটার্জী, সবিতাব্রত দত্ত ও শিবনাথ মুখোপাধ্যায়।



ক্যালকাটা থিয়েটার প্রযোজিত 'ছায়াপথ' নাটকে বিভূতি মুখোপাধ্যায় ও বিধু মুখোপাধ্যায়।



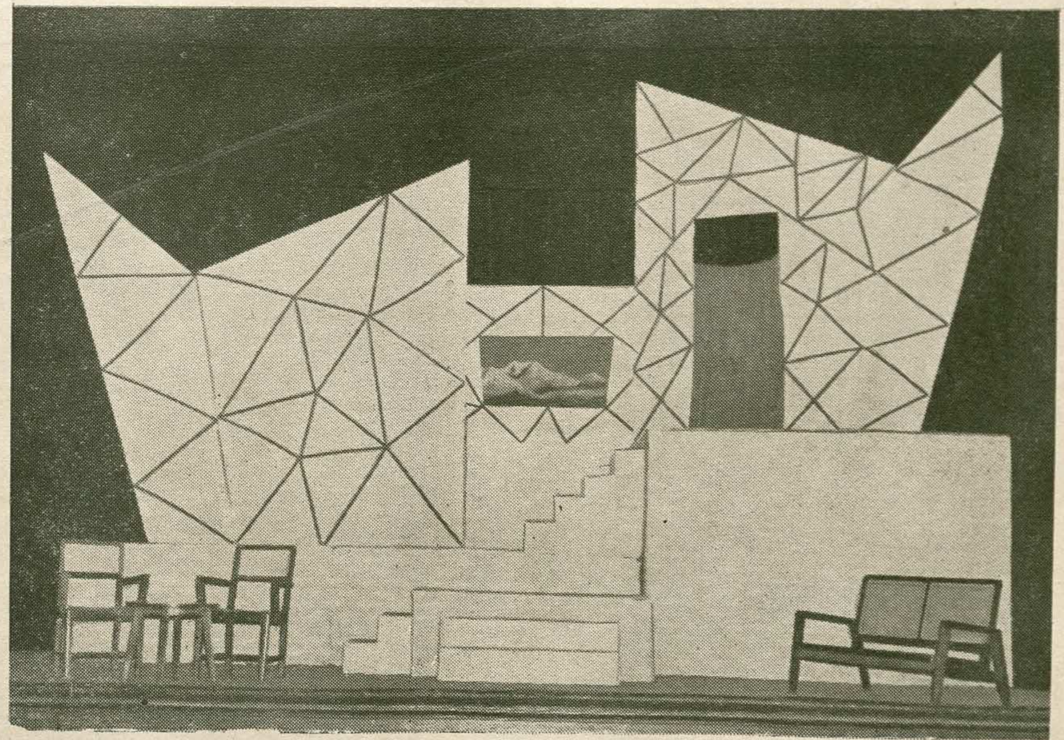
গন্ধর্বের 'সূর্যের মত সমুদ্র' নাটকের একটি দৃশ্য



অনুশীলন প্রযোজিত 'শেষ সংবাদ' নাটকে চারুপ্রকাশ ঘোষ, মমতাজ আমেদ,
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়



'চাঁদেরহাট' নাটকে আদিৎ কুণ্ডু, উমা দাশগুপ্তা, চিনু গোস্বামী, মীরা মল্লিক সোমেন নন্দী
ইন্দু চট্টোপাধ্যায়, আরতি রায়, রমেন লাহিড়ী ও মিনতি গুপ্তা



দশরূপক প্রযোজিত 'উর্বশী নিরুদ্দেশ' নাটকের মঞ্চসজ্জা।



'তিতাস একটি নদীর নাম' নাটকে বিজন ভট্টাচার্য, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলিমা দাস



'নবান্ন'র রাধিকার রূপসজ্জায় শোভা সেন



মুখোশ প্রযোজিত 'আর হবেনা দেরী' নাটকে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ রায়, পরিমল সেন, দীপান্বিতা রায় ও পিল্লু নিয়োগী



শৌভনিক প্রযোজিত 'তাসের দেশ' নাটকে নিবেদিতা দাস, নিমু ভৌমিক, গোপাল সন্যাসি, সুধাংশু মণ্ডল, চিনু দাস, শ্রীকুমার বিশ্বাস, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ দাস ও মৃত্যুঞ্জয় আঢ্য

পর যখন 'সূর্য' বলবে তখন ডান হাতটা এমন করবে যেন মনে হবে সূর্যকে বাঁ-বগলে চেপে ধরেছ "...ইত্যাদি। এইভাবে ডিরেকশান (?) দিয়ে এবং পেশাদার মঞ্চের সাজাহান বারম্বার দেখার আদেশ দিয়ে তিনি সেদিনের মতো বিদায় গ্রহণ করলেন।

এই হলো ছকের নমুনা। যুগ ও জীবনকে অস্বীকার করে, আধুনিক মনের সমস্যাকে না জেনে, তার প্রকাশ রীতির যথাযথ অনুশীলন না করে অথবা সে বিষয়ে সচেতন না হয়ে, এই গতানুগতিক অভিনয় ধারা আর যাই করুক 'নাট্য-আন্দোলন' করবেনা এ কথা ঠিক।

আজকের পরিচালককে সচেতন হতে হবে যুগ ও জীবনের পরিবেশের সম্পর্কে। বিগত কালের রীতি-নীতির সঙ্গে আজকের রীতি-নীতির প্রকাশ ভঙ্গীমার তফাৎটি তাঁকে বুঝতে হবে। মনে রাখতে হবে আজকের ছেলে তার বাবার সঙ্গে যে ভাবে, যে ভাষায় কথা বলে, তার বাবা, কখনই সেই ভাবে, সেই ভাষায় তাঁর বাবার সঙ্গে কথা বলতেন না। আজকের জীবনের জটিলতা যেমন বিচিত্র, তার প্রকাশ ভঙ্গীও তেমনি বিচিত্রতর। আর যুগ ও জীবনকে প্রতিফলন করাই যদি অভিনেতার ধর্ম হয়, তবে তাঁকে সেই ধর্মে দীক্ষিত করার দায়িত্ব হলো পরিচালকের। এই কথাটি মনে রেখেই নাট্য পরিচালকের কর্মে ব্রতী হওয়া বিধেয়।

ছয়

উপসংহার

আজকের যুগে যখন আমরা নবনাট্য আন্দোলনের ধারায় বিশ্বাসী, যখন আমরা মনে করি যে, রঙ্গমঞ্চ হলো জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান, এবং যখন সরকারী ভাবে রঙ্গমঞ্চের উন্নতি-কল্পে নানা ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা সুরু হয়েছে, তখন কেবল মাত্র সখের খাতিরে, বা অভিনয় করার আনন্দেই আজ আর অভিনয় আমরা করবো না।

নাটক করতে গেলে পরিচালক রাখতে হবে বলেই প্রথাগত ভাবে পরিচালক নিয়োগ করা নয়, নাট্য-বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিগত হয়ে, যুগ ও জীবন সম্পর্কে সুস্থ এবং বলিষ্ঠ বিশ্বাস নিয়ে জাতিগত উন্নতির কারণেই আজ আমাদের নাট্য-সাধনায় আত্মনিয়োজিত করতে হবে। এ কেবল নিজের অথবা মুষ্টিমেয় কয়েক জনের আমোদ আহ্লাদের স্থান নয়, জাতীয় ঐতিহ্য কৃষ্টি-সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হয়েই আজ নাট্য-সংস্থাগুলো গড়ে ওঠার অভিলাষী। আর বলা বাহুল্য সেই অভিলাষ সার্থক করে তুলতে গেলে চাই উপযুক্ত শিক্ষা এবং সাধনা, চাই ধৈর্য, তিতিক্ষা এবং অধ্যবসায়। মাষ্টারী করা নয়, নটরাজের বেদীতলে আমরা সবাই ছাত্র, সবাই পূজারী এই কথাটাই আজ বড় করে মনে করবার দিন এসেছে।

নাট্য শিক্ষার ক্লাস নিতে গিয়ে সুবিখ্যাত শিল্পী Vakhtangov তাঁর ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

> "Think everything over: Your abilities, your temperament, your willingness to devote all your spare time to the theatre. And if you decide against it, strike your name off the list."

আগামী কালের অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজকদের আমরা এই বাণীটি স্মরণ করতে বলি। উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে স্থির-সংকল্পে না এসে, এবং নাট্যকলা সম্পর্কে আন্তরিক শ্রদ্ধা না রেখে, যদি সখের খাতিরে অভিনয় করার স্পৃহা বলবতী হয়ে দেখা দেয়, তাহলে আবার অলীক কু-নাট্য রঙ্গে, রাঢ়বঙ্গের তাবৎ মানুষ মজে যাবে। যেমন ঘটেছিল মাইকেল মধুসূদনের পূর্ববর্ত্তী কালে। নাট্যসাধনার ক্ষেত্রে তেমন পরিণতি যেন আমরা কোন দিনই না আনি।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট (ক)

বিবিধ প্রসঙ্গ

এক

দর্শক ও প্রযোজক

নাটক অভিনয়, প্রযোজনা এবং পরিচালনার আলোচনায় দর্শক শ্রেণীর প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে, কেননা নাট্যাভিনয়ের সমগ্র পর্বটিই দর্শক মণ্ডলীর উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত। নাট্যকার যে নাটক রচনা করেন, তা যেমন তাঁর নিজস্ব খেয়ালখুশী চরিতার্থ করবার জন্য নয়, তেমনি যে প্রযোজক সেই নাটকের প্রযোজনা করেন, তাও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিকর্তার আনন্দের ব্যাপারটা অবশ্যই আছে, কিন্তু সে আনন্দটা জন-মানসকে উদ্দীপ্ত করে, তাদের জীবনধারাকে সুস্থ সুন্দর করে গড়ে তোলার আনন্দ। তাবৎ জনমানসকে বাদ দিয়ে বা অবহেলা করে ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য সাহিত্য রচনার চিন্তা আজ ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে। সুতরাং সাহিত্যের আনন্দের ভোজে নিমন্ত্রিত জনগণের স্থান নিতান্ত অবহেলার যোগ্য নয়। তাই নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকার, প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা সকলেই জনতার দিকে তাকিয়ে তাঁদের শিল্প-সৃষ্টির রসোত্তরণের কথা ভাবেন। সুতরাং জনতার প্রতি, তাদের সংস্কার বিশ্বাসের প্রতি নাট্যাচার্যদের যেমন দায়দায়িত্ব আছে, তেমনি সামগ্রীক ভাবে নাট্যকলার প্রতি দর্শক সাধারণেরও যথেষ্ট দায়দায়িত্ব বর্তমান, এবং এক হিসেবে যে তারা সমগ্র নাট্য-প্রযোজনার নিয়ামক শক্তি, একথাও অস্বীকার করা যায় না।

এককথায় আমরা বলতে পারি যে, নাটকের সমস্ত ব্যাপারটাই হলো দর্শক কেন্দ্রিক এবং এই দর্শক না হলে নাটকের সাহিত্য তথা অভিনয়-মূল্য

কোনটাই যথাযথ ভাবে স্থিরীকৃত হওয়া সম্ভব নয়। প্রাচীন কালে আমাদের নাট্য-শাস্ত্রকার নাট্যাভিনয়ে এই দর্শকের ওপর জোর দিয়েছেন সবচেয়ে বেশী, এবং এই দর্শকের শ্রেণীবিচারে তাকে সহৃদয় বলে বিশেষিত করেছেন। নাট্যশাস্ত্রকারের মতে একমাত্র সহৃদয় সামাজিক অর্থাৎ দর্শকেরই নাট্যাভিনয় দেখার অধিকার আছে, আর এই সহৃদয় শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি রসতত্ত্বে সুবিজ্ঞ অর্থাৎ কিনা পারদর্শী দর্শককেই বুঝিয়েছেন। অরসিককে রস নিবেদনের মত বিড়ম্বনা আর নেই, কেননা অরসিকের মনে রসের যথার্থ সৌন্দর্য প্রতিভাত হওয়া সম্ভব নয়। নাট্যশাস্ত্রকারের মতে রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রসিক ব্যক্তিকেই সহৃদয় বলা যায়, আর নাট্যাচার্যের উদ্দেশ্য হলো নাট্যরসকে এই সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য করে তোলা।

তখনকার দিনে নাট্যাভিনয় সীমাবদ্ধ ছিল রাজসভার মণ্ডপে। রাজা এবং তাঁর পাত্র-মিত্র-সভাসদ ব্যতীত তাবৎ সাধারণ মানুষ নাট্য-কলা দর্শনের অধিকারী ছিল না। আর রাজতন্ত্রের অমিত-বিক্রমের যুগে রাজা এবং তাঁর অনুগ্রহ-ভাজন ব্যক্তিরা যে সহৃদয় হবেনই একথা বলা বাহুল্য। সুতরাং তখন রসিক অরসিকের বিচারে খুব বেশী একটা সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি।

কিন্তু যুগ গেছে বদলে। আজকের নাট্যাভিনয় রাজসভার জলসাঘরের উৎসব রাত্রির সীমানার বাইরে, অপামর জনসাধারণের আনন্দ উৎসবের সভামণ্ডপে এসে হাজির হয়েছে, এখন আর বিশিষ্টতার দোহাই দিয়ে নাটমঞ্চ-কে কতিপয়ের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। নটগুরু গিরিশচন্দ্র নাটমঞ্চের এই সাধারণীকরণের পক্ষপাতিত্ব প্রথমটায় করতে পারেন নি, তাই ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন।

"স্থান মাহাত্ম্যে হাড়ী শুঁড়ী
পয়সা দে দেখে বাহার,"

কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যতই হোক, আজ আর বিশিষ্টতার দোহাই দিয়ে হাড়ী শুঁড়িদের নাটমঞ্চের দরজা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না; আজকের প্রযোজককে সকলের দিকে তাকিয়ে নাট্য-প্রযোজনা করতে হয়; সুতরাং সমস্যা কঠিন।

তাবৎ মানুষের রুচি এবং মর্জি একরকম নয়। কেন না ভাল লাগা আর মন্দ লাগা ব্যাপারটা হলো আপেক্ষিক ; মানুষের মেজাজ এবং মর্জির বৈচিত্র্য অনুসারেই তার তারতম্য ঘটে। যদিও দৈনন্দিন জীবনের বৃহত্তর পটভূমিকায় এই রুচি বৈচিত্র্য পারস্পরিক জীবনছন্দে খুব একটা ছন্দ পতনের কারণ ঘটায় না, কিন্তু মুশকিলটা হয় সমষ্টির মিলন-বাসরে। সেখানে সামান্যতম বিভিন্নতা পারস্পরিক সম্পর্কের মর্মমূলে দোলা জাগায়। সৃষ্টি হয় নানা ধরনের সংঘাতের।

নাটমঞ্চে ঘটে বিভিন্ন রুচি, তথা মেজাজ এবং মর্জির মানুষের সংহত সমাবেশ। আর প্রযোজককে পরিতুষ্ট করতে হয় সকলকে ; কেননা তাঁর উদ্দেশ্য হলো তাবৎ মানুষের আনন্দ উপকরণ সাজিয়ে তোলা। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা কতিপয় মানুষের সমষ্টির জন্য তিনি তাঁর শিল্প-সম্ভার পরিবেশন করেন না। তাই মানুষের মেজাজ, এবং মর্জি যতই ভিন্নতর হোক না কেন, সকলকেই খুশী করবার একটা অলিখিত নীতি-নিয়ম তাঁর থেকেই যায়। কিন্তু বলা-বাহুল্য যে, ব্যাপারটা সহজ নয়। তাই একাজ করতে গিয়ে নাট্য প্রযোজককে সম্মুখীন হতে হয় জটিল থেকে জটিলতর নানা সমস্যার। আর এই সমস্যার ঊর্ণনাভে বিজড়িত হয়ে প্রযোজকদের মধ্যে নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে দেখতে পাই। সেগুলো অধিকাংশক্ষেত্রেই নাট্যশিল্পকে, হয় ব্যক্তিগত খেয়াল খুশীর উপকরণ অথবা শিল্প-নিরপেক্ষ, নিছক ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কুক্ষিগত করে তোলে। আর এই ঘূর্ণীচক্রে পড়ে তাবৎ জনমানস হয় বিভ্রান্ত। শিল্পবোধ দূরে থাক, শিল্প-সচেতনতাই তারা হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ। প্রযোজকদের মধ্যে এই দর্শক সমস্যা কেন্দ্র করে যেসব মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে ; আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সেগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করে নিতে পারি।

ক। কেবলমাত্র নিজের আনন্দের জন্য নাটক করা।

খ। বিশেষ কতকগুলি দর্শকের জন্য নাটক করা,

গ। এবং জনসাধারণের রুচির অনুমোদনের জন্য নাটক করা।

প্রথমে যে সব প্রযোজক তাবৎ জনরুচিকে উপেক্ষা করে, কেবলমাত্র

নিজেদের বোধ বুদ্ধির ওপরেই নির্ভর করার পক্ষপাতী, তাঁদের কথাই ধরা যাক। এই ধরনের প্রযোজকদের কথা হলো, জীবনকে আমি যে ভাবে দেখেছি, এবং বুঝেছি, সেই ভাবেই আমি তাকে মঞ্চে রূপায়িত করবো, তা যদি তোমার ভাল লাগে, তাহলে আমি আনন্দিত হবো, আর খারাপ লাগলে দুঃখিত হবো না, বা তার জন্য কোন প্রতিবাদ করবো না। আমার নাটমঞ্চের দরজা খোলাই আছে; ইচ্ছা হলে সেখান দিয়ে প্রবেশ করতে যেমন বাধা নেই, ভাল না লাগলে সেখান দিয়ে বেরিয়ে না যাবার পক্ষেও তেমন কোন বাধা-বাধকতা নিশ্চয় নেই। এ ধরনের চিন্তা নিঃসন্দেহে সু-গভীর আত্ম-প্রত্যয় সঞ্জাত। এবং এই সুদৃঢ় প্রত্যয়ের ফলে নাট্য-সাধনারক্ষেত্রে নানা ধরণের আঙ্গিক চর্চারও অবাধ অবকাশ আছে। কিন্তু কেবলমাত্র নিজস্ববোধের ওপর নির্ভর করে আজকের জটিল জীবনাবর্ত চক্রমন সহজ সাধ্য নয়। সহযোগিতা এবং সংযুক্তিই হলো আজকের শিল্প দৃষ্টির মূলকথা। সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ে সহিতত্বের যুক্তিকে যদি স্বীকার করে নেওয়া যায়, তাহলে মানতেই হয় যে, এই ধরনের চিন্তায় সেই সহিতত্বের যুক্তি স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাহত হয়ে পড়ে। যার ফলে নাট্য-প্রযোজক জনসাধারণ থেকে ক্রমশই দূরে সরে যেতে পারেন, এবং নাটকের মাধ্যমে তাবৎ মানুষের মধ্যে জীবন চেতনা জাগ্রত করার মহৎ দায়িত্বের পথ থেকে তিনি ধীরে ধীরে বিচ্যুত হয়ে পড়তে পারেন। আত্মপ্রত্যয় ভালো, কিন্তু সেই আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে যদি সহযোগিতার কামনা থাকে, তাহলে তা শিল্প-সৃষ্টির ক্রমবিকাশকে ফলে ফুলে সঞ্জীবীত হতেই সাহায্য করে।

দ্বিতীয়ত জনসাধারণকে উপেক্ষা করে, কেবলমাত্র নিজের বোধ ও বুদ্ধির ওপর নির্ভর করলে পথ চলতে অহংবোধের দ্বারা ক্রমশই আচ্ছন্ন হয়ে পড়া স্বাভাবিক। আর এই মোহ-গ্রস্থ অবস্থায় তিনি যা করবেন সাধারণের চোখে তা ক্রমশই দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে পারে। শিল্পের ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতাকে কোন কোন মহল আজ মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী হলেও, দুর্বোধ্যতাই যে শিল্প নয়, একথা একশোবার সত্য।

মনে করা যাক কোন একটি নাটক পরিচালনার সময় একজন প্রযোজক

দেখলেন যে, তার মধ্যে জনতার একটি দৃশ্য রয়েছে, যে দৃশ্যে নাট্যকার বলতে চেয়েছেন যে, জনতার স্বকীয় কোন চিন্তাধারা নেই, তারা বিশেষ কোন আবেগ বা impulse-এর প্রেরণাতেই পরিচালিত হয়। নিজের মাথা দিয়ে ভেবে চিন্তে জন-মিছিল কোন কাজ করে না।

নাট্যকারের এই উদ্দেশ্যটিকে মঞ্চে রূপায়িত করতে গিয়ে দেখা গেল প্রযোজক মিছিল দৃশ্যে সমস্ত অভিনেতাদের শিকল্ করে অর্থাৎ মাথা-নীচের দিকে আর পা ওপরের দিকে করিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। যবনিকা অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের ওপর সোজা হয়ে থাকা নানা ভঙ্গীর পায়ের অরণ্যের ওপর দিয়ে আলোক প্রবাহ ঢেউখেলে গিয়ে আমাদের একটা মিছিলের কথা বুঝিয়ে দিল। পায়ের মাধ্যমে এইভাবে মাথাকে ব্যবহার করে প্রযোজক হয়ত মনে করলেন যে মস্তিষ্কহীন জনমিছিলকে তিনি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুটিত করেছেন; অথবা অভিনেতাদের জিমন্যাষ্টিক না করিয়ে তিনি সকলের মুখে হাতীর মুখোশ এঁটে তাদের গণেশ বানিয়ে দিলেন; মানুষের মাথায় হস্তী মুণ্ড বুদ্ধিহীনতার প্রতীক। কিন্তু এই সব প্রতীক ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে যোগ সম্পর্ক বিহীন হলে, তাদের কাছে তা উদ্ভট কল্পনা বলেই প্রতিভাত হবে। অহংবাদী বা egoistic পরিচালক বলতে পারেন, আমার বোধের জন্যই আমি করেছি, তোমাদের ভাল লাগানর দায়িত্ব আমার নেই। বলা-বাহুল্য নাটককে তাবৎ মানুষের চেতনা সঞ্চারী যৌথশিল্প বলে মেনে নিলে আমাদের বলতেই হয় যে, কথাটা ফাঁকা কথা। গতানুগতিক রূপ-রীতিকে অতিক্রম করে নব্য-রীতির আশ্রয়ে নিজেকে ক্রমবিকশিত করাই হলো, শিল্পের ধর্ম; কিন্তু সেই নব্য-পন্থা আসে দেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের পথ ধরেই। তা না হয়ে কেবলমাত্র রীতিকে উপেক্ষা করায় খাতিরেই উপেক্ষা করাটা সমুচিত বলে আমাদের মনে হয় না।

দ্বিতীয় ধরনের পরিচালকেরা বিশেষ শ্রেণীর দর্শক মনোরঞ্জনের পক্ষপাতী। কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির রুচির চাহিদা মেটাতে পারলেই তাঁরা নিজেদের সার্থক বলে মনে করেন। কিন্তু তাতে করেও সমগ্র নাট্য

প্রযোজনা ব্যাপকতর আকার ধারণ করতে পারে না। কতিপয় বিশিষ্ট জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে তার আসল উদ্দেশ্য থেকে ব্যাহত হয়।

তৃতীয় চেতনা হলো আরো সাংঘাতিক। ব্যাপকভাবে কেবলমাত্র জনরুচির প্রশ্রয় দিতে গিয়ে, নাট্যকলাকে পণ্যস্ত্রীর ব্যবহারিক মূল্যের পর্যায়ে কোন কোন প্রযোজক নামিয়ে আনেন। উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত পঞ্চরঙ, বা প্র-পরা-অপ-সং-হৃসন, জাতীয় রচনাগুলি এই প্রচেষ্টার সকরুণ পরিণতি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে, এ সমস্যার নিরাকরণের পথ কোথায়? নাটক ব্যবসায়িক-বুদ্ধির-দ্বারা পরিচালিত হবে, না ব্যক্তিবিশেষের, বা কতিপয় সমষ্টির জীবনবোধ, তাদের মেজাজ এবং মর্জির মুখাপেক্ষী থাকবে, না তাবৎ জনমানসের আনন্দ এবং শিক্ষার বাহন হয়ে উঠবে; কোনটা এর সত্যকারের পথ। কোন পথে, এবং কোন উপায়ে চললে নাট্যকলার মানস মুক্তি সম্ভব? প্রশ্নগুলির সমাধান সহজসাধ্য নয়, কেননা পদে পদে নানান মতবাদের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা, তৎসত্ত্বেও আমাদের সাধ্যমত এ বিষয়ে কিছু কিঞ্চিৎ আলোচনা করার চেষ্টা আমরা করবো।

দুই

নাটমঞ্চ ও দর্শক

নাট্যশালার সঙ্গে দর্শকের সম্পর্ক দ্বিবিধ। প্রথমত তাঁদের জাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত, কেননা নাটমঞ্চে তাঁরা কেবল আমোদ উপভোগের জন্য আসেন না, নিজেদের রুচি ও চিত্তবৃত্তির পরিশোধন করতেও আসেন। তাই নাট্যপ্রযোজক তাঁদের কাছে যা কিছু পরিবেশন করেন, সে সব নির্বিচারে গলাধঃকরণ করা তাঁদের উচিত নয়। দ্বিতীয়ত তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, তাবৎ দর্শক সাধারণ নাট্যব্যবসায়ীর ক্রিড়নক মাত্র নন, তাঁদের প্রতিও দর্শকের একটা দাবী আছে, আর সেই দাবীর প্রতি নাট্য কর্তাদের সচেতন রাখার দায়-দায়িত্ব দর্শক সাধারণের।

সহৃদয় দর্শক বলতে আমরা সচেতন দর্শকই বুঝি। কিন্তু দুঃখের কারণটা হলো এই যে, নাট্যকলার প্রাগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে এই সচেতন দর্শকের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধিত হয় নি।

প্রায় ক্ষেত্রেই নাটক দেখার প্রসঙ্গে নানা ধরনের কথা আমরা শুনতে পাই। অনেকে বলে থাকেন নাটকের মধ্যে আবার শিক্ষা-টিক্ষার ব্যাপার কেন? দুদণ্ড আমোদ লাভ করতে পারলেই তো হলো। একটু নাচ গান, মধ্যবিত্ত জীবন সুলভ একটু বিরহ কি প্রেমের সুড়সুড়ি থাকলেই হলো। সারাদিন খেটেখুটে আবার চোখের জল ফেলতে নাটমঞ্চে যেতে হবে নাকি? বলা বাহুল্য কথাগুলি যুগচেতনার বিরোধী,জীবনে যেখানে সুখদুঃখ পাশাপাশি বর্তমান সেখানে নাটমঞ্চে কেবল আনন্দের উপকরণ আশা করা আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। দর্শক সাধারণকে এই আত্মপ্রবঞ্চনার হাত থেকে রেহাই দেবার দায়িত্ব হলো নাট্য-প্রযোজকের। কিন্তু দর্শকের দায়িত্বও হলো সেই বলিষ্ঠ জীবন-বোধ তাঁর কাছ থেকে আদায় করবার। এর জন্য সচেতনতার প্রয়োজন।

যুগ ও জীবন সম্পর্কে সচেতন থেকে প্রযোজনা ও অভিনয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা যেমন আজকের প্রযোজক ও অভিনেতার সদাসর্বদা স্মরণ থাকা উচিত, ঠিক তেমনি সেই সব অভিনয় যাঁরা দেখতে যাবেন, তাঁদেরও সে বিষয়ে সমপরিমাণে সচেতন থাকা কর্ত্তব্য। নৈলে দু'য়ের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। দর্শকের অচেতনতা বা অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েই নাটমঞ্চ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। কুরুচির প্রশ্রয়ে জাতীয় সংস্কৃতির সামগ্রীক চালচিত্রটি পর্যুদস্ত হয়।

সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকাই হলো সচেতন দর্শকের অন্যতম উদ্দেশ্য। ঠিক তেমনি এ বিষয়ে যাঁরা অচেতন, বা অপারক, তাঁদের মধ্যে সেই ঘনিষ্ঠতা জাগ্রত করার উৎসাহ প্রদানের আন্দোলনও তাঁদের কর্ত্তব্যকর্মের অন্যতম।

ব্যাপকভাবে নাট্যপাঠ, এবং নাট্যাভিনয় দর্শনের আন্দোলন গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজকদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার ইচ্ছাটিও জাগিয়ে তুলতে হবে। তাঁরা যা দেবেন, চোখ বুঁজে তাই গলাধঃকরণ নয়, যদি

তাঁরা ব্যবসায়িক খাতিরে কুরুচির প্রশয় দিয়ে অর্থোপার্জনে মন দেন, তাহলে সেবিষয়ে তাঁদের সচেতন করে, সুস্থ সবল বলিষ্ঠ নাটক পরিবেশনার দাবিও আনতে হবে। জনতার দাবীকে প্রযোজক কখনই অস্বীকার করতে পারেন না। তবে মনে রাখতে হবে যে, সে দাবী যেন ব্যক্তিগত রুচি, বা খেয়ালখুশির অনুগামী না হয়, জাতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ধারানুসারী হয়ে সেই দাবী নাট্যকলাকে ব্যবসায় বা রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যেন নিবারিত করে।

দর্শকের সচেতনতা তাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন। নাটমঞ্চকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা একমাত্র দর্শকেরই আছে। এই সচেতনতা আসে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধরেই।

পঠন পাঠন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার প্রতি সচেতনতা না থাকলে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি অন্তরের আকর্ষণ জাগা সম্ভব নয়। স্বাদেশিকতা ব্যাপারটা আবেগাত্মক নয় শুধু, বুদ্ধিগতও বটে। যে দেশে জন্মেছি, সেই দেশকে সর্বোতভাবে জানার মধ্য দিয়েই অন্তরে দেশপ্রেমের সঞ্চার হয়। তাই দেশপ্রেমের প্রাথমিক অঙ্কুর-উদ্গম পরস্পরের প্রতি ভালবাসা এবং অপরের প্রতি দায়িত্ব বোধের চেতনা থেকেই সম্ভব। বলা বাহুল্য রুগীর ওষুধ এবং শিশুর খাদ্যেও যেখানে ভেজাল দেখা যায়, সেখানে এই দায়িত্ববোধের চেতনাটি যে কতখানি প্রখর, তা সহজেই বোধগম্য। আমাদের স্বাদেশিকতা সংস্কৃতি নিরপেক্ষ রাজনৈতিক তর্কযুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশী বিদেশী নানা ইজমের আজ উপাসনা করে মনে করছি স্বাদেশিকতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখানো হলো। অথচ শিক্ষার মান ক্রমশঃই নিম্ন থেকে নিম্নতর পর্যায়ে অবসিত; কৃষ্টি ও সংস্কৃতিচর্চা এসে ঠেকেছে সিনেমা-পাতার বিজ্ঞাপনে। অথচ আমরা প্রত্যেকেই যে জ্ঞানীগুণী, এবং সুতীক্ষ্ণ সমালোচক এ ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল। এই অহংবোধই হল সকল সর্বনাশের মূলাধার, যতদিন না এই অসহায় আত্মরতির শেষ হবে, ততদিন শিল্প-সংস্কৃতির উত্তরণ সম্ভব হবে কেমন করে।

শিক্ষা নিরপেক্ষ অন্ধ আবেগের দুর্নীবার মোহে যতদিন আমরা ছুটে

চলবো, ততদিন সংস্কৃতির অবক্ষয় সহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় আমাদের নেই। জীবনের অন্যান্য উপকরণের কথা বাদ দিয়েও কেবল সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রের আলোচনার দিকে তাকিয়েও দেখতে পাই যে, সেখানেও চলেছে অবিমিশ্র ব্যবসা। আধুনিক কালের সিনেমা-থিয়েটারের দিকে তাকালেই বোধকরি কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই ব্যবসা, যতদিন বক্স-অফিসের কাঠের কৌটো ভর্তি থাকবে, ততদিন বন্ধ হবে না ; আর সেই কাঠের কৌটো ভর্তি করে চলেছি আমরা দিনের পর দিন।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজকের জনতার দাবী তাই নিছক আমোদ আহ্লাদের উপকরণ যোগান নয়, বা পলিটিক্যাল মতামতের কচকচি নয়, আমাদের যুগ ও জীবন সচেতন করে তুলে দেশের সামগ্রীক অগ্রগতিকে সম্প্রসারিত করে, সমগ্র জনসমাজ স্নেহ, প্রেম, শান্তি, মৈত্রীর বন্ধনে সংহত করে তোলা।

বলা বাহুল্য এই সচেতন দাবী জানাবার জন্য চাই শিক্ষাগত সচেতনতা। কেননা "কালচার" আর "রিক্রিয়েশনের" পার্থক্য শিক্ষাগত সচেতনতা ছাড়া বোধগম্য হবার কথা নয়। আজকের নাটমঞ্চ তাই শুধু নাটকই করে না, জনতাকে সচেতন করে তোলার জন্য নাট্য পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাও করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশ্বরূপা নাটমঞ্চের নাট্যপাঠাগারের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। আমাদের জাতীয় সরকারের লোক-সংস্কৃতি শাখার কথাও উল্লেখযোগ্য।

তিন

নাটমঞ্চ ও সমালোচক

নাটমঞ্চকে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির হাত থেকে মুক্ত করে জাতীয় কল্যাণ কামনায় তাকে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে সমালোচকের ভূমিকা যৎসামান্য নয়। সচেতন সমালোচক ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথা না ভেবে, আপনার সুচিন্তিত মতামত জাতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যেই ব্যক্ত করে থাকেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ধরনের সমালোচক আমাদের দেশে মুষ্টিমেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচনা ব্যাপারটা কেবলমাত্র সংবাদ-পরিবেশনার পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। সকলের প্রচেষ্টার ওপরেই সমালোচকের দাক্ষিণ্য এবং

বদান্যতা সমান। বিশ্ববিধাতা যেমন তাবৎ সংসার সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে, সকলের প্রতিই সমান কারুণ্য বিতরণ করে থাকেন, সমালোচকও তেমনি একটা সকরুণ মনোভাব নিয়ে কৃপা বিলিয়ে বেড়ান অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবং এই কৃপা বিতরণের স্পৃহা মাঝে মাঝে এমন চরম আকার ধারণ করে যে, নাটক অথবা নাট্যাভিনয়ের সমালোচনা অনেক সময় প্রযোজক পরিচালকরা স্বয়ং লিখে দিয়ে থাকেন। এতখানি দায়িত্বহীনতা আজকের যুগে সুনিশ্চিতভাবেই কাম্য নয়।

সমালোচকদের এ হেন ব্যবহারের মনস্তত্বগত কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন,

> "অন্যান্য দেশে যথায় রঙ্গভূমি উন্নতিলাভ করিয়াছে, সে উন্নতি অনেকটা সমালোচকের সাহায্যে। সকল দেশেই অভিনয় কার্য শিক্ষা করিতে হইতেছে। প্রায়ই অশিক্ষিত ব্যক্তিরা অভিনয় কার্যে প্রথম ব্রতী। রাজ-সাহায্যে, ধনাঢ্য ও পদস্থ ব্যক্তির সাহায্যে নাটক অভিনীত হইত। যোগ্য ব্যক্তি শিখাইত এবং সমালোচকের দ্বারা যথাযোগ্য প্রশংসা পাইত। কোন অংশে অভিনয় করিয়া একেবারে কেহ সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতেন না। নাটকের ভাব সমালোচকেরা বুঝাইয়া দিতেন এবং দৃশ্যপট প্রভৃতি যথা উপযোগী হওয়ায়, সাধারণের প্রীতিকর হইত। সাধারণ দর্শকেরা দৃশ্যকাব্যের দৃশ্য অংশে বিমোহিত হইতেন এবং কাব্য অংশ সমালোচক হইতে বুঝিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালায় সেরূপ সমালোচক বিরল। যে শ্রেণীর লোক এ্যাক্টার প্রায় সেই শ্রেণীস্থ ব্যক্তি সমালোচক। তারপর তাহারা কখনও হৃদয়ের শিক্ষা পায় নাই। কাগজ হাতে আছে, তাহাতে যাহা নয়, তাহা লিখিতে প্রস্তুত। তাহার মধ্যে কেহ কেহ বা নাটক রচনা করিয়াছেন, সেই নাটক অভিনীত হইবে, প্রত্যাশা করিয়া কোন থিয়েটারের অযোগ্য প্রশংসা করেন; কেহ নভেল লিখিয়াছেন, সেইগুলি নাট্যাকারে পরিবর্তিত হইয়া অভিনীত হউক, আকাঙ্ক্ষা করেন। সুতরাং

থিয়েটারের প্রধান ব্যক্তির প্রতি নানাপ্রকার তোষামোদ বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় এবং কাগজেও অলীক প্রশংসা করিতে বাধ্য হন। অন্যান্য লোভের প্রত্যাশা রাখিয়াও সমালোচক চাটুকার হইয়া পড়েন। যথার্থ সমালোচনা করিবারও তাঁহার শক্তি নাই। কোন ভাষায় কোন উচ্চশ্রেণীর নাটক পড়েন নাই। মাতৃভাষা বাঙ্গালা বলিয়া বাঙ্গালা খবরের কাগজে তাঁহাদের লেখা চলে। তাঁহারা সমালোচক হওয়ায় রঙ্গভূমির সর্বাপেক্ষা সর্বনাশ হইয়াছে।

এইতো এক শ্রেণীর সমালোচক। আর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া অভিমান রাখেন। তাঁহাদের চক্ষে কিছুই ভাল লাগে না। বাঙ্গালায় সেক্সপীয়র নাই বলিয়া তাঁহারা ক্রন্দন করেন। আরভিং নাই, সারা বার্ণহার্ট নাই, ইটালী দেশীয় চিত্রকর নাই—তবে তাঁহারা নাটক দেখিতেই বা যাইবেন কি? —আর সমালোচনার কথাই কহিবেন কি?……"

গিরিশচন্দ্রের এই সুদীর্ঘ উক্তির মধ্যে নাটমঞ্চ এবং জাতির প্রতি সমালোচকের প্রকৃত দায়দায়িত্বের যে তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তা আর বিশদ ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন নেই।

এক কথায় বলা যায় যে, সমালোচক হলেন নাটমঞ্চের নিয়ন্তা শক্তি। যুগ ও জীবন সম্বন্ধে সচেতন থেকে, জাতীয় কৃষ্টি ও কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যেমন একদিকে জনরুচি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী, তেমনি অবিমিশ্র ব্যবসায়ী বুদ্ধির হাত থেকে শিল্পকলাকে উদ্ধার করে, তাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতেও সক্ষম। তাই উদাসীন, অথবা আত্মাভিমানী হলে সমালোচক হওয়া সম্ভব নয়। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি, বা ক্রোধ, ক্ষোভ প্রকাশের ক্ষেত্র নয় সমালোচনা। নাট্যকলার অপ্রতিহত প্রবহমানতার যুগে, সমালোচনার আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাই অবহিত এবং সচেতন হবার দিন এসে গেছে। গিরিশচন্দ্রের আবেদন সত্য হোক, এবং সমালোচক সম্পর্কে তিনি যে কলঙ্ক আরোপ করেছেন, তা অপনোদিত হোক, আজকের যুগে এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

চার

নাট্যকার

নাটমঞ্চের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হলো নাট্যকারের। আর শুধু নাটমঞ্চই নয়, বর্তমান এবং আগামীকালের তাবৎ দর্শকের সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ সবচেয়ে বেশী। তাই নাট্যকলার উন্নতিকল্পে নাট্যকারের দায়িত্বই সর্বপ্রধান। সাহিত্য রচনা খেয়ালখুশির ব্যাপার নয়। তাবৎ জনসমাজের সঠিক কল্যাণ কামনাতেই শিল্পী সাহিত্য রচনা করেন। দুদিনের নাম-যশ, বা আত্মীয় বন্ধুর কাছে সাহিত্যিক খ্যাতি লাভের চিত্তচমৎকারী বাসনা সাহিত্য সৃষ্টির প্রাণবস্তু নয়।

আধুনিককালের নাটকের দিকে তাকালে বলতেই হয় যে, জনসংযোগ এবং কৃষ্টি কল্যাণের পরিপূর্ণ প্রাগ্রসরতার সঙ্গে যে নাটকের কোন যোগসম্পর্ক আছে, তা বোধ করি নাট্যকাররা বিস্মৃত হয়েছেন। নাট্যকার আজ অবিমিশ্র জনরুচির সমর্থক। আর এই সমর্থনের জন্য, অর্থাৎ ফাঁকি দিয়ে নাম যশ এবং বাহবা পাবার জন্য নানান উদ্ভট সৃষ্টি নাটকের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন। মনস্তত্ত্বের নামে যৌন ব্যভিচারমূলক তথাকথিত মনোবিশ্লেষণাত্মক নাটক এবং প্রগতিশীলতার নামে অশালীন গালিগালাজপূর্ণ সংলাপে নাট্য সাহিত্য আজ কণ্টকিত। মৌলিকতার তো প্রশ্নই নেই। বিদেশী নাটকের যথেচ্ছ অনুকরণ, আজ বহু ক্ষেত্রেই মৌলিক নাটকের ছদ্মবেশে প্রচারিত হচ্ছে দেখতে পাই। অধিকন্তু আছে বিদেশী চলচ্চিত্রের নাট্য রূপায়ন। হলিউডের চিত্রশিল্পের অনুকরণে বাঙ্‌লা নাটক রচনা করে জাতীয় কোন কল্যাণ সাধিত হবে, তা বোঝা দুষ্কর, তবু হচ্ছে, এবং নাট্যকার কেবলমাত্র নাটকের পরিচয় পৃষ্ঠায়; সেই অনুকরণের স্বীকৃতি দিয়েই জাতীয় সংস্কৃতি পালনের দায়িত্ব সেরে নিচ্ছেন দেখতে পাই।

'বাঙ্‌লা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে আধুনিক নাট্যধারা সম্পর্কে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু কতকটা রূঢ় মনোভাব প্রদর্শন করলেও তাঁর এই সমালোচনা যে ভিত্তিহীন তা নয়। আধুনিক যুগে বিদেশী নাটকের

অন্ধ অনুকরণের একটা রেওয়াজ দেখা যায়, সেই প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিদেশী নাটকের অনুবাদের তিনি অপক্ষপাতী নন, বরং বিদেশী সমাজ থেকে উচ্চ ভাব-চিন্তা এবং মঙ্গলজনক রীতিপদ্ধতি আহরণ করে, স্বদেশী নাটকের যে উন্নতি সাধন করা যায় এবং আমাদের নাট্যকলার উন্মেষ যুগ থেকেই যে এই আহরণ এবং স্বীকরণ পদ্ধতি চলে আসছে, তা তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছেন। কিন্তু অন্ধ অনুকরণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলো,

> "……নির্বিচারে বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ সমর্থন করা যাইতে পারে না। যাহা আমাদের স্বভাব ও প্রকৃতির বিরোধী তাহা ছাড়া আমাদের পুষ্টি সাধন সম্ভবপর নয়। যে আহার্য আমরা পরিপাক করিয়া স্বদেহে মিলাইয়া লইতে পারি না, তাহা গ্রহণ করিলে উপকার না হইয়া অপকারই হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত নাট্যকারদের মধ্যে কেহ কেহ এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হইয়া পশ্চিম হইতে বর্তমান কালোপযোগী নাটক লিখিবার পদ্ধতি গ্রহণ করিবার সহিত সেখানকার গল্পাংশও গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। কিন্তু এইসকল গল্পের ভিত্তি যে সমাজ তাহার সহিত আমাদের সমাজের প্রভেদ বিস্তর। যাহা ঐ সমাজের পক্ষে সত্য আমাদের সমাজের পক্ষে তাহা সত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু এই সকল লেখক তাহা সকল সময়ে বিচার করিয়া দেখেন না। তাঁহারা কেবল গল্পের নায়ক নায়িকাদের নাম-ধামাদি বদলাইয়া সেগুলিকে দেশী রূপ দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ভিতরের আসল ব্যাপারটা যেরূপ বিজাতীয়, সেই রূপই রহিয়া যায়।"

শুধু অনুকরণ প্রসঙ্গে নয়, আধুনিক কালে তথাকথিত ক্রাইম বা মনস্তত্ত্ব মূলক নাট্যধারা সম্পর্কেও তিনি বলেছেন যে,

> "কেবল সমাজতত্ত্ব মূলক নাটক নয়। আমাদের নবীন নাট্যকারদের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্ত্য ধরনের 'মনস্তত্ত্বমূলক' নাটকও লিখিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। এই চেষ্টা উৎসাহ যোগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে

এই জাতীয় যে সকল নাটক লিখিত হইতেছে তাহাদের অধিকাংশের সহিত আমাদের জনসাধারণের কোন সম্পর্ক নাই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রভৃতি নানা কারণে আমাদের জনসারণের মনে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহাদের হৃদয় ও মনের অভ্যন্তরে যে পরিবর্ত্তন নীরবে সম্পাদিত হইতেছে তাহারই একটি জীবন্ত চিত্র আমরা আমাদের নবীন নাট্যকারদিগের নিকট পাইবার আশা করি। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমরা অধিকাংশ স্থলে পাইতেছি কতকগুলি বিলাতী ভাবাপন্ন কাল্পনিক পরিবারভুক্ত স্নায়ুরোগগ্রস্ত যুবকযুবতীর সমাজদ্রোহিতার অথবা তাহাদের যৌনমনোবৃত্তির অবাস্তব চিত্র।"

আধুনিক নাট্যকলা যে অবিমিশ্র অন্ধঅনুকরণ অথবা যুগ ও জীবন বিচ্ছিন্ন কাল্পনিক উদ্ভট কাহিনীর রূপায়ণ করে চলেছে—একথা নিশ্চয় সত্য নয়। আজকের নাট্যকার'রা জনসংস্কৃতির দরদী শিল্পী ; তবু আধুনিক নাট্যধারার সঠিক বিশ্লেষণ করলে যে অধ্যাপক বসুর কথা অনেকাংশ সত্য তা মেনে নিতেই হয়। আমাদের নাট্যকারদের এ বিষয়ে সচেতন হবার সময় এসে গেছে। কেননা আজ তাঁদের সদাসর্বদা এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, নাটক হিসেবে আজ তাঁরা যা উপহার দেবেন, একজন হোক, দুজন হোক, অথবা বহুজন হোক, সেই নাটক পাঠ বা তার অভিনয় দর্শন করবেন, এবং তদ্বারা কেউ কেউ কতকাংশে প্রভাবিতও হবেন, সেই প্রভাব যদি রুচি হীনতা অথবা সংস্কৃতির ভ্রান্তধারণার পরিপোষণ করে, তাহলে তারচেয়ে বড় অপরাধ আর নেই। পপুলারিটি সকলেই চায়, কিন্তু নিছক পপুলারিটি যদি কারুর কাম্য হয়, তাহলে তা নিশ্চয় সমালোচ্য। এ বিষয়ে নট-প্রযোজক শম্ভুমিত্র যে কথা বলেছেন, তা বিশেষ ভাবে আজকের নাট্যপ্রযোজক এবং নাট্যকারের স্মরণরাখা কর্ত্তব্য। তিনি বলেছেন, বাঁচার চেয়ে বড় পুণ্য আর নেই কিন্তু বাঁচতে হবে বাঁচার মত করে, নতুনকে গড়ার সাহায্য করার প্রেরণায়। নিছক পপুলার হতে চাওয়াটা আত্মমর্যাদার অবমাননাই ; এবং এ বিষয়ে সকলেরই আজ সচেতন থাকা উচিত।

পাঁচ

নবযুগ সূচনার প্রস্তুতি পর্ব

সবচেয়ে আনন্দের কথা হলো এই যে, নাট্যকলা আজ আর কেবলমাত্র আনন্দ বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং দেশাত্ম-বোধের ভাব-সঞ্চারী হিসাবে নাটককে আজ তাবৎ মানুষ স্বীকার করে নিয়েছেন, আর এই সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে নবযুগের প্রস্তুতি পর্ব।

যজ্ঞ সুরু হয়েছে, যাজ্ঞিকের কণ্ঠ নিঃসৃত মন্ত্রোচ্চারণে আজ দিগ্বিদিক মুখরিত ; যদিও যজ্ঞধূমে আকাশের নীলিমা এখনও আংশিকভাবে পরিব্যাপ্ত, তবুও আজ আর নতুনের ইশারা দুর্লক্ষ্য নয়। দেশের পেশাদার এবং অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলি আজ সবাই উদ্যোগী।

এই উদ্যোগ পর্বে সর্বাগ্রে স্মরণীয় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ শ্রীরাসবিহারী সরকার এবং শ্রীদক্ষিণেশ্বর সরকারের কথা। নাট্যরসিক এই ভ্রাতৃযুগল কেবল মাত্র ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি বশত নাটমঞ্চের স্থাপন করেন নি। জাতির সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হিসেবে রঙ্গমঞ্চকে প্রতিষ্ঠা করার দুরূহ কার্যে এঁরা ব্রতী হয়েছেন। নাটমঞ্চের মাধ্যমে সমগ্রদেশের নাট্যকলারসিকদের সংহত করে, নাট্যসাহিত্য এবং তার অভিনয়-প্রযোজনাকে সর্বজনপ্রিয় করে তুলতে তাই এঁরা নিয়মিত অভিনয় ছাড়াও নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সারা বছর ধরে নাট্য উৎসব এবং সার্থক নাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজকদের পুরস্কার বিতরণ করে এঁরা আজ নাট্যকলাকে জন-প্রিয় করে তুলেছেন দেখতে পাই। এছাড়াও আছে নাট্যসাহিত্য সম্মেলন। বিশ্বরূপা আয়োজিত এই নাট্যসাহিত্য সম্মেলন এবং নাট্য-প্রতিযোগিতা ও উৎসবের ফলে, একদিকে যেমন দেশের বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের আলোচনা, সমালোচনার মাধ্যমে নাট্যকলার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থিরীকৃত হয়, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন অপেশাদার নাট্যসংস্থা, যাঁরা কেবলমাত্র আর্থিক প্রতিকূলতা

বশতঃ যথোচিত নাট্য প্রযোজনা করতে অপারগ হতেন, তাঁরাও বিভিন্ন নাটক এই প্রতিযোগিতা এবং উৎসবে মঞ্চস্থ করতে সক্ষম হন।

এইসব প্রচেষ্টার ফলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নাট্যসংস্থাগুলির অভিনয় একই জায়গায় প্রায় সারাবছর ধরে দেখার সুযোগ ঘটে, এবং আধুনিক কালের নাট্য-প্রযোজনা সম্পর্কিত চিন্তাগুলির সঙ্গে তাবৎ জনমানুষ সহজেই সুপরিচিত হতে পারে। নাট্যাভিনয় ছাড়াও ব্যাপকভাবে নাট্য-সাহিত্য পাঠের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বিশ্বরূপা নাট্য-পাঠাগারের কথাও বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য।

ইতিপূর্বে পেশাদার নাটমঞ্চের কর্তৃপক্ষ নাট্যাভিনয়কে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কেবলমাত্র নাটকের অভিনয় এবং প্রযোজনার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, কিন্তু নাট্যরসিক দর্শক সাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার সঙ্গে তালমিলিয়ে দেশের অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলিকে সংহত করে, এবং তাদের নিয়ে সারাবছর ধরে নাট্য উৎসবের আয়োজন করে নাটকের বাণী সর্বশ্রেণীর জনসাধরণের মধ্যে পৌঁছে দেবার কোন প্রয়াস তাঁরা করেন নি। এদিক দিয়ে বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চের পক্ষ থেকে তাঁরাই যে এবিষয়ে পথিকৃতের কাজ করেছেন একথাও একশোবার সত্য।

নতুন নতুন নাটকের অভিনয় করা ছাড়াও, নাট্যশিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে দেশের লোককে নাট্যকলা বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতুহলী করে তোলার প্রচেষ্টায় যাঁরা ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্বরূপা ছাড়াও আর একজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন থিয়েটার সেণ্টারের কর্ণধার শ্রীতরুণ রায়। নাটক অভিনয়ই নয় শুধু, এঁরাও একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা এবং নাট্যশিক্ষার ক্লাসের ব্যবস্থা করে আজকের নাট্যরসিক দর্শকমহলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

ব্যক্তিগত এই সব মহৎ প্রচেষ্টার ফলে নাট্যকলার রূপশ্রী ক্রমবর্দ্ধিত হলেও উপযুক্ত সরকারী সাহায্য না পেলে নাট্যশিল্পের সার্থক বিকাশ কখনই সম্ভব নয়। আশার কথা এই যে, আমাদের জাতীয় সরকারও এই সত্যটি উপলব্ধি

করে, নাট্যশিল্পের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেছেন। দেশের বিভিন্ন অপেশাদার নাট্যসংস্থাকে বাৎসরিক অর্থসাহায্য করে (গ্রাণ্ট) এবং নাট্য-কলা আকাদেমীর প্রতিষ্ঠা করে, নাট্যকলা রসিক জনসাধারণের নাট্য-সাহিত্য তথা অভিনয় এবং প্রযোজনা বিজ্ঞানের চর্চা করার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা এবং দিল্লীর নাট্যকলা একাদেমীর কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সম্প্রতি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাট্য, সঙ্গীত ইত্যাদি শিল্পের চর্চা এবং গবেষণার যে নবতর অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর মত সর্বজনবন্দিত নাট্য তপস্বীর নেতৃত্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা শিক্ষা এবং গবেষণায় রত বহু ছাত্রছাত্রী আজ নাটককে দেশের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেব ভাবতে শিখেছেন। নাট্যকলা সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে নিজেদের ভবিষ্যতের প্রযোজক পরিচালক এবং অভিনেতা হিসেবে গড়ে তোলার দুরূহ সাধনায় তাঁরা মগ্ন।

নাট্যকলা আজ আর তাই কেবলমাত্র সখের অথবা ব্যবসার উপকরণ হয়ে নেই। নানাভাবে দেশের সরকার এবং ব্যক্তিগত নাট্যকলারসিকদের প্রচেষ্টায়, বিভিন্ন নাট্যশিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে ভবিষ্যৎ প্রাণপরি-পূর্ণতার পথেই অগ্রসর। দেশের প্রগতিশীল সংবাদপত্রগুলিও নাট্যাভিনয়ের সংবাদ পরিবেশন এবং সমালোচনার মধ্য দিয়ে উৎসাহ প্রদানের বিষয়ে আজ অগ্রণী।

ফলকথা, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যদশক থেকে আমাদের দেশে যে নাট্য-চর্চার সূত্রপাত হয়, পতন উত্থানের বন্ধুর পন্থা অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর মধ্যদশকের প্রান্ত সীমায় উপনীত হয়ে সেই নাট্যচর্চা আজ নানাভাবে জাতীয় সংস্কৃতির মর্মমূলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে, সুস্থ-সুন্দর জীবনচিন্তায় নিজেকে পল্লবিত করে চলেছে। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি এবং সুস্থ শিল্পচর্চার প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে যুগবন্দিত নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী উন্নত নাট্যশালার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছিলেন,

"বাঙ্গালার নাট্যশালা এখনও সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করেনি। জগতে শ্রেষ্ঠ জাতিদের নাট্যশালার সঙ্গে হয়তো আমাদের রঙ্গমঞ্চ অনেক বিষয়ে তুলনীয় নয়। কিন্তু জাতির পরিচয় তার রঙ্গমঞ্চে, সুতরাং জগতের বড় জাতি বলে পরিচিত হতে হলে উন্নত নাট্যশালার প্রয়োজন।

নাট্যশালাকে উন্নত করতে হলে সর্বাগ্রে মনের ভিতর নাট্যশালার সম্বন্ধে যে অনাদরের ভাব আছে, তা দূর করা দরকার। নাট্যশালা জাতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই নাটমঞ্চে এসে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্য গীত, অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস নাট্য সকলেরই বিকাশ। সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা নাট্যকার। সাহিত্যের মধ্যমণি নাট্য। অভিনয় ব্যতিরেকে নাট্য সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্যশালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন।"

এই নাট্যশালার উৎকর্ষের জন্য নাট্যাচার্য প্রাণপাত করে গেছেন। আনন্দের কথা এই যে, তাঁর সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি। মহাযজ্ঞের যে মন্ত্রঃপুত পবিত্র হোমাগ্নি তিনি প্রজ্জ্বলিত করেছেন, সেই বহ্নিমান শিখায় আজ নবযুগের প্রবেশতোরণ আলোকিত; আগামীকালের নাট্যসাধকের আশা আকাঙ্ক্ষা বলিষ্ঠ সম্ভাবনার নিশ্চয়তায় দ্যুতিমান।

পরিশিষ্ট (খ)

গ্রন্থপঞ্জী

বাইশ কবির মনসা মঙ্গল (ভূমিকা)	:	ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাঙ্‌লা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ১ম, ২য়	:	ঐ
বাঙ্‌লা সাহিত্যের নবযুগ	:	ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত
এ্যারিষ্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ত্ব	:	ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্য
ক্রোচের এস্থেটিক ও এসেন্স অফ এস্থেটিক	:	ঐ
নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ	:	ঐ
সাহিত্য পাঠের ভূমিকা	:	ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত
প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা	:	শ্রীমনোমোহন ঘোষ
অভিনয় : নাটক : মঞ্চ	:	,, শম্ভু মিত্র
বাঙ্‌লা নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র	:	,, অহীন্দ্র চৌধুরী
রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ	:	,, রমাপতি দত্ত
বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার	:	,, হেমেন্দ্র কুমার রায়
শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার	:	,, মনি বাগচী
থিয়েটার প্রসঙ্গে	:	,, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
সোভিয়েত নাট্যমঞ্চ	:	,, কালীশ মুখোপাধ্যায়
গিরিশচন্দ্র	:	,, হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত
আমার জীবন	:	,, বিনোদিনী দাসী
রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর	:	,, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কাব্য জিজ্ঞাসা	:	,, অতুল গুপ্ত
বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	:	,, মন্মথমোহন বসু

বহুরূপী পত্রিকা	: (সম্পাদক) গঙ্গাপদ বসু
"অভিনয় ও অভিনেতা" প্রবন্ধাবলী	: গিরিশচন্দ্র ঘোষ
থিয়েটার আঙ্গিক প্রবন্ধাবলী	: দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্য মীমাংসা	: বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
World Drama	: Allardyce Nicoll
British Drama	: do
The Theatre and the dramatic Theory	: do
Elezabethan plays and players	: G. B. Harrison
On Theatre	: Hazlitt
Papers on Acting	: Brander Methews
Producing a play	: Frank Lamb
Acting	: Toby Cole
Notes of a Soviet Actor	: N, Cherkasov
My Life in Art	: Stanislavsky
The Vakhtangov School of Stage Art	: G: Ivanov Mumjhev

শব্দ-সূচী

অ

অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফী—১১০, ১১১, ২৩০

অক্ষয় কুমার দত্ত—৭৮, ৭৯

অঙ্গার—১৫২

অমরেন্দ্র নাথ দত্ত—১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩

অহীন্দ্র চৌধূরী—৩৬, ৭৬, ১১৭, ২২৩, ২৩১, ২৩২

অভিজ্ঞান শকুন্তলম—৫২

অপরেশ মুখোপাধ্যায়—৬১, ৬২

অভিনয় নাটক মঞ্চ—১০০

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়—২০৩

আ

আরিস্তফানিস—১২

আয়নার ব্যায়াম—১৩৫

আরিস্ততল—২২

আনন্দবাজার—১০০

ই

ইস্কাইলাস—১০, ১১, ১২

ইথ্ হার্ণক্রেট—১১

ইসিস—১১

ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিকাল কোয়াটারলি—২৫

ইসলাম ধর্ম—৩৫

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—১১, ৭৮

উ

উর্ব্বশী নিরুদ্দেশ—২০২

উৎপল দত্ত—৩৬, ৭৫, ১০১, ১১৫, ১১৬, ২০১, ২০২

উলুখাগড়া—১৯৮, ১৯৯

ঋ

ঋত্বিক ঘটক—১৮৫

এ

একেই কি বলে সভ্যতা—১৭০, ১৭৫

এ্যালারডাইসনিকল—১০, ১২

ও

ওসিরিস—১০

ওরিয়েণ্টাল একাডেমী—১৯, ২০

ওথেলো—২০, ১১৫, ২২৯

ক

কালপুরী—২০২

কাঞ্চনরঙ্গ—১১৭

কাপ্তেন বেলবাবু—১৫৪

কামিনী রায়—১৭০

কালিদাস—৫২

কালের যাত্রা—২০৪

কিরণ মৈত্র—৮৭, ২০৩
কুলীন কুল সর্ব্বস্ব—২০, ১৭৫
কুমার রায়—৮৭
কৃষ্ণকান্তের উইল—১৮১
কৃষ্ণচন্দ্র দে—৮৬, ১৭৯
ক্যালকাটা থিয়েটার—১৯, ৯৯
কেশব গঙ্গোপাধ্যায়—২০, ২১৮, ২২৯
ক্লীঙ্গার—১৯, ২০

খ

খিদিরপুর থিয়েটার—১৯

গ

গন্ধর্ব—২০৩
গঙ্গাপদ বসু—৮৭
গান্ধিজী—১৯০, ১৯১
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—৩৫, ৬০, ৬১, ১০৯, ১১০, ১১৮, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ২৩৮, ২৪৬, ২৪৭
গোত্রান্তর—৭৫, ৭৬, ৮৬, ১১৩, ১১৭, ১৯৪
গ্রেট নাশন্যাল থিয়েটার—১০৮

চ

চর্যাপদ—১৪, ১৫, ১৫২
চণ্ডীদাস—১৫, ১৬
চণ্ডী—১৭
চতুর্থ হেনরী—২০
চন্দ্রগুপ্ত—১৮৪
চন্দ্রশেখর—১৮১
চলচিত্ত চঞ্চরী—২০৪
চারুপ্রকাশ ঘোষ—২০৩
চাণক্য—১০৬, ১১২
চিরিওলাস—১১
চিত্রযজ্ঞ—১৭, ১৬৩
চেরকাশভ—৩৮, ৪২, ৪৯, ২২৫
চৌরঙ্গী থিয়েটার—১৯

ছ

ছায়াপথ—৭৬, ৭৭, ৭৮, ১৯৬, ২০৬

জ

জন বোর্ন—৮৮, ৯৩, ৯৪
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়—৮৬, ৮৭, ২০৩
জিওফ্রে—২০
জোছন দস্তিদার—৮৭, ২০২
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৭৪, ১৭৫

ট

টেরান্স—১২

ঠ

ঠাকুর বাড়ী—১৭৪, ১৭৬

ড

ডেভিড হেয়ার একাডেমী—১৯
ডানা ভাঙা পাখী—২০২

ত

তরুণ রায়—২৫২

তমসার তীরে—১০৩

তরঙ্গ—১৯০

তাপস সেন—১৫০

তিতাস একটি নদীর নাম—৭৫, ৮৬, ১১১, ১৫০, ২০১

তুলসী লাহিড়ী—৭৫

তৃপ্তি মিত্র—৩৬, ১১৭

থ

থেসপিস—১১

থিয়েটার সেণ্টার—১৯১, ২৫২

দ

দক্ষিণেশ্বর সরকার—২৫১

দশচক্র—৮৬, ১১২

দানীবাবু—১৭৭, ১৭৮

দি কিং এ্যাণ্ড দি মীলার—১৯

দি এ্যানথেম—১৯

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—৭৪

দিওনুসিপস—১১

দীনবন্ধু মিত্র—১৭৫

দুই মহল—৮৭

দুঃখীর ইমান—৭৬, ১৯০

ধ

ধর্ম্ম ঠাকুরের পালা—১৬

ধর্ম্মদাস সুর—১৭৬, ১৭৭

ন

নড়পেড়া—১৫, ১৫২

নব নাটক—১৭৪

নরেন্দ্র দেব—১৮০, ১৮২

নবীন বসু—১৭১

নতুন ইহুদী—৭৫

নবান্ন—৩৬, ৮৬, ১১৭, ১৪৯, ১৮৫, ১৯০

নরেশ মিত্র—৮৬

নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়—৯০, ৯১, ১০০

ন্যাশনাল থিয়েটার—১৭৬

নীল দর্পণ—১১১, ১১২, ১৭৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০

প

পরেশ ধর—২০২

পথিক—৭৬, ১৯৮, ১৯৯

প্লাউতুস—১২

পাহাড়ী ফুল—২০৪

পুরু বিক্রম—১৭৫

প্যাসন প্লে—১০

পিসিসট্রাটাস—১১

প্রাটিনাস—১২

প্লে-হাউস—১৯

প্রিয়নাথ দত্ত—২০

প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা—২৫

পুতুল খেলা—১৪৮, ১৯৯

পুস্ত—৫৩

প্রভা—.০৬
পিঙ্কু নিয়োগী—২০৪
প্রেমাংশু বসু—২০৪

ফ

ফোর্ট উইলিয়ম—১৯
ফ্যারিংগস—৯৩, ৯৪, ৯৬

ব

বঙ্কিমচন্দ্র—৭৮, ১৬১, ১০৮, ১৮১
বহুরূপী—৫৪, ৯০, ১০০, ১৯৭, ১৯৮
বারঘণ্টা—২০৩
বাস্তুভিটা—৭৬
বিজন ভট্টাচার্য—৩৬, ৪০, ৬৩, ৭৫, ৭৭, ৮৬, ৮৭, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৭, ১১১, ১১৩, ১১৭, ১৪৯
বিদ্যাসুন্দর—১৬৯, ১৭০, ১৭১
বিদ্যানাথ বাচস্পতি—১৭, ১৬৩
বিবিধার্থ সংগ্রহ—.৮
বিনোদিনী—২৩০
বীরু মুখোপাধ্যায়—২০৩
বিশে জুন—২০৪
বিদ্যাসাগর—২০৩
বিসর্জন—৮৬, ১৮৫, ১৯৯
বিশ্বরূপা—২৫১, ২৫২
বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ—১৭০, ১৭৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০
বেলগাছিয়া থিয়েটার—২০, ২১৮
ব্যারী—২০
ব্রেথ্ট—২০২
বৈষ্ণবচরণ আঢ্য—২২৯

ভ

ভরত—২২, ২৫, ৩৭, ৫০, ৫১, ৫৫, ৬৪
ভক্তানগভ—২৩৪
ভট্ট লোল্লট—৩২
ভট্ট শঙ্কুক—৩২
ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর—১৭, ১৬৯

ম

মস্করা—১৫, ১৬, ১৮
মনসা মঙ্গল—১৬
ময়মনসিংহ গীতিকা—১৬
মহুয়া কাব্য—১৭
মনমোহন ঘোষ—২৫, ১৫২
মরাচাঁদ—৭৬, ৭৭, ৮৬, ১২৯
মধুসূদন—৭৮, ৭৯, ১১১, ১৭০, ১৮৩, ১৮৭, ১৮৯, ২১৮, ২৩৪
মন্মথমোহন বসু—২৪৮
মন্মথ রায়—২০৩
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—১৯৩
মমতাজ আমেদ—২০৩
মার্চেন্ট অব্ ভেনিস্—১৯, ২০
মায়ারহোল্ড—২০২, ২০৫
মিস্ ডরেথি বার্চ—৯৭
মিনার্ভা—১১২

মোকাবিলা—১৯০
ম্যাক্সিম গোর্কী—২৩০
মেরী মেকার্স ক্লাব—২০৪

র

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—৬১
রক্তকরবী—৬৩, ৮৬, ১১৭, ১৫২, ১৯৯, ২০০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৬৯, ৭৯, ২০০, ২০৩
রমেন লাহিড়ী—২০৩
রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত—১৮২
রাধাপ্রসাদ বসাক—২০
রাজেন্দ্রলাল মিত্র—১৮
রামনারায়ণ তর্করত্ন—২০, ১৭৪, ১৭৫
রিচার্ডসন—২০
রাসবিহারী সরকার—২২১

ল

লক্ষ্মী স্বয়ম্বর—১৭
লারিংস—৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৬
লেবেডফ—১৯

শ

শম্ভু মিত্র—৩৬, ৬৩, ৭৯, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১০০, ১০১, ১১২, ১১৩, ১১৭, ১৪৮, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০
শচীন দেববর্মণ—৮৬
শিশিরকুমার ভাদুড়ী—৩৫, ৬২, ৭৯, ৮৬, ১০৫, ১১৭, ১২১, ১৭৭, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ২০২, ২১৩, ২২২, ২৩১, ২৩২
শ্রীরঙ্গম—১০৬, ১৮৫, ২১৩
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন—১৫, ১৬
শিবায়ন—১৬
শেষাগ্নি—১৮২
শৈবলিনী—১৮১
শোভা সেন—৩৬
শোভেন মজুমদার—৮৭
শৌভনিক—২০৩
শেষ রক্ষা—২০২

স

সলিল সেন—৭৫
সরোজিনী—১৭৫
সবিতাব্রত দত্ত—২০৩
সংগ্রাম ও শান্তি—২৩১
সরযুবালা—২৩২
সিরাজদৌল্লা—১৯, ১৮৪
সীতা—১৮৪, ১৮৫, ১৩১
সিসমোগ্রাফ—৪০
স্টানিস্লাভস্কি—৩৯, ১৩৩, ১৩৫
সাঁসুসি থিয়েটার—১৯
সূর্য মঙ্গল—১৬, ১৭
সেকট্রিস (৩)—১১
সেনেকা—১২

সেক্সপীয়র—১৯, ২০, ৫৭, ৬০, ১৬২
সেতু—১৫১
স্বর্ণগ্রন্থি—৮৭, ২০২
সূর্যের মত সমুদ্র—২০৩
সুনীত মুখোপাধ্যায়—২০৪
সাইরেণ—২০৪
স্যার হেনরী আরভিং—২২৯
সোলোগভ—২১৬, ২১৮, ২১৯, ২২০

হ

হারাণ বসাক—২০
হিন্দু কলেজ—১৯
হিন্দু পাওনীয়র—১৭১
হিন্দু থিয়েটার—২৫
হ্যামলেট—৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০ ২২০
হেক্টর বধ—৭৯
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১৬২
হেমেন্দ্রকুমার রায়—১৭৭

শুদ্ধিপত্র

মুদ্রণ প্রমাদের জন্য গ্রন্থখানিতে কিছু ভুল ক্রটি রয়েছে ; সহৃদয় পাঠকের কাছে তা মার্জনীয় হবে বলে ভরসা করি।

পৃঃ ২০৪…প্রেমাংশু মুখোপাধ্যায় স্থলে প্রেমাংশু বসু পড়তে হবে।

পৃঃ ১৬৩…"হেমচন্দ্রের হাতে রোমিও জুলিয়েট নাটকটির যে কী অসীম দুর্গতি হয়েছে, তা উক্ত নাটকের পাঠক মাত্রেই রচনার। প্রযোজনার প্রাক্কালে সত্যিকারের নাটক এবং নাট্যরূপী এই সব জঞ্জালের সম্পর্কে একজন প্রযোজকের সদাসর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।"…ইত্যাদির স্থলে :—

"হেমচন্দ্রের হাতে রোমিও জুলিয়েট নাটকটির যে কী অসীম দুর্গতি হয়েছে তা উক্ত নাটকের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। প্রযোজনার প্রাক্কালে সত্যিকারের নাটক এবং নাট্যরূপী এই সব রচনার সম্পর্কে একজন প্রযোজকের সদাসর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।"…পড়তে হবে।

২০৩ পৃষ্ঠায় মমতাজ আহমদের জায়গায় মমতাজ আমেদ পড়তে হবে।